ধর্ম ও নৈতিকতা প্রসঙ্গে কাজী নজরুল ইসলাম

[Kazi Nazrul Islam on Religion and Morality]

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিস-এ এমফিল ডিগ্রির আংশিক শর্ত পূরণ হিসেবে উপস্থাপিত

এমফিল অভিসন্দর্ভ

গবেষক

আলমগীর হোসেন খান
এমফিল ফেলো, শিক্ষাবর্ষ: ২০১৭-২০১৮
আইডি: ১৮১৩১৮৩৫১৩
ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

গবেষণা সহ-তত্ত্বাবধায়ক

ড. মোঃ আলতাফ হোসেন-২
প্রফেসর, দর্শন বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

ড. মোঃ আক্তার আলী
প্রফেসর, দর্শন বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

জুন ২০২০

ঘোষণাপত্র

ধর্ম ও নৈতিকতা প্রসঙ্গে কাজী নজরুল ইসলাম [Kazi Nazrul Islam on Religion and Morality] শীর্ষক এই অভিসন্দর্ভটি আমার নিজস্ব গবেষণাকর্ম। ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়-এ এমফিল ডিগ্রির আংশিক শর্ত পূরণ হিসেবে এটি লিখিত হয়েছে। এই অভিসন্দর্ভের দ্বিতীয় অধ্যায়ের "ধর্মান্ধতার সমালোচনায় নজরুল" উপশিরোনামের অংশটুকু **"ধর্মান্ধতার সমালোচনায় কাজী নজরুল ইসলাম"** শিরোনামে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিতগবেষণা জার্নাল*অন্বেষণ* এর **১৮**শ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে; যা এমফিল ডিগ্রির শর্ত হিসেবে এই অভিসন্দর্ভের শেষে সংযোজিত হয়েছে।

আলমগীর হোসেন খান
এমফিল ফেলো, শিক্ষাবর্ষ: ২০১৭-২০১৮
ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
রাজশাহী।

প্রত্যয়নপত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা হচ্ছে যে, **ধর্ম ও নৈতিকতা প্রসঙ্গে কাজী নজরুল ইসলাম** [Kazi Nazrul Islam on Religion and Morality] শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমরা মনোযোগ সহকারে পড়েছি। আমাদের জানা মতে এটি গবেষক আলমগীর হোসেন খানএরনিজস্ব গবেষণালব্ধ রচনা। অভিসন্দর্ভটির মৌলিকত্ব যাচাইপূর্বক আমরা এটিকে এমফিল ডিগ্রির আংশিক শর্ত পূরণ হিসাবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজে দাখিল করার অনুমতি প্রদান করছি।

ড. মোঃ আলতাফ হোসেন-২
গবেষণা সহ-তত্ত্বাবধায়ক
ও
প্রফেসর, দর্শন বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

ড. মোঃ আক্তার আলী
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
ও
প্রফেসর, দর্শন বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ

ধর্ম ও নৈতিকতা প্রসঙ্গে কাজী নজরুল ইসলাম[Kazi Nazrul Islam on Religion and Morality] শিরোনামের বর্তমান অভিসন্দর্ভের লক্ষ্য হলো ধর্ম ও নৈতিকতা সম্পর্কিত কাজী নজরুল ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসন্ধান করা। এই লক্ষ্য পরিপূরণের জন্য প্রাথমিক ও সহায়ক উপকরণ থেকে পাঠ-বিশ্লেষণ ও তুলনামূলক পর্যালোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ে গবেষণার যৌক্তিকতা, লক্ষ্য, পরিধি, পদ্ধতি, এবং গবেষণার কাঠামো সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা হয়েছে।

"ধর্ম ও ধর্মবিশ্বাসের স্বরূপসম্পর্কে কাজী নজরুল ইসলাম" শীর্ষক দ্বিতীয় অধ্যায়েধর্ম সম্পর্কে নজরুলের দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা করা হয়েছে। ধর্মবিশ্বাসের দিক থেকে ইসলাম ধর্মের প্রতি নজরুলের দৃঢ় আস্থা তাঁর সাহিত্যে ফুটে উঠেছে। তবে প্রথাগত ধর্মের আচারিক দিকের চেয়ে এর অন্তঃস্থ দিকের প্রতি তিনি বেশিগুরুত্ব দিয়েছেন। ধর্মকে তিনি দেখেছেন সকল প্রকার সংকীর্ণতার উর্ধ্বে; যেখানে ধর্মভেদের কারণে কেউ পরহিংসার পাত্র হবে না। কিন্তু নজরুলের সমকালে ভারতবাসীর মধ্যে এই ধর্মভেদ ব্যাপকতরছিলো। সে সময়ে ধর্মান্ধরা ধর্মের ভেতরে মানবরচিত জাত-পাতের বিধানের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে খোদার সৃষ্টি মানুষকে একে অপরের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলতো। সকল ধর্মের মূল লক্ষ্য মানবকল্যাণ হলেও এরা মসজিদ-মন্দির রক্ষার নামে মানুষ হত্যা করতে দ্বিধা করতো না। নজরুল ধর্মের নামে এই অধার্মিক বিধানের তীব্র সমালোচনা করেন এবং সমাজ থেকে অধার্মিক কর্মকাণ্ড দূর করে ধর্মের প্রকৃত বিধান প্রতিষ্ঠার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। এজন্য তিনি সকল ধর্মের উপরে মানব-ধর্মকে গুরুত্ব দেন। এর অংশ হিসেবেতিনি হিন্দু-মুসলমানের মধ্যকার চিরপোষিত মনোমালিন্য দূর করে উভয়ের মিলনকামনা করেন। এ মিলনের পথে গোঁড়া ধার্মিকরা ছিলো ঘোর বাধা। নজরুল তাদের সমালোচনা করে বলেন যে, এই ধর্মান্ধদের কারণেই ধর্ম-বিদ্বেষ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে,ধর্মের প্রকৃত বার্তা বিকৃত হচ্ছে। সুফিবাদী মুসলিম পরিবারে জন্ম নেওয়ায় ধর্মের এই আধ্যাত্মিক দিকটি নজরুলের মধ্যে ছোটকাল থেকেই বিদ্যমান ছিলো।

“ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও স্বরূপ সম্পর্কেকাজী নজরুল ইসলাম” শীর্ষক তৃতীয় অধ্যায়ে দর্শনের বহুল আলোচিত ঈশ্বর বিষয়ক আলোচনা সম্পর্কে নজরুলের দৃষ্টিভঙ্গিআলোচিত হয়েছে। এই জগতের দৃশ্যমান যে বৈচিত্রতা এর পেছনে কি কোনো অতিপ্রাকৃত সত্তা রয়েছেন, নাকি প্রাকৃতিক নিয়মেই বিকশিত হচ্ছে এই ধরাধাম, এই সকল দার্শনিক প্রশ্নে নজরুলের অবস্থান সৃষ্টিবাদীদের দলে। সৃষ্টিবাদীদের মতো তিনিও মনে করেন এই জগত সৃষ্টি ও এর বৈচিত্রতারপেছনে এক অতীন্দ্রিয় পরমসত্তার অস্তিত্ব বিদ্যমান।আর এ ক্ষেত্রে নজরুল প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যকে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করেন। জগতের ফুল-ফল, পাহাড়-পর্বত, চন্দ্র-সূর্য প্রভৃতির অপরূপ সৌন্দর্যকে ঈশ্বরের সৌন্দর্যের ছায়া হিসেবে তিনি মনে করেন। তাছাড়া নজরুল মনে করেন মানুষ যেহেতু সসীম, সেহেতু মানুষের কারণ মানুষ হতে পারে না। এর পেছনে রয়েছে এক মহাপরিকল্পনাকারী সত্তার হাত। আর তিনিই ঈশ্বর।তিনি বিনা উদ্দেশ্যে এই জগৎ সৃষ্টি করেননি। এই জগৎ প্রক্রিয়ার পেছনে রয়েছে তাঁর এক মহাপরিকল্পনা। নজরুল ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে তত্ত্ববিদ্যামূলক, কার্যকারণমূলক ও উদ্দেশ্যমূলক যুক্তির অবতারণা করেন। ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণের পাশাপাশি ঈশ্বরবিষয়ক নিরীশ্বরবাদ, বহু-ঈশ্বরবাদ ও দ্বি-ঈশ্বরবাদের প্রতিক্রিয়ায় তিনি একেশ্বরবাদের পক্ষে জোরালো যুক্তি দেন। এক্ষেত্রে সকল ধর্মের ঈশ্বরকে তিনি একই মনে করেন। হিন্দু ধর্মের হরি আর ইসলাম ধর্মের আল্লাহকে তিনি আলাদা করে দেখেননি। ঈশ্বরকে তিনি করুণাময়, ক্ষমাশীল, সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান সত্তারূপে দেখেছেন;যিনি মানুষকে সেবিতে বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে আগমন করেন। মানুষের সুখে তিনি হাসেন, আবার সেই মানুষের দুখে তিনিকাঁদেন। বান্দার প্রতি এতো করুণাময় ও দয়াশীল হলেও তিনি অন্যায়কে সহ্য করেন না। সুতরাং যারাই তাঁর সৃষ্টিতে ব্যঘাত সৃষ্টি করতে চায় তাদেরকে তিনি ‘অসুর দাসিনীরূপে’ সংহার করেন। তিনি জগতের অতিবর্তী হয়েও অন্তর্বর্তী।

চতুর্থ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় “নৈতিকতা প্রসঙ্গে কাজী নজরুল ইসলাম”। এখানে তৎকালীন সমাজ প্রেক্ষাপটের আলোকে নজরুলের নৈতিক মানসবিশ্লেষিত হয়েছে। তৎকালীনসময়ে সমাজে ভেদ-বিষাদ ও অনৈতিক চর্চা সর্বগ্রাসি আকার ধারণ করেছিলো। অসমতা ছিলো সমাজের প্রতিষ্ঠিত নীতি। এমতাবস্থায় নজরুল মানুষের মধ্যে নৈতিকতাকে জাগ্রত করে একটি সাম্যভিত্তিক নৈতিক সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে কলম চালান। ব্রিটিশ প্রবর্তিত শিক্ষাকাঠামো দিয়ে যে দেশের স্বাধীনতা আসবে না তা তিনি বুঝতে পারেন। এজন্য তিনি

শিক্ষাব্যবস্থা থেকে শুরু করে সমাজের প্রতিটি নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য ঠিক করে দেন। সাহিত্যিকরা কোন ধরনের সাহিত্য রচনা করবে তার দিক নির্দেশনাও রয়েছে নজরুলের সাহিত্যে। সাম্যভিত্তিক সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় তিনি নারী-পুরুষের, ধনী-গরীবের, মালিক-শ্রমিকের মধ্যে ন্যায্যতার দাবি তুলে ধরেন। রাজনৈতিক নৈতিকতার দিকটিও তিনি বাদ দেননি। বরং বলা যায় যে, মানুষের রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যতিনি সারাটি জীবন সংগ্রাম করেন। আর এজন্য রাষ্ট্রের সাথে নাগরিকদের সম্পর্ক ওশাসক-শাসিতের সম্পর্ক কেমন হবে তাও তিনি দেখিয়ে দেন।সকল সম্পর্ককে তিনি নৈতিক দিক থেকে বিচার করেন। আর তাঁর এই নৈতিকতার ভিত্তি হল ধর্মীয় নৈতিকতা।কারণ তিনি ধর্মীয় নৈতিক বিধি-বিধানের অনুসরণের মধ্যেই প্রকৃত মানবকল্যাণ দেখেছেন ।

পঞ্চম অধ্যায়ের শিরোনাম হলো "আত্মার স্বরূপ প্রসঙ্গে কাজী নজরুল ইসলাম"। নজরুল আত্মাকে দেখেন অক্ষয়, অমর, অজড় ও অবিনাশী সত্তা রূপে; যা দেহ বিনাশের পরেও অস্তিত্বশীল থাকে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনে আত্মার প্রতিশব্দ হিসেবে 'আমি'র যে ব্যবহার, নজরুলের সাহিত্যে তা ব্যাপক আকারে বিদ্যমান। বলা যায়, 'আমি'র জয়গানই নজরুল সাহিত্যের মূল প্রতিপাদ্য। নজরুল মনে করেন মানবাত্মা বিশ্বাত্মা তথা পরমাত্মার অংশ। সুতরাং পরমাত্মার শক্তিও মানবাত্মার মধ্যে বিরাজমান। কাজেই যে একবার নিজেকে চিনতে পারে, সে তার পরমাত্মাকে চিনতে পারে। আর একবার পরমাত্মাকে চিনতে পারলে তার দুঃখ, শোক, না পাওয়ার বেদনা সব কিছু দূর হয়ে যায়; মৃত্যুকে সে তখন আর ভয় পায় না। কারণ সে জানে, মৃত্যুর মাধ্যমে আত্মা দেহ ত্যাগ করে তার আবাসস্থল পরমাত্মার সাথে মিলিত হয়। আত্মার অমরতায় বিশ্বাসী নজরুল মনে করেন,মৃত্যুর পর আর একটি জীবন রয়েছে যেখানে পুণ্যাত্মারা পুরস্কৃত হবে আর অপরাধীরা শাস্তি পাবে।

অভিসন্দর্ভের ষষ্ঠ অধ্যায়ে পূর্ববর্তী অধ্যায়সমূহ থেকে প্রাপ্ত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সমন্বিত করেসমগ্র গবেষণার ফলাফলকে কতিপয় উপলব্ধি-কাঠামোয় দাঁড় করানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ (আইবিএস), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত ফেলোশিপের আওতায় বর্তমান গবেষণাকর্মটির সূচনা হয়। এরপর থেকে থিসিস জমাদান প্রক্রিয়া পর্যন্ত রেজিস্ট্রেশন, আবাসন, কোর্সওয়ার্ক, সেমিনার আয়োজন প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার প্রতিষ্ঠানগত সহায়তার ফলস্বরূপ গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। এজন্য বাংলাদেশ বিষয়ক চর্চার ক্ষেত্রে অত্যন্ত মর্যাদাসম্পন্ন ও দেশখ্যাত এই প্রতিষ্ঠানটির প্রতি আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।

অত্র গবেষণাকর্মের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে দর্শন বিভাগের প্রফেসরমোঃ আক্তার আলী এবং সহ-তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে একই বিভাগের প্রফেসরমোঃ আলতাফ হোসেন-২ দায়িত্ব নিতে সম্মত হন। গবেষণাকর্মের একেবারে প্রথম থেকে তাঁদেরসহযোগিতা, নির্দেশনা ও পরামর্শ আমাকে এই কাজটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে সহায়তা করেছে। তাঁদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা।

আইবিএস-এ ভর্তি হওয়ার পর থেকে কোর্সওয়ার্ক চলাকালে গবেষণা সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরনের পরামর্শ দিয়ে আইবিএসের যে সকলসম্মানিত শিক্ষকমণ্ডলীকৃতজ্ঞতার বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন তাঁদের মধ্যে প্রফেসর জাকির হোসেন, প্রফেসরএম জয়নূল আবেদীন, প্রফেসরস্বরোচিষ সরকার, প্রফেসরনাজিমুল হক, ড. মোস্তফা কামাল এবং ড. কামরুজ্জামান অন্যতম।সকলের প্রতি আমি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

আইবিএস একটি আবাসিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান হওয়ায় একে অন্যের সাথেমিথস্ক্রিয়া ও সাহচর্যের ফলে গবেষণাকর্মে বিভিন্নমুখী সহযোগিতা পাওয়া সম্ভব হয়। গ্রুপওয়ার্কের মাধ্যমে গবেষণার নতুন দিক উন্মোচিত হয়। এজন্য আমি আমার ব্যাচমেটদের পাশাপাশি জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ গবেষকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। দু'একজন, যাদের নাম উল্লেখ না করলেই নয়, তাঁদের মধ্যে আমার সহকর্মী ও আইবিএসের গবেষক মোঃ শিহাব উদ্দীন (সহকারী অধ্যাপক, দর্শন); যাঁর অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতা আমার গবেষণাকর্মেআসার পথকে সহজ করে দিয়েছে। মোঃ রবিউল ইসলাম (সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ); যিনি সব সময় বড় ভাইয়ের মতো দিকনির্দেশনা

দিয়েছেন এবং কাজী নজরুল ইসলাম সম্পর্কে ধারণা গঠনেও সহযোগিতা করেছেন। তাঁদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করতে যারা আমায় সার্বক্ষণিক সহযোগিতা করেছেন এবং যাদের সহযোগিতা ছাড়া হয়তো এ কাজটি করা একেবারেই সম্ভব হতো না,তাঁরা আমার কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ বা লৌকিক ধন্যবাদ প্রদান পর্যায়ের নয়। আমার সহধর্মিণী কামরুন্নাহার খাতুন ও একমাত্র সন্তান কে. এম. আহনাফ তাযওয়ার (নিহাল)। স্বামী ও পিতা হিসেবে যে পরিমাণ সময় তাঁদের দেওয়া উচিত ছিলো সে পরিমাণ সময় হয়তো দেওয়া সম্ভব হয়নি।আমি তাদের প্রতি কৃতার্থ।

একটি গবেষণাকর্মের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ের মানুষের অনেক রকম সহযোগিতা থাকে; বলা বাহুল্য আমি তা প্রচুর পেয়েছি। তাদের সকলের নাম আলাদাভাবে এখানে উল্লেখ করা গেলো না। তবে সকলের প্রতি আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই।

আলমগীর হোসেন খান

সূচিপত্র

ঘোষণাপত্র, প্রত্যয়নপত্র, কৃতজ্ঞতাস্বীকার,সারসংক্ষেপ, সূচিপত্র ক-ঝ

প্রথম অধ্যায় ১-১৩

ভূমিকা

বিষয় বিবরণ ০১

সাহিত্য পর্যালোচনা ০৭

গবেষণার যৌক্তিকতা ১১

গবেষণার লক্ষ্য ১২

গবেষণা পদ্ধতি ১৩

অধ্যায় বিন্যাস ১৩

দ্বিতীয় অধ্যায় ১৪-৪৭

ধর্ম ও ধর্মবিশ্বাসের স্বরূপ সম্পর্কে কাজী নজরুল ইসলাম

ধর্ম কী ? ১৪

ধর্ম ও ধর্ম বিশ্বাস সম্পর্কে নজরুলের দৃষ্টিভঙ্গি ১৫

নজরুলের ধর্মবিশ্বাস ১৫

ধর্মের বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে নজরুল ২১

ধর্মাচার প্রসঙ্গে নজরুল ২৩

উপাসনালয় সম্পর্কিত নজরুলের চিন্তা ২৯

ধর্মান্ধতার সমালোচনায় নজরুল ৩০

নজরুলের আধ্যাত্মিকতা ৪২

তৃতীয় অধ্যায় ৪৮-৭৬

ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও স্বরূপ সম্পর্কে কাজী নজরুল ইসলাম

ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও স্বরূপ প্রসঙ্গে কাজী নজরুল ইসলাম ৪৮

ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে নজরুলের যুক্তি ৪৯

ঈশ্বরের সংখ্যা সম্পর্কে নজরুল ৫৩

ঈশ্বরের গুণাবলি সম্পর্কে নজরুলের ভাবনা ৬৬

জগতের সাথে ঈশ্বরের সম্পর্ক বিষয়ে নজরুল ৭২

চতুর্থ অধ্যায়
নৈতিকতা প্রসঙ্গে কাজী নজরুল ইসলাম ৭৭-১২২
নৈতিকতা কী? ৭৭
নৈতিকতা প্রসঙ্গে নজরুলের অবস্থান ৭৯
শিক্ষা ও নৈতিকতা ৮০
সাহিত্যচর্চা ও নৈতিকতা ৮৭
সাম্য সম্পর্কে নজরুলের ভাবনার নৈতিক তাৎপর্য ৯২
নজরুলের রাজনৈতিক ভাবনায় নৈতিকতা ১১১

পঞ্চম অধ্যায় ১২৩-১৪১
আত্মার স্বরূপ প্রসঙ্গে কাজী নজরুল ইসলাম
ধর্ম ও দর্শনে আত্মার স্বরূপ ও প্রকৃতি ১২৪
আত্মার স্বরূপ প্রসঙ্গে নজরুল ১২৭

ষষ্ঠ অধ্যায় ১৪২-১৪৫
উপসংহার

গ্রন্থপঞ্জি ১৪৬-১৫২

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

সূচনা

পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি মানুষ কোনো না কোনো ধর্ম বা নৈতিক নীতি অনুসরণ করে থাকে। কিন্তু খুব কম সংখ্যক লোক এ সকল বিষয়কে বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে গ্রহণ করে। সে কোথা থেকে এলো, কোথায় যাবে, কেউ তাকে সৃষ্টি করেছেন কিনা, যদি করে থাকেন তাহলে যিনি তাকে সৃষ্টি করলেন তাঁর স্বরূপ ও উদ্দেশ্য কী, ব্যক্তি মানুষের সাথে স্রষ্টার সম্পর্ক কী, দেহ বিনাশের সাথে আত্মার অবস্থিতি কেমন হয়, আত্মা নশ্বর না অবিনশ্বর, সমাজ তথা রাষ্ট্রের নিকট ব্যক্তি মানুষের অধিকার ও দায়বদ্ধতা কী, মানুষের প্রতি মানুষের অধিকার ও কর্তব্য কী, মানুষ তার কর্মে স্বাধীন না পরাধীন, এই সকল প্রশ্নের পাশাপাশি ক্ষুধা-দারিদ্র, সাম্য, ন্যায়পরতা ইত্যকার বিষয় সম্পর্কে ভাবার অবকাশ খুব কম লোকের মধ্যেই দেখা যায়। বাঙালিদের মধ্যে যাঁরা এই সকল বিষয়ে স্বাধীন চিন্তার মাধ্যমে মতামত প্রকাশ করেছেন, কাজী নজরুল ইসলাম তাঁদের মধ্যে অন্যতম। নজরুলের জীবন ও সাহিত্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তিনি ধর্মের সর্বজনীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন এবং ধর্মের প্রচলিত অর্থের পরিবর্তে এর অন্তর্নিহিত অর্থকে প্রাধান্য দিতেন।

নজরুল নিজেকে ধর্মীয় গোঁড়ামি ও জাতি-ধর্ম-বর্ণের ঊর্ধ্বে এক অনন্য অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। তিনি ধর্মীয় ভেদে বিশ্বাস করতেন না। তাঁর কাছে মানুষই সব। এই মানুষের মধ্যেই ঈশ্বরের অবস্থান বলে তিনি মনে করতেন। তাঁর মতে মানুষকে চিনতে পারলেই ঈশ্বরকে চেনা যায়। ধর্ম বিষয়ক ধারণার পাশাপাশি আত্মার অমরত্ব এবং নৈতিকতা সম্পর্কেও নজরুল দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী ছিলেন। ফলে বিভিন্ন ধর্ম ও নীতিদার্শনিকদের দর্শনের সাথে নজরুল ইসলামের মতের কিছু বিষয়ে মিল রয়েছে। ধর্ম ও নৈতিকতা প্রসঙ্গে কাজী নজরুল ইসলামের চিন্তা অনুসন্ধান ও তাঁর দার্শনিক বিশ্লেষণকে সামনে রেখে এই গবেষণা কর্মটি পরিচালিত হয়েছে।

বিষয় বিবরণ

কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্যে ধর্ম

কাজী নজরুল ইসলাম ২৪মে ১৮৯৯ খ্রি. মোতাবেক ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬ বঙ্গাব্দে পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার শিক্ষায় অনগ্রসর হিন্দুপ্রধান চুরুলিয়া গ্রামের মুসলিম পাড়ায় মাজারকেন্দ্রিক দারিদ্র্যপীড়িত 'কাজী পরিবারে' পিতা ফকির আহমদ ও মাতা জাহেদা খাতুনের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন।[১] গ্রামের মক্তব থেকে নিম্ন প্রাইমারি পাশ করা বালক নজরুল মাত্র নয়

[১] গোলাম মুরশিদ, *বিদ্রোহী রণক্লান্ত: নজরুল জীবনী* (ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন, ২০১৮), পৃ. ২৪-৭।

বছর বয়সে ১৯০৮ সালে পিতার মৃত্যুর পর কিছুটা বংশীয় ধারাবাহিকতায় অনেকটা সংসারের অভাব মেটানোর জন্য মক্তবের শিক্ষকতা, মসজিদের ঈমামতি ও মাজারের খাদেমকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে বাধ্য হন। এ সময় তিনি ইসলাম ধর্মের নানা বিধি-বিধান সম্পর্কে জ্ঞাত হন। তাছাড়া একদিকে হিন্দুপ্রধান গ্রামের মুসলিম পাড়ায় জন্মগ্রহণ করায় হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের যৌথ সংস্কৃতির প্রভাব নজরুলের উপরে যেমন পড়েছিলো অপরদিকে তেমনি প্রবল ধর্মীয় সুফিবাদী পরিবারে জন্ম নেওয়ায় তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ভক্তি ও রহস্যবাদের সম্মিলন ঘটেছিলো লক্ষণীয় মাত্রায়।[২]

ধর্মীয় পরিবেশে বেড়ে উঠা নজরুলের উপর তাই 'ধর্মীয় মনস্তত্ব'-এর প্রভাব লক্ষণীয়। ধর্মের প্রতি নজরুলের আস্থা ও ভক্তি ছিলো গভীর।[৩] তাছাড়া তৎকালীন সমাজ বাস্তবতাও তাঁর ধর্মচিন্তার ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলেছিলো। ফলে নজরুল কখনোই ধর্মবিমুখ হতে পারেন নি। তাই সাহিত্যালোচনায় তিনি সচেতনভাবে ধর্মীয় অনুসর্গ ব্যবহার করেছেন। তিনি যেমন রচনা করেছেন ইসলামি সাহিত্য তেমনি রচনা করেছেন হিন্দু সাহিত্য। অনুরূপভাবে যেখানে ইসলামি অনুসর্গের ব্যবহার করেছেন সেখানেই হিন্দু দেব-দেবীর কথা উল্লেখ করেছেন। এ প্রসঙ্গে নজরুল গবেষক হারুন-অর-রশীদ বলেন-

> এককভাবে দেখলে নজরুলকে কখনও মনে হতে পারে নিষ্ঠাবান মুসলমান। কখনও বা ব্রতচারী হিন্দু। কালীভক্ত। রসুলপ্রেমিক। কিন্তু সমন্বিত ও সামগ্রিক বিচারে তিনি মানুষ বৈ অন্য কিছু নন। মহাপ্রাণ মানুষ। সেখানে কালীও বড় নয়। রসুলও নয়। এমন কি আল্লাহ-ভগবানের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিযোগিতা নেই সেখানে।[৪]

নজরুল মনে করতেন ধর্ম সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, ফলে তা বিশ্বজনীন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন- "ধর্ম সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সত্য চিরদিনই বিশ্বের সকলের কাছে সমান সত্য। এইখানেই বুঝা যায় যে, কোনো ধর্ম শুধু কোনো এক বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের জন্য নয়, তাহা বিশ্বের।"[৫] তাই তিনি ধর্মের সেই মূলবাণীকে গ্রহণ করতে বলেছিলেন যেখানে সকল ধর্মের অনুসারীদের ভাই বলে সম্বোধন করা যায়, সব সঙ্কীর্ণতা ও মিথ্যাকে পরিহার করা যায় এবং একটি সর্বজনীন ভ্রাতৃত্বপূর্ণ ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়। সকল ধর্মের অনুসারীদের প্রতি তাঁর আহ্বান হচ্ছে- "এস ভাই হিন্দু! এস মুসলমান! এস বৌদ্ধ! এস ক্রিশ্চিয়ান! আজ আমরা সব গণ্ডি কাটাইয়া, সব সঙ্কীর্ণতা, সব মিথ্যা, সব স্বার্থ চিরতরে পরিহার করিয়া প্রাণ ভরিয়া ভাইকে ভাই বলিয়া

---

[২] তদেব, পৃ. ২৭।

[৩] আহমদ শরীফ, *একালে নজরুল* (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২০১৫) পৃ. ৯৯।

[৪] মোঃ হারুন–অর-রশীদ, *নজরুল সাহিত্যে ধর্ম*, ২য় সং (ঢাকা: বইপত্র, ২০০২) পৃ. ৬৪।

[৫] কাজী নজরুল ইসলাম, "নবযুগ," 'যুগবাণী,' অন্তর্গত,*নজরুল-রচনাবলী*, ১ম খন্ড, জন্মশতবর্ষ সংস্করণ (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৬), পৃ. ৩৯১। অতপর খণ্ডসংখ্যাসহ নর নিখিত হবে।

ডাকি!"[৬] নজরুলের আরও আহ্বান- "আমার ধর্ম যেন অন্য ধর্মকে আঘাত না করে, অন্যের মর্মবেদনার সৃষ্টি না করে।"[৭] নজরুলের উপলব্ধি এই যে, যেখানে ভগবানের আশীষধারা বৃষ্টিরূপে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলের ঘরে ও মাঠে সমানভাবে বর্ষিত হয় সেখানে কেনো মানুষ শুধু ধর্মের দোহাই দিয়ে পক্ষপাতিত্ব করবে? খোদা তো কোনোরূপ পক্ষপাতিত্ব করেন না।

ধর্মের এই মূলবাণীকে উপেক্ষা করে যারা এর অংশ নিয়ে বাড়াবাড়ি করে এবং যে ধর্ম মানুষে-মানুষে বিভেদ তৈরি করে, সেই ধর্মান্ধগোষ্ঠী ও ধর্মীয় ভণ্ডামীকে নজরুল কঠোরভাবে সমালোচনা করেন। ছুৎমার্গের সমালোচনা করতে গিয়ে নজরুল বলেন–"এই ধর্মেই নরকে নারায়ণ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। কি উদার সুন্দর কথা! মানুষের প্রতি কি মহান্ পবিত্র পূজা! আবার সেই ধর্মেরই সমাজে মানুষকে কুকুরের চেয়েও ঘৃণ্য মনে করিবার মতো হেয় জঘন্য এই ছুৎমার্গ বিধি! কি ভীষণ অসামঞ্জস্য!"[৮]

নজরুলের মতে, পৃথিবীর প্রতিটি ধর্মই মানুষের কল্যাণে অবতীর্ণ হয়েছে, মানুষকে শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে আখ্যা দিয়েছে। কিন্তু কিছু স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী তথা মোল্লা-পুরুত ধর্মের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে মানুষের মধ্যে ভেদ তৈরি করেছে এবং এক ধর্মের অনুসারীকে অন্য ধর্মের অনুসারীদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলছে। নজরুলের এই দিকটি বর্ণনা করতে গিয়ে রমেন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন-

> মোল্লা এবং পুরুতদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে নজরুলের মত হলো, তাদের আচার আছে, কিন্তু বিচার নেই, তারা ধর্মের কথা বলে–কিন্তু তাদের হৃদয় নেই, মানবতা নেই, যারা ভুখানাঙ্গা মানুষের সামনে খাবারগুলো লুকিয়ে মসজিদ ও মন্দিরের দরজায় তালা লাগায়, তারা নীতিভ্রষ্ট।[৯]

শুধু তাই নয় দেশপ্রেমে উজ্জীবিত নজরুল দেশকে পরাধীনতার হাত থেকে মুক্ত করার জন্য নামাজের চেয়ে জিহাদকে বেশি অগ্রাধিকার দিয়েছেন। ইসলাম ধর্মেও দেশপ্রেমকে ঈমানের অঙ্গ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। নজরুল মনে করেন, অধিকাংশ ধর্মানুসারী ধর্মরক্ষার জন্যই হোক আর দেশপ্রেমের জন্যই হোক কেউ জিহাদের কথা বলে না; নামাজের মধ্যেই যেনো তারা মুক্তি খোঁজে। অথচ ঈমানই যদি না থাকে, মুসলমানই যদি না থাকে, তবে ইসলাম বাঁচবে কাকে আশ্রয় করে ? নজরুল সেই জিহাদই করেছেন বলে মনে করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন-

> আমাদের বাঙালি-মুসলমানের সমাজ, নামাজ পড়ার সমাজ। যত রকম পাপ আছে করে যাও– তার জবাবদিহি করতে হয় না এ সমাজে, কিন্তু নামাজ না পড়লে তার কৈফিয়ত তলব

---

৬ "নবযুগ,"'যুগবাণী,' নর ১ম,পৃ.৩৭৩।

৭ "তরুণের সাধনা,"'অভিভাষণ,' নর ৮ম, পৃ. ১৫।

৮ "নবযুগ," 'যুগবাণী,'নর ১ম,পৃ.৩৯২।

৯ রমেন্দ্রনাথ ঘোষ, "বাঙালির দার্শনিক আদর্শ: সামাজিক মানবতাবাদ," অন্তর্গত, হাসান আজিজুল হক ও মহেন্দ্রনাথ অধিকারী সম্পা.,*রমেন্দ্রনাথ ঘোষ: দার্শনিক প্রবন্ধাবলী* (ঢাকা: ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ২০১৪), পৃ. ২২৭।

হয়। অথচ কোরানে ৯৯৯ জায়গায় জেহাদের কথা এবং ৩৩ জায়গায় সালাতের বা নামাজের কথা বলা হয়েছে।[১০]

নজরুল যেমন সব ধর্মের মানুষের মধ্যে একটি ঐক্যের প্রত্যাশী ছিলেন তেমনি নিজ ধর্ম তথা ইসলামের অনুসারীদের দৈনন্দিন ধর্ম পালনের ক্ষেত্রে যে অনুষ্ঠান সর্বস্বতা দেখা যেতো তারও সংস্কারের প্রত্যাশী ছিলেন। তিনি মনে করতেন যারা শুধুমাত্র নামাজ-রোজা পালন করেই নিজের মুক্তি খোঁজে অথচ দরিদ্র, নিরন্ন-অসহায়দের মুক্তির জন্যে পাশে দাঁড়ায় না বরং সম্পদের বিশাল পাহাড় গড়ে তুলছে তারা পথভ্রষ্ট, অন্ধ ও ভ্রান্ত। নজরুলের প্রশ্ন এমন ধর্ম পালনের উপযোগিতা নিয়ে। তিনি বলেন-

নামাজ-রোজার শুধু ভড়ং
ইয়া উয়া পরে সেজেছ সং,
ত্যাগ নাই তোর এক ছিদাম!
কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা করো জড়ো
ত্যাগের বেলাতে জড়সড়!
তোর নামাজের কি আছে দাম?[১১]

ধর্মের মূলবাণীকে যারা উপলব্ধি করতে চায় না; বরং ঈশ্বরকে তাদের নিজ নিজ সম্পত্তিতে পরিণত করে, নজরুল তাদের উদ্দেশ্যে ধর্মের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে ঈশ্বরের পরিচয় তুলে ধরেন। তাঁর মতে, বিভিন্ন ধর্মের লোকেরা ঈশ্বরকে বিভিন্ন নামে বিভক্ত করে তাঁর পূজা-অর্চনা করে থাকলেও আসলে তিনি এক। কিন্তু তাঁর মতে, মূর্খের দল তা না বুঝে তাকে খণ্ডিতভাবে দেখে থাকে। যে মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের অবস্থান, সেই মানুষকে ভণ্ডের দল দাড়ি-টুপি-টিকির মাধ্যমে আলাদা জাতিতে বিভক্ত করে থাকলেও নজরুলের ভরসা সেই ঈশ্বরের উপর যাকে পূজারিরা আলাদা করলেও তিনি পূজারিদেরকে ভিন্ন চোখে দেখেন না।

একেশ্বরে বিশ্বাসী নজরুল ঈশ্বরকে দেখেছেন ‘সর্বনাম’ হিসেবে যেখানে সব নাম গিয়ে মিশেছে তাঁর সাথে। তাঁর দৃষ্টিতে আল্লাহ, হরি, শিব, বিষ্ণু, নারায়ণ যে নামেই সৃষ্টিকর্তাকে ডাকি না কেনো, তিনি সাড়া দেন। যেমন তিনি বলেন-

সাড়া দেন তিনি এখানে তাঁহারে যে নামে যে কেহ ডাকে,
যেমন ডাকিয়া সাড়া পায় শিশু যে নামে ডাকে সে মা‘কে” ।[১২]

---

[১০] “পত্রাবলী,”নর ৯ম, পৃ. ১৯২।

[১১] “ভাঙার গান,”নর ১ম, পৃ. ১৭৯।

[১২] “সাম্যবাদী,”‘সাম্যবাদী,’নর ২য়, পৃ.৯৩।

নর ও নারায়ণের মধ্যে যেমন কোনো ভেদ নেই বলে নজরুল মনে করেন, তেমনি মনে করেন যে, মুসলমানের আল্লাহ ও হিন্দুর ভগবানের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। তাঁর মতে, 'আল্লাহ ও হরির মধ্যে ভিন্ন ভাবে যারা পাগল তারা'।[১৩] তাঁর কোনো জাত নেই। তিনি সকলের।

ঈশ্বরকে তিনি আবার দেখেছেন 'পরম সুন্দর' হিসেবে। আর তাঁর সারাটা জীবন কেটেছে সেই 'সুন্দর' এর স্তবগান করেই। সেই 'সুন্দর' তাঁর নিকট কখনো 'সত্য সুন্দর' কখনো 'আনন্দ সুন্দর' আবার কখনো বা 'বেদনা সুন্দর' হয়ে এসেছেন। ভক্তরা ঈশ্বর পূজা করে ভয়ে, কিন্তু নজরুল ঈশ্বর পূজা করেন ভালবেসে, অন্তর দিয়ে। তাঁর শরীরের প্রতিটি শিরায় শিরায় তিনি অনুভব করেন ঈশ্বরের অস্তিত্বকে। কেননা তাঁর মতে মানবাত্মা বিশ্বাত্মারই অংশ। এদিক থেকে ঈশ্বরের প্রতি তথা ধর্মের প্রতি রয়েছে তাঁর গভীর অনুরাগ।

অশুভের সমস্যা বিষয়টি উপস্থাপন করে শুভের ঈশ্বর হিসেবে 'আহুরা মাজদা' এবং অশুভের ঈশ্বর হিসেবে 'আহরীন' কে প্রতিষ্ঠিত করে যারা দ্বি-ঈশ্বরবাদ অথবা নিরীশ্বরবাদের প্রচার করেন নজরুল তাদের সমালোচনা করে 'অশুভ'কে 'শুভ' এর উপায় হিসেবে দেখেন এবং একেশ্বরের পক্ষে জোরালো বক্তব্য উপস্থাপন করেন। নজরুলের মতে, আপাতদৃষ্টিতে যেটাকে আমরা অশুভ বলে মনে করি আসলে তার ভেতরেও রয়েছে ঈশ্বরের মঙ্গলেচ্ছা। তিনি পূর্ণতম সত্তা।

ঈশ্বর সম্পর্কে আলোচনা করতে যেয়ে নজরুল বারংবার মানুষের কাছে ফিরে এসেছেন। কেননা তাঁর মতে ঈশ্বরের অবস্থান এই মানুষের হিয়ার মধ্যে। যেমন নজরুল বলেন-

কেন খুঁজে ফেরো দেবতা-ঠাকুর মৃত-পুঁথি-কঙ্কালে?
হাসিছেন তিনি অমৃত-হিয়ার নিভৃত অন্তরালে !"[১৪]

জগতের সাথে ঈশ্বরের সম্পর্ক বিষয়ক মতবাদ 'ঈশ্বরবাদ' এর পক্ষে তাঁর সমর্থন। ঈশ্বর একই সাথে জগতের অন্তর্বর্তী আবার অতিবর্তী বলে তিনি মনে করেন, যা তাঁর সাহিত্যে প্রতিভাত হয়েছে।

কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্যে নৈতিকতা

নৈতিকতা শব্দটি মানুষের আচরণের সাথে সম্পর্কিত একটি প্রত্যয়। আচরণের ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, উচিত-অনুচিত প্রভৃতি বিষয়সমূহের নির্দেশক হলো নৈতিকতা। নৈতিকতাকে একটি আদর্শিক মানদণ্ড বলা যেতে পারে যা বিভিন্ন অঞ্চলের সামাজিকতা, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ধর্ম প্রভৃতি মানদণ্ডের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। আবার অনেক ক্ষেত্রে, সামগ্রিকভাবে সমগ্র পৃথিবীর জন্য

[১৩] হারুন-অর-রশীদ, নজরুল সাহিত্যে ধর্ম, পৃ. ৬০।

[১৪] "সাম্যবাদী," 'সাম্যবাদী,'নর ২য়, পৃ. ৭৯।

কল্যাণকর বিষয়সমূহকেও নৈতিকতা হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। ব্যাপক ও দীর্ঘস্থায়ী মানবকল্যাণই নৈতিকতার আসল উদ্দেশ্য। ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবনের যাবতীয় হিংসা-বিদ্বেষ, দ্বন্দ্ব-সংঘাত, যুদ্ধ-ক্ষুধা-দারিদ্র, মারামারি-হানাহানি দূর করে সকল ধর্মের সহাবস্থানের মাধ্যমে একটি বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সমাজ বিনির্মাণই নৈতিকতার শিক্ষা।

নজরুল সারাটা জীবন যাবতীয় অন্যায়, অবিচার, অসাম্যের পরিবর্তে ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার কাজে অতিবাহিত করেছেন। তিনি যেখানেই অন্যায় দেখেছেন সেখানেই প্রতিবাদ করেছেন। পরিণামে জেল খেটেছেন, তবুও ন্যায়ের পথ থেকে তিনি পিছপা হন নি। যার প্রতিফলন দেখা যায় তাঁর পুরো সাহিত্যে। চাষীদের, মুটেদের, মজুরদের পক্ষে তিনি তাঁর লেখনির মাধ্যমে যুদ্ধ করেছেন। অনৈতিক ও অন্যায় কাজ দেখে, অত্যাচারিত এবং মজলুমকে তাদের পক্ষে নেওয়ার পরিবর্তে শুধুমাত্র ঈশ্বরের আরোধনা করেই যারা দায়িত্ব শেষ করেছেন, নজরুল তাদের সমালোচনা করেছেন। সকলের স্বাধীনতা ও মুক্তির মধ্যেই প্রকৃত সুখ ও সফলতা বলে তিনি মনে করতেন। এজন্য নজরুলের চিন্তায় নৈতিকতার মানদণ্ড হিসেবে 'পরার্থবাদ' এর সমর্থন দেখা যায়। তিনি বরাবরই বৃহত্তর স্বার্থে ব্যক্তিস্বার্থকে ত্যাগ করার পক্ষে ছিলেন। তিনি মনে করতেন একমাত্র যুবকেরাই পারে আত্মস্বার্থ ত্যাগ করে পরার্থপরতায় জীবন বিলিয়ে দিতে। তাই নজরুলকে যৌবনের শক্তির উপর নির্ভর করতে দেখা যায়। অপাঙ্‌ক্তেয়, অসুন্দর, অসাম্য, অন্যায়কে দূর করে একটি সত্য, সুন্দর, সাম্য ও শোষণহীন সমাজ বিনির্মাণে তিনি বরাবরই যুবকদের আহ্বান করেছেন। তাঁর বিশ্বাস তরুণরাই জাতি-ধর্ম-বর্ণ এর মধ্যকার বিদ্বেষ-আভিজাত্য-অভিমান দূর করতে সক্ষম হবে। তরুণদের মধ্যে তিনি যেনো সেই ধ্বনির প্রতিধ্বনি শুনতে পান। নজরুল বলেন- "ঐ শোন তরুণ কন্ঠের বীরবাণী, –আমাদের মধ্যে ধর্ম-বিদ্বেষ নাই, জাতি-বিদ্বেষ নাই, বর্ণ-বিদ্বেষ নাই, আভিজাত্য-অভিমান নাই।"[১৫] দরিদ্রদের প্রতি অবিচার, অন্যায় দেখে নজরুল ক্ষীপ্ত হন। ন্যায় ও সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য শ্রমিক, মুটে-মজুরদের পক্ষে সংগ্রামে নামতেও তাঁর আপত্তি নেই।

নজরুল সমাজের যা কিছু বাতিল, ন্যায় সমাজ প্রতিষ্ঠার পরিপন্থী, যা কিছু জাতিতে জাতিতে ভেদাভেদ তৈরি করে সে সকল বিষয়কে সমূলে উৎপাটিত করার জন্য যুবকদের আর কারো শাসন না মেনে বিবেকের শাসন মেনে চলার আহ্বান জানান। এ জন্য তিনি নৈতিক সমস্যা সম্পর্কীয় দারিদ্র ও যুদ্ধ, ন্যায়পরতা ও সাম্য, শ্রেণি ও বর্ণ প্রভৃতি বিষয় সাহিত্যের মাধ্যমে বারংবার আলোচনা করেছেন।

---

[১৫] "নবযুগ,"'যুগবাণী,' নর ১ম, পৃ. ৩৭৩।

নৈতিকতার আলোচনায় নজরুল বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করেন। শাসক-শোষিত, ধনী-গরিব, তরুণ বা যুবকদের কর্তব্য কী, শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি হওয়া উচিত প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর রয়েছে সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা। সমাজ এবং রাষ্ট্রের প্রতি তার নাগরিকদের কি কর্তব্য রয়েছে এবং নাগরিকদের প্রতি সমাজ বা রাষ্ট্রের কি কর্তব্য সে সম্পর্কেও তিনি আলোচনা করেছেন।

ইমানুয়েল কান্টের ন্যায় নজরুলও বিশ্বাস করতেন, পাপ করলে তাকে শাস্তি পেতে হবে। যেহেতু দেখা যায়, অনেক অপরাধীই শাস্তিহীনভাবে জীবন-যাপন করছে এবং অনেক নিরপরাধী শাস্তি পাচ্ছে সেহেতু এমন একটি ব্যবস্থা থাকতে হবে যাতে করে ব্যক্তি তার কর্মের প্রতিফল যথাযথভাবে পেতে পারে। এ প্রসঙ্গে নজরুলের উক্তি "অত্যাচারীকে অত্যাচারের প্রতিফল ভোগ করিতেই হইবে।[১৬] আর এর জন্যই পুনরুত্থান বা পুনর্জন্মের এমন ব্যবস্থা থাকতে হবে যাতে করে ব্যক্তি তার আসল কর্মফল প্রাপ্ত হতে পারে। একই সাথে আত্মার অমরত্ব বিষয়ক দার্শনিক যুক্তি, কর্মবাদ, পুনর্জন্ম অথবা পুনরুত্থান সম্পর্কীয় ধর্মীয় চিন্তার পাশাপাশি দার্শনিক চিন্তা তাঁর সাহিত্যে আলোচিত হয়েছে।

নৈতিক জীবনের স্বীকৃত সত্যের মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস স্থাপন করা প্রয়োজন। নজরুলকে ঈশ্বরের অস্তিত্ব এবং পরকালে বিশ্বাস স্থাপনের পাশাপাশি আত্মার অমরত্বেও সমানভাবে বিশ্বাস স্থাপন করতে দেখা যায়। যার কারণে নজরুল আত্মার স্বরূপ ও অমরত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন। আত্মা নশ্বর, না অবিনশ্বর এই দার্শনিক প্রশ্নে দার্শনিকদের মধ্যে যে বিতর্ক আছে, সে বিতর্কে নজরুলের অবস্থান দ্বিতীয়টির পক্ষে। নজরুল মনে করেন পৃথিবীতে কোনো কিছুই নশ্বর নয়, যে-রূপেই হোক আর যে-লোকেই হোক তা অস্তিত্বশীল। তিনি এও মনে করেন যে আত্মার অবস্থান দেহের অতীত। দেহ বিনাশের সাথে সাথে অমর আত্মা তার আবাসস্থল রূহের জগতে অবস্থান করে। নজরুলের এই দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে আত্মা সম্পর্কীয় বস্তুবাদী ব্যাখ্যার বিপরীতে ভাববাদী ব্যাখ্যার দিকটি স্পষ্টত লক্ষণীয়।

সাহিত্য পর্যালোচনা

'নজরুল সাহিত্যে ধর্ম' শীর্ষক পিএইচডি অভিসন্দর্ভে মোঃ হারুন-অর-রশীদ কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্যে ধর্মীয় চিন্তা বিষয়ক আলোচনায় বাল্যকালের ধর্মীয় আবহে লালিত-পালিত নজরুল কিভাবে পরবর্তীতে ধর্মনিরপেক্ষতার দিকে অগ্রসর হয়েছেন তা আলোচনা করেছেন। সাহিত্যালোচনার ক্ষেত্রে নজরুল ধর্মের সেই দিকটিকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন যেটি মানবের মধ্যকার ভেদাভেদ দূর করে একটি অসাম্প্রদায়িক সৌহাদ্যপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠার পরিপূরক হয়।

[১৬] "গেছে দেশ দুঃখ নাই, আবার তোরা মানুষ হ," 'যুগবাণী,' নর ১ম, পৃ. ৩৭৫।

আনুষ্ঠানিক ধর্মের চেয়ে তিনি গুরুত্ব দিতেন এর অন্তর্নিহিত অর্থের দিকে। ফলে প্রথাগত ধর্মের বিধি-বিধান পালনের চেয়ে মানবমুক্তিকে দেখেছেন তিনি মুখ্য ইবাদত হিসেবে।[১৭]

'নজরুলের মানবতাবাদী দর্শন' শীর্ষক পিএইচডি অভিসন্দর্ভটিতে রেজিনা আকতার আলম নজরুলসাহিত্যের মানবতাবাদের চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে দেখিয়েছেন নজরুল মানব ধর্মকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি মনে করতেন মানুষের জন্য ধর্ম, ধর্মের জন্য মানুষ নয়, এবং সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই, ছুৎমার্গের অভিশাপ থেকে মুক্ত, লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণ, ধর্মীয় ভেদাভেদের নির্মূল প্রভৃতি বিষয় ছিলো নজরুলের সাহিত্যের মূল আলোচ্য বিষয়। এ ক্ষেত্রে তিনি নর ও নারায়ণের মধ্যে কোনো পার্থক্য করেননি।[১৮]

"কাজী নজরুল ইসলামের গানে আধ্যাত্মিকতা ও ভাবদর্শন" প্রবন্ধে টুম্পা সমদ্দার দেখিয়েছেন, নজরুল আল্লাহকে কেন্দ্রীয় বিষয় করে তাঁর অভিমুখে যাত্রা করেছেন। তবে তিনি কোনো গোঁড়ামিকে স্থান দেননি বরং সারা জীবন হিন্দু-মুসলিমের মিলনই কামনা করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি শোষণ, বৈষম্য আর সাম্প্রদায়িক প্রভেদকে ছিন্ন করে মানুষের কল্যাণ তথা মানবতাবাদের জয়গান গেয়েছেন। এ জন্য তিনি আল্লাহ, কালী ও কৃষ্ণকে একই জায়গায় স্থান দিয়েছেন। তাঁদেরকে তিনি ডেকেছেন নাথ, প্রভু, প্রিয়, দেবতা, সখা, বন্ধু, আল্লাহ, ভগবান, নারায়ণ, হরি, সুন্দর প্রভৃতি নামে। তিনি আরও দেখিয়েছেন, নজরুলের গানে আধ্যাত্মিকবোধ, পারলৌকিক চিন্তা-চেতনা, ইহলৌকিক বোধ ও ধ্যান-ধারণা, বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা, সৃষ্টিরহস্য, মানুষের নিয়তি ও চরম পরিণতি, জন্মান্তরবাদ, আত্মদর্শন প্রভৃতি আলোচিত হলেও তাঁর অধ্যাত্মবাদের মূল পরিণতি অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও মানবতাবাদ।[১৯]

"বিদ্রোহী, প্রেমিক ও মানবতাবাদী কবি নজরুল" প্রবন্ধে জহিরুল হক নজরুলের বিদ্রোহ, প্রেম ও মানবতা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে দেখিয়েছেন, নজরুল বিদ্রোহ করেছেন মানুষে মানুষে প্রেমের জন্যে, মানবতার জন্য। আর প্রেমই মানবতা আবার মানবতাই প্রেম। নজরুল জাত-বর্ণ-ধর্ম এর উপরে মানুষকে স্থান দিয়েছেন। তাঁর মতে, মানবের মধ্যেই পরমাত্মার অবস্থান, এই মানব দেহের মতো পবিত্র কোনো স্থান নেই। সব ধর্মগ্রন্থের মূলমন্ত্র মানুষের হৃদয়ের মধ্যেই সংকলিত। আর তা হচ্ছে মানবতাবোধ ও সমতার দৃষ্টিভঙ্গি। মানুষের মধ্যেই রয়েছে সব ধর্ম, সব যুগাবতার বা প্রেরিত

[১৭] হারুন-অর-রশিদ, "নজরুলের সাহিত্যে ধর্ম" (পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৮।

[১৮] রেজিনা আকতার আলম, "নজরুলের মানবতাবাদী দর্শন" (পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, দর্শন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০১)।

[১৯] টুম্পা সমদ্দার,"কাজী নজরুল ইসলামের গানে আধ্যাত্মিকতা ও ভাবদর্শন," *নজরুল ইন্সটিটিউট পত্রিকা*, বত্রিশতম সংকলন ২০১৬, পৃ. ২০০-০৫।

পুরুষ। মানুষের হৃদয় মন্দিরেই সব দেবতার অবস্থান। বিদ্রোহ, প্রেম ছাড়িয়ে তাঁর যে সত্তাটি প্রধান হয়েছে তা হলো মানবসত্তা বা মনুষ্যত্ব।[২০]

"নজরুলের অধ্যাত্মচিন্তা: ভক্তিগীতি" প্রবন্ধে বীরেন মুখার্জী নজরুলের ঈশ্বরবন্দনামূলক সংগীতের বর্ণনা দিয়েছেন। সেখানে তিনি দেখিয়েছেন যে, নজরুল শ্যামা, শাক্ত, আগমনী, কীর্তন ও ভজন সংগীতের মাধ্যমে যেমন হিন্দু দেব-দেবীর প্রশস্তিসূচক ঈশ্বরবন্দনা করেছেন, ঠিক তেমনি তিনি ইসলাম ধর্মের হামদ, নাত, গজল প্রভৃতি রচনা করেছেন। গান, কবিতা, গল্পের মাধ্যমে তিনি এই আহ্বানই করেছেন যাতে করে মানুষে মানুষে হিংসা-বিদ্বেষ দূর হয়, প্রতিষ্ঠিত হয় এক সাম্যাবস্থা যার সবচেয়ে বড় ধর্ম হবে 'মানুষ-ধর্ম'।[২১]

"নজরুলের ধর্ম চেতনা" শীর্ষক প্রবন্ধে আনোয়ারুল হক নজরুলকে দেখেছেন সার্বভৌম স্রষ্টার একত্ববাদে পরিপূর্ণ বিশ্বাসী একজন আগাগোড়া মানবতাবাদী কবি হিসেবে। যিনি প্রেমিকের অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে সব ধর্মের মূল একত্ববাদের মধ্যেই মানুষের মুক্তি প্রত্যক্ষ করেছেন এবং মানুষের মধ্যকার ভেদাভেদকে অস্বীকার করে ধর্মের প্রকৃত অধিষ্ঠান মানুষের অন্তরে বলে মত প্রকাশ করেছেন। বিশ্বমানবতার ধর্ম একটাই, যে ধর্মে মানুষের চেয়ে বড় আর কিছুই নেই। সকল ধর্মের ঊর্ধ্বে হৃদয়ধর্মকে তিনি মহামানবের উত্তরাধিকার বলে ঘোষণা করেছেন। ধর্ম বিভক্তি সত্ত্বেও তিনি মনে করেন সব মানুষ এক মৌলিক সত্তার অধিকারী। মানুষের মধ্যেই ঈশ্বরের অবস্থান।[২২]

"নজরুল সঙ্গীতে ইসলাম ধর্ম: একটি পর্যালোচনা" শীর্ষক প্রবন্ধে মাফরুহা হোসেন সেঁজুতি দেখিয়েছেন নজরুল ইসলামি প্রথা অনুসারে নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত; আল্লাহ-এর প্রশস্তিমূলক গান হামদ; মহানবীর প্রশস্তিমূলক গান নাত; আজান, মোহররম, কোরবানির ঈদ, রমজানের ঈদ, শবে বরাত, শবে কদর, শবে-মিরাজ ইত্যাদি ছাড়াও অসংখ্য ধর্মীয় পবিত্র স্থানের মহিমার বর্ণনামূলক গান রচনা করেছেন। তিনি হিন্দু দেব-দেবীর নামেও অসংখ্য গান রচনা করেছেন। তবে নজরুল বিশ্বাস করতেন ইসলাম ধর্ম একটি শ্রেষ্ঠ ধর্ম।[২৩]

"নজরুলের উপন্যাসে অসাম্প্রদায়িক চেতনা" নামক প্রবন্ধে কাজী সাহানা সুলতানা দেখিয়েছেন যে, নজরুল তাঁর তিনটি উপন্যাসের বিষয়বস্তু নির্ধারণ, চরিত্র নির্বাচন এবং সংলাপ ও

---

[২০] জহিরুল হক, "বিদ্রোহী, প্রেমিক ও মানবতাবাদী কবি নজরুল," তদেব, পৃ. ৮৩-৯২।

[২১] বীরেন মুখার্জী , "নজরুলের অধ্যাত্মচিন্তা: ভক্তিগীতি," *নজরুল ইন্সটিটিউট পত্রিকা*, চৌত্রিশতম সংকলন ২০১৭, পৃ. ২৭-৩৪।

[২২] আনোয়ারুল হক, "নজরুলের ধর্ম চেতনা," *নজরুল ইন্সটিটিউট পত্রিকা*, একত্রিশতম সংকলন ২০১৫, পৃ.৪৫-৫০।

[২৩] মাফরুহা হোসেন সেঁজুতি, "নজরুলের সঙ্গীতে ইসলাম ধর্ম: একটি পর্যালোচনা," *নজরুল ইন্সটিটিউট পত্রিকা*, একত্রিশতম সংকলন ২০১৫, পৃ.২৭-৩৩।

ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে অসাম্প্রদায়িক চেতনার পরিচয় দিয়েছেন। বিষয়বস্তু নির্ধারণে যেমন তিনি হিন্দু-মুসলমানের মিলনকে প্রাধান্য দিয়েছেন, চরিত্র এবং ভাষা নির্বাচনের ক্ষেত্রে তেমনি তিনি মুসলিম চরিত্র ও শব্দ ব্যবহারের পাশাপাশি হিন্দু চরিত্র ও শব্দের ব্যবহার করেছেন।[২৪]

"নজরুল সংগীতে মৃত্যুভাবনা" শীর্ষক প্রবন্ধে লীনা তাপসী খান নজরুলের ছয়টি গানের আলোচনার মাধ্যমে যুবক নজরুলের মনের মৃত্যুভাবনাকে প্রকাশ করেছেন। জীবন্ত নজরুল কিভাবে কল্পজগতে চিরতরে চলে যান, সেখান থেকেও কবিপ্রিয়ার করুণা না প্রকাশের আহ্বান, মুয়াজ্জিনের আজান শোনার আকুতি প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। এখানে কবি যেন কবরে শুয়েও চেতন সম্পন্ন। মৃত্যুকে তিনি যেন মৃত্যুঞ্জয়ী করে তুলেছেন।[২৫]

"নজরুলের কবিতায় পুরাণের ব্যবহার" শীর্ষক প্রবন্ধে মাওলা প্রিন্স দেখিয়েছেন যে, নজরুল বাল্যকালের পুরাণের জাদুময়তা, কৈশোর বয়সের ধর্মীয় মধুরতা এবং যৌবনের দৈশিক সমাজবাস্তবতা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সাহিত্যে পুরাণের ব্যবহার করেছেন যার মূল উদ্দেশ্য হলো হিন্দু-মুসলমানকে একত্রিত করার এক রাজনৈতিক নান্দনিকতা।[২৬]

"নজরুল মানস: প্রসঙ্গ অসাম্প্রদায়িকতা" শীর্ষক প্রবন্ধে বিশ্বজিৎ ঘোষ দেখিয়েছেন কায়েমি স্বার্থবাদী মহলের অপপ্রচার সহ্য করে সত্য-সুন্দর-কল্যাণের পূজারি নজরুল সাম্যবাদী চিন্তার ফলে বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার জন্যে সচেতনভাবে মুসলিম শব্দের পাশাপাশি হিন্দু শব্দের ব্যবহার করেছেন। ধর্মের বিরোধিতা নয় বরং ধর্ম-ব্যবসায়ীদের বিরোধিতা তিনি করেছেন। মানবধর্মকে তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন মানুষের হৃদয়ের চেয়ে বড় কোনো মন্দির-কাবা নেই।[২৭]

গোলাম মুরশিদ রচিত গবেষণাধর্মী নজরুল জীবনীগ্রন্থ 'বিদ্রোহী রণক্লান্ত'তে দেখিয়েছেন যে, ধর্মীয় অলৌকিকতা, অতিলৌকিকতা, আধ্যাত্মিকতা ও রহস্যময়তার পরিবেশে বেড়ে উঠা নজরুলের ধর্মচিন্তায় কিভাবে বিবর্তন ঘটেছে। বালক নজরুল ছিলো ধার্মিক, কিন্তু কৈশোর ও যৌবনের প্রারম্ভের নজরুল যেনো ধর্ম থেকে পালিয়ে বেড়াতেন, কিন্তু বুলবুলের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আধ্যাত্মিকতার দিকে অগ্রসর হন। বুলবুলের মৃত্যু, স্ত্রী প্রমীলার অসুস্থতা নজরুলকে ব্যাকুল করে

---

[২৪] কাজী সাহানা সুলতানা, "নজরুলের উপন্যাসে অসাম্প্রদায়িক চেতনা," *নজরুল ইন্সটিটিউট পত্রিকা*, একত্রিশতম সংকলন ২০১৫, পৃ.৯৩-৭।

[২৫] লীনা তাপসী খান, "নজরুল-সংগীতে মৃত্যুভাবনা," *নজরুল ইন্সটিটিউট পত্রিকা*, চৌত্রিশতম সংকলন ২০১৭, পৃ.২২-৬।

[২৬] মাওলা প্রিন্স, "নজরুলের কবিতায় পুরাণের ব্যবহার," *নজরুল ইন্সটিটিউট পত্রিকা*, চৌত্রিশতম সংকলন ২০১৭, পৃ.৩৫-৬৩।

[২৭] বিশ্বজিৎ ঘোষ, "নজরুল মানস: প্রসঙ্গ অসাম্প্রদায়িকতা,"অন্তর্গত, হাসান হাফিজ সম্পা.,*বহুমাত্রিক নজরুল*(ঢাকা: অনিন্দ্য প্রকাশ, ২০১৫) পৃ. ৪৪৯-৫৩।

তোলে। সুস্থতার জন্য যে যা বলেছে তিনি তা করেছেন। ফলে যেমন তিনি কালীর সাহায্য প্রার্থনা করেছেন ঠিক পরক্ষণেই আবার আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেছেন। শ্রীবরদাচরণ মজুমদারের মাধ্যমে যে নজরুল আধ্যাত্মিকতার সাধনা করতেন স্ত্রীর অসুস্থতায় তিনি আবার সেখান থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ইসলাম ধর্মে শান্তি খোঁজার চেষ্টা করেন। এভাবেই চলে নজরুলের ধর্ম চিন্তার বিবর্তন।[২৮]

এছাড়াও নজরুলকে নিয়ে বহু প্রবন্ধ, প্রবন্ধগ্রন্থ, গবেষণাগ্রন্থ ও জীবনীগ্রন্থ রচিত হয়েছে।

গবেষণার যৌক্তিকতা

নজরুল তাঁর বৈচিত্রপূর্ণ জীবন ও সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে ধর্ম ও নৈতিকতা সম্পর্কীয় স্বতন্ত্র চিন্তা প্রকাশ করেছেন। তাঁর ধর্ম সম্পর্কে পূর্বে যে সকল গবেষণা হয়েছে তার সবগুলোতে শুধুমাত্র তাঁকে ধর্মনিরপেক্ষ ও অসাম্প্রদায়িক প্রমাণ করার জন্য দেখানো হয়েছে যে, তিনি যেখানেই মুসলিম শব্দের প্রয়োগ করেছেন সেখানেই আবার হিন্দু শব্দের প্রয়োগ করেছেন। ধর্মীয় শব্দ ব্যবহার করা ধর্মনিরপেক্ষ ও অসাম্প্রদায়িক চেতনার একটি উপসর্গ হলেও একমাত্র উপসর্গ নয়। আরো অনেক নির্দেশক রয়েছে; যা নজরুলের মধ্যে বিদ্যমান। যেমন তিনি ধর্মের প্রতি কতোটুকু আনুগত্যশীল ছিলেন, কিভাবে ধর্মীয় গোঁড়ামির সমালোচনা করেছেন, ধর্মের সমন্বয় করতে চেয়েছিলেন কিনা, ধর্মসমূহের ঈশ্বরকে তিনি কিভাবে দেখতেন প্রভৃতি বিষয়গুলো গবেষণাগুলোতে স্থান পায়নি। উপরন্তু ধর্মীয় গোঁড়ামির মূল কারণ কী, ধর্মান্ধ ও ধর্মমাতালদের মুখোশ উন্মোচন করে প্রকৃত ধর্মকে কিভাবে রক্ষা করা যায়, সকল ধর্মের মূলবাণীর মধ্যেকার সাদৃশ্য কী, তিনি কি শুধুমাত্র বিশ্বাসের জন্যই বিশ্বাসী ছিলেন নাকি এর পেছনে রয়েছে কোনো যুক্তিসংগত কারণ, এ সকল বিষয়ও যথার্থভাবে উন্মোচিত হয়নি। নজরুল যে সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার মধ্যে বসবাস করতেন সে সমাজে নৈতিকতার চরম অবক্ষয় ও ধর্মীয় উগ্রতায় ভরপুর ছিলো। নজরুল যেহেতু যুগের কবি সেহেতু তাঁর সাহিত্যের মধ্যে নৈতিকতার অবক্ষয়ের বিবরণ এবং তা হতে উত্তরণের উপায় অবশ্যই থাকবে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, নজরুলকে নিয়ে যে সকল গবেষণাকর্ম ইতিপূর্বে সম্পন্ন হয়েছে তাঁর অধিকাংশই সাহিত্যকেন্দ্রিক গবেষণা। ধর্মকেন্দ্রিক অল্প যে কয়টি গবেষণা সম্পন্ন হয়েছে তারও অধিকাংশ হয়েছে আংশিকভাবে এবং সাহিত্যের নির্দিষ্ট কোনো একটি শাখা নিয়ে। নজরুল ইসলামকে নিয়ে প্রচুর গবেষণা গ্রন্থ, প্রবন্ধ রচিত হলেও আমার জানা মতে তাঁর ধর্ম ও নৈতিকতা সম্পর্কীয় দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্বলিত কোনো অখণ্ড গবেষণা সম্পাদিত হয়নি। তাই নজরুলসাহিত্যের দার্শনিক দিকটি উন্মোচন করা প্রয়োজন। দার্শনিক দৃষ্টিতে নজরুলের ধর্ম ও নৈতিকতার স্বরূপ উদ্ঘাটন করে তা অনুসরণ করলে বর্তমান বাংলাদেশ তথা সারা বিশ্বে যে ধর্মীয়

[২৮] গোলাম মুরশিদ, বিদ্রোহী রণক্লান্ত, পৃ. ৩৯৪-৪৪৮

অসহিষ্ণুতা, সাম্প্রদায়িকতা এবং নৈতিক অবক্ষয় ছড়িয়ে পড়ছে তা অনেকাংশে লাঘব হবে। তাই বর্তমান সমাজ বাস্তবতা তথা বিশ্ব বাস্তবতার প্রেক্ষিতে নজরুলসাহিত্যে ধর্ম ও নৈতিকতার স্বরূপ অনুসন্ধান করা সময়ের দাবি।

গবেষণার লক্ষ্য

সাধারণ লক্ষ্য

কাজী নজরুল ইসলামের দৃষ্টিতে ধর্ম ও নৈতিকতার স্বরূপ অনুসন্ধান ও তার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা এই গবেষণার মূল লক্ষ্য।

বিশেষ লক্ষ্যসমূহ

ক. ধর্ম ও ধর্মবিশ্বাসের স্বরূপ সম্পর্কে কাজী নজরুল ইসলামের চিন্তাধারা বিশ্লেষণ;

খ. ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও স্বরূপ সম্পর্কে নজরুলের দৃষ্টিভঙ্গি মূল্যায়ন;

গ. নৈতিকতা প্রসঙ্গে নজরুলের চিন্তাভাবনা বিশ্লেষণ; এবং

ঘ. আত্মার স্বরূপ সম্পর্কে নজরুলের ধারণা বিশ্লেষণ ।

গবেষণা পদ্ধতি

ক. তথ্যের উৎস

সাহিত্য পর্যালোচনামূলক পদ্ধতির এই গবেষণায় প্রাথমিক ও সহায়ক উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রাথমিক উপকরণ হিসেবে কাজী নজরুল ইসলাম রচিত যাবতীয় সাহিত্য ব্যবহৃত হয়েছে। সহায়ক উপকরণ হিসেবে নজরুলের জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক সকল ধরনের গবেষণা, রচনা, প্রবন্ধ, প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত অভিসন্দর্ভ, প্রাসঙ্গিক রচনাবলী, পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্যসমূহ এবং যাবতীয় আলোচনা-সমালোচনা-পর্যালোচনা প্রস্তাবিত গবেষণাকর্মে প্রাসঙ্গিকভাবে স্থান পেয়েছে। প্রাথমিক উৎস ব্যবহারের ক্ষেত্রে জন্মশতবর্ষ সংস্করণকে গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও ধর্ম ও নৈতিকতা বিষয়ক অন্যান্য গ্রন্থসমূহ তুলনামূলক আলোচনার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে।

খ. তথ্য সংগ্রহের কৌশল

গবেষণার মূল উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে প্রাথমিক ও সহায়ক উৎসগুলো অধ্যয়নপূর্বক প্রাপ্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়েছে এবং ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের পর সেগুলো গবেষণাকর্মের উপযুক্ত স্থানে ব্যবহার করা হয়েছে।

গ. তথ্য বিশ্লেষণ কৌশল

উভয় উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদির মাধ্যমে প্রত্যাশিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য প্রধানত পাঠ-বিশ্লেষণ কৌশল ও তুলনামূলক পর্যালোচনা কৌশল ব্যবহার করা হয়েছে।

ঘ. উপস্থাপন শৈলী

এ গবেষণাকর্মে বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা বানান রীতি অনুসরণ করা হয়েছে। তথ্য নির্দেশের জন্য শিকাগো শৈলী অনুসরণ করা হয়েছে। প্রাসঙ্গিক টীকা ও তথ্যনির্দেশ সংখ্যানুক্রমে পাদটীকায় সন্নিবেশিত হয়েছে।

অভিসন্দর্ভের অধ্যায় বিন্যাস

প্রথম অধ্যায়	ভূমিকা
দ্বিতীয় অধ্যায়	ধর্ম ও ধর্মবিশ্বাসের স্বরূপ সম্পর্কে কাজী নজরুল ইসলাম
তৃতীয় অধ্যায়	ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও স্বরূপ সম্পর্কে কাজী নজরুল ইসলাম
চতুর্থ অধ্যায়	নৈতিকতা প্রসঙ্গে কাজী নজরুল ইসলাম
পঞ্চম অধ্যায়	আত্মার স্বরূপ প্রসঙ্গে কাজী নজরুল ইসলাম
ষষ্ঠ অধ্যায়	উপসংহার

উপসংহার

কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর বিস্তৃত সাহিত্যভাণ্ডারের মধ্য দিয়ে ধর্ম ও নৈতিকতা বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র জীবনদর্শন প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি ধর্মের প্রচলিত ধারণার বিপরীতে সকল ধর্মকে এক করে দেখেছেন। সকল ধর্মের ঈশ্বরকে তিনি একই বলে মনে করতেন। এ জন্য ধর্মের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে ঈশ্বরকে তিনি দেখেছেন সর্বনামের আধার হিসেবে। তিনি মানুষের আলোচনায় অনেক সময় নরকে তুলনা করেছেন নারায়ণ এর সাথে। এই মানবের মধ্যেই ঈশ্বরের অবস্থান রয়েছে বলে তিনি মনে করেন। তাই মানবের অপমানে তিনি অপমানিত হয়েছেন, তার দুঃখে দুঃখিত হয়েছেন। তাঁর প্রাপ্য মর্যাদা দেওয়ার জন্যে লেখনির মাধ্যমে তিনি সংগ্রাম করেছেন। মানুষের মধ্যে নৈতিকতাকে জাগ্রত করতে চেয়েছেন। সকল মানুষকে ঈশ্বরের সৃষ্টি হিসেবে দেখেছেন এবং তাদের মধ্যে কোনো ভেদাভেদকে স্বীকার করেননি। ঈশ্বর যেখানে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের প্রতি সমতা বিধান করেছেন সেখানে মানুষ কেনো অন্যের দ্বারা বঞ্চনার শিকার হবে? ফলে সমাজে বিদ্যমান অসাম্যকে দূর করে সাম্য ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষকে তথা তরুণ সমাজকে তিনি আহ্বান করেছেন। আর এ সকল বিষয়ের আলোচনা করতে গিয়ে তিনি অনেক সময় দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির আশ্রয় নিয়েছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ধর্ম ও ধর্মবিশ্বাসের স্বরূপ সম্পর্কে কাজী নজরুল ইসলাম

ভূমিকা

মানবসভ্যতায় ধর্মের গুরুত্ব অপরিসীম। ধর্ম অতি প্রাচীন ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত। প্রাচীন সমাজ থেকে শুরু করে আধুনিক উন্নত সমাজেও ধর্মের অস্তিত্ব বিদ্যমান রয়েছে। নির্দিষ্ট কিছু বিধি-বিধান প্রতিপালনের মাধ্যমে স্রষ্টার সন্তুষ্টি লাভ করাই ধর্মের মূলকথা। কিন্তু সময়ের বিবর্তনে ধর্মানুসারীদের মধ্যে ধর্মীয় বিধান নিয়ে মতদ্বৈধতা দেখা দেয়। এই সুযোগে স্বার্থান্বেষী মহল ধর্মের মধ্যে কুসংস্কার ও অধার্মিক বিধান কৌশলে প্রবেশ করিয়ে দেয়। নিজ ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব, সাম্প্রদায়িকতা, অসহিষ্ণুতা প্রভৃতি তার মধ্যে অন্যতম। ধর্মানুসারীরাও বাছ-বিচার না করে সেগুলোকে অন্ধভাবে ধর্মের বিধান মনে করে পালন করতে থাকে; ফলে সংঘর্ষ, ধর্মযুদ্ধ বা দাঙ্গা অনিবার্য হয়ে উঠে। এই ধর্মীয় হানাহানি থেকে ধর্মকে রক্ষা করতে যুগে যুগে মুজাদ্দিদ বা ধর্ম সংস্কারকের আবির্ভাব ঘটে। কাজী নজরুল ইসলাম মুজাদ্দিদ হিসেবে স্বীকৃতি না পেলেও তাঁদের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির সাথে নজরুলের দৃষ্টিভঙ্গির মিল লক্ষ করা যায়। তিনি আজন্ম ধর্মের নামে প্রচলিত কুসংস্কার, গোঁড়ামি, ছুঁৎমার্গ, সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মান্ধতা, অমানবিকতা প্রভৃতি দূর করে ধর্মের প্রকৃত বিধান প্রতিষ্ঠায় দৃঢ় প্রত্যয়ী ছিলেন। এজন্য বারবার তাঁর সাহিত্যে তিনি ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলোকে ধর্মের মধ্যে দিয়ে নৈতিক জীবন-যাপন করার পরামর্শ দেন। তিনি কুসংস্কারমুক্ত ধর্মের আলোকে একটি ভ্রাতৃত্বপূর্ণ ও মানবিক সমাজ এবং রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। আর এটাই ছিলো তাঁর আধ্যাত্মিক সাধনা।

ধর্ম কী ?

'ধর্ম' শব্দটির বুৎপত্তিগত অর্থ হলো 'যা কিছু ধারণশক্তিযুক্ত তা-ই ধর্ম'[১]। ধর্ম এমন অলৌকিক শক্তি বা দৈবসত্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে বলে, যার কাছে মানুষ আত্মসমর্পণ করে। এমিল ডুরখেইম মনে করেন, ধর্ম হল বিশ্বাস এবং অনুষ্ঠানের একটি যৌথ ব্যাপার যাকে কখনো একটি সংগঠন থেকে আলাদা করা যায় না।[২]যুগ ও সমাজের ভিন্নতায় ধর্মের ভিন্নতা লক্ষ করা যায়। কোনো ধর্মে স্রষ্টায় বিশ্বাস করতে, আবার কোনো ধর্মে দেব-দেবীতে বিশ্বাস স্থাপন করতে দেখা যায়। কেউ এক-স্রষ্টায় বিশ্বাস করে কেউ আবার বহু-স্রষ্টায় বিশ্বাস করে। তবে প্রায় সকল ধর্মেই কোনো না কোনো অতীন্দ্রিয় সত্তায় বিশ্বাস স্থাপন করতে বলা হয়েছে।[৩]

---

[১] আজিজুন্নাহার ইসলাম ও কাজী নূরুল ইসলাম, *তুলনামূলক ধর্ম নৈতিকতা ও মানবকল্যাণ* (ঢাকা: সংবেদ, ২০১৭), পৃ. ৩১।

[২] বুলবন ওসমান, "ধর্ম ও সংস্কৃতি," অন্তর্গত,মোহাম্মদ আবদুল হাই, সম্পা., *বাঙালির ধর্মচিন্তা*, (ঢাকা: সূচীপত্র, ২০১৪),পৃ. ১৩৮।

[৩] Chad Meister, *Introducing Philosophy of Religion* (London: Routledge, 2009), p. 19.

ধর্ম একটি মৌল ও মানবীয় প্রতিষ্ঠান; যার মূল কথা হলো মানুষ হিসেবে স্রষ্টার আরাধনা করা এবং মানুষের সেবা করা। ধর্মের কাজ হলো মানুষের সামাজিক জীবনকে ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করা, মানুষকে ন্যায় সত্য সুন্দর ও কল্যাণের পথে পরিচালিত করা এবং পরিণামে পরমসত্তার সন্ধান দেওয়া। এর প্রধান লক্ষ্যই হলো মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন। অন্যভাবে বলা যায়- "ধর্ম প্রাথমিকভাবে বিশ্বাস ও কর্মকে কেন্দ্র করে ব্রহ্মাণ্ডের অতীত এমন একটি বাস্তবতাকে অন্তর্ভুক্ত করে যা মূলত ব্যক্তিগত বা নৈর্ব্যক্তিক, এবং যা জীবনের চূড়ান্ত অর্থ এবং উদ্দেশ্য সরবরাহ করে।"[৪]বঙ্কিমচন্দ্র ধর্মের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন-"আপনার আনন্দ বর্ধনই ধর্ম। ঈশ্বরে ভক্তি, মনুষ্যে প্রীতি এবং হৃদয়ে শান্তি, ইহাই ধর্ম।"[৫] ধর্মের পরিচয় দিতে গিয়ে জি. সি দেব বলেন-

> ধর্ম বলতে আমরা সেই ঐতিহাসিক ধর্মগুলোকেই বুঝব, যার উপর অগনিত নর-নারীর আজও প্রচুর আস্থা, তারা জগতের নিয়ন্তা ও কারণ হিসেবে এক মঙ্গলময় স্রষ্টায় বিশ্বাস করেন এবং সেই বিশ্বাসকে আশ্রয় করে তাদের জীবনযাত্রা প্রণালী নিয়ন্ত্রণেরও চেষ্টা করেন। পরম কল্যাণময় স্রষ্টা পরকালে মানুষকে তার পুণ্যের পুরস্কার দেবেন ও পাপীদের পাপের শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা করবেন।[৬]

সুতরাং বলা যায়, ধর্ম এমন কতিপয় আচার-অনুষ্ঠানকে অন্তর্ভুক্ত করে যা মানুষকে পরম সত্তার দিকে ধাবিত করে এবং তাদের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে। ধর্ম তাদেরকে সত্য-শিব-সুন্দরের দিকে চালিত করে। অত্র গবেষণায় ধর্ম এই প্রচলিত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

ধর্ম ও ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে নজরুলের দৃষ্টিভঙ্গি

নজরুলের বৈচিত্রময় জীবনের বিভিন্ন বাঁকে হিন্দু-মুসলিম উভয় ধর্মের ধর্মাচার করার কারণে তাঁর ধর্মবিশ্বাস নিয়ে বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উত্থাপিত হতে দেখা যায়। এ পর্যায়ে নজরুলের ধর্মবিশ্বাস এবং ধর্ম সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা করা হলো।

নজরুলের ধর্মবিশ্বাস

ধর্মদর্শনের সমকালীন যুগে ধর্মবিশ্বাসকে *ধর্মীয় বাস্তববাদী* ও *ধর্মীয় অবাস্তববাদী* এই দুই শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। বাস্তববাদীরা মানুষের ভাষা ও ভাবনার দূরবর্তী অতীন্দ্রিয় সত্তায় বিশ্বাস করে; অন্যদিকে অবাস্তববাদীরা (সিগমন্ড ফ্রয়েড ও রিচার্ড ডকিন্স) ধর্মকে মানুষের তৈরি এক মায়াঅথবা ক্ষেত্রবিশেষে মতিভ্রম হিসেবে দেখেন। লুটভিগ ভিটগেইন্সটাইন মনে করেন, ধর্ম হলো মানুষের

---

[৪] ibid, p. 6. (অনুবাদ গবেষকের)

[৫] বঙ্কিমচন্দ্র চট্টপাধ্যায়, "মানবধর্ম," উদ্ধৃত, আহমদ শরীফ, *বাঙলার মনীষা* (ঢাকা: অনন্যা, ২০০৫), পৃ. ৫৫-৬।

[৬] গোবিন্দ্রচন্দ্র দেব, *তত্ত্ববিদ্যা-সার*(ঢাকাঃ অধুনা প্রকাশন, ২০০৪), পৃ. ৪৭।

ধারণা, বিশ্বাস ও চর্চার বিষয়।[৭] এদিক থেকে ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে নজরুলের অবস্থান বাস্তববাদীদের অনুরূপ। তিনি স্রষ্টায় বিশ্বাস এবং তাঁর সমীপেই তাঁর জীবন-মরণ, নামাজ-রোজা-কোরবানি সকল কিছু সপে দিতে চান। তাঁর সন্তুষ্টিই নজরুলের জীবনের একান্ত কাম্য। তাঁর বাণী *ই'য়াকা না'বুদু ওয়া ই'য়াকা নাস্তাইন* অর্থাৎ 'তোমারই এবাদত করি করি এবং তোমার কাছেই সাহায্য চাই'।

ধর্মবিশ্বাসকে আবার বহিরাঙ্গিক দিক ও অন্তরের দিক এই দুই শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়। বহিরাঙ্গিক দিকটি সামাজিক আচার, অনুষ্ঠান বা অলৌকিক সত্তাকে ঘিরে যে পূজা-অর্চনা বা ইবাদত-বন্দেগি করা হয় সেটি। অন্যদিকে অন্তরের দিকটি অলৌকিক সত্তা সম্পর্কে মানুষের অনুভূতি, চিন্তা ও বিশ্বাসকে বোঝায়। নজরুলকে এ ক্ষেত্রে ধর্মের বহিরাঙ্গিক দিকের চেয়ে অন্তরের দিকের উপর বেশি প্রাধান্য দিতে দেখা যায়।

নজরুলের সাহিত্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ধর্মের প্রতি তাঁর আস্থা ও ভক্তি ছিলো গভীর।[৮] তবুও সাহিত্যে হিন্দু ও মুসলমানদের ধর্মীয় প্রত্যয় সমানভাবে ব্যবহার এবং নামাজ ও কালী-পূজা উভয়ই করায় তাঁর ধর্মবিশ্বাস নিয়ে মতদ্বৈধতা লক্ষ করা যায়। মুসলমানদের একাংশ তাঁকে কালী-পূজা করার অভিযোগে অভিযুক্ত করে কাফের উপাধি দেয়; আর হিন্দুরা অবজ্ঞা করে তাঁকে 'যবন' বলে ডাকে। তবে ধর্মাচারে দ্বৈধতা থাকলেও এর উদ্দেশ্য ভিন্ন ছিলো বলে মনে হয়। ইসলামসম্মত না হলেও শোকার্ত পিতার মৃত পুত্রকে পুনরায় স্বশরীরে দেখার আকুতি এবং বরদাচরণ মজুমদার কর্তৃক আশ্বস্ত করার প্রেক্ষিতে যোগসাধনা এবং কালী-পূজা করাতে ধর্মবিশ্বাসের কোনো ব্যাপার ছিলো না। উপরন্তু সকল ধর্মের স্রষ্টা ও মূলবাণীকে একই মনে করায় নজরুল ধর্মভেদকেও মানতে চাইতেন না। এ জন্য মুসলমান হয়েও তিনি সকল ধর্মের সারকথার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে সক্ষম হয়েছিলেন। আহমদ শরীফ এ প্রসঙ্গে বলেন, ইসলামের প্রতি আস্থা স্থাপনে ও বিশ্ব মুসলিম ভ্রাতৃত্বের প্রতি বিশ্বাসের পেছনে রয়েছে ইসলামের মানবপ্রেমের বিধানসমূহ। কবি জীবনের যা ব্রত ইসলামের মতো আর কোনো ধর্ম এত দৃঢ়তার সঙ্গে এমন স্পষ্ট করে বলেনি।[৯]

এ প্রসঙ্গে গোলাম মুরশিদ মনে করেন, নজরুল যোগ-সাধনা এবং কালী-পূজা জীবনের এক পর্যায়ে করলেও তিনি যে আজন্ম-মুসলমান এ কথা কোনো দিন একেবারে ভুলে যাননি।[১০] ধর্মবিশ্বাসে তিনি যে মুসলিম তাঁর প্রমাণ পাওয়া যায় আন্‌ওয়ার হোসেনকে লিখিত 'আমি

---

[7] Chad Meister, *Introducing Philosophy of Religion*, p. 19.

[৮] আহমদ শরীফ, *একালে নজরুল* (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২০১৫) পৃ. ৯৯।

[৯] আহমদ শরীফ, *আহমদ শরীফ রচনাবলী*, ১ম খণ্ড, সম্পা., আহমদ কবির (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২০১০), পৃ. ২২৮।

[১০] গোলাম মুরশিদ, *বিদ্রোহী রণক্লান্ত: নজরুল জীবনী* (ঢাকা:প্রথমা, ২০১৮), ১৫৪।

মুসলমান– কিন্তু আমার কবিতা সকল দেশের সকল কালের এবং সকল জাতির' উক্তিটির মধ্যে। প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁর পত্রের উত্তরে লিখিত পত্রেও নজরুলের মুসলিম পরিচয়টি ফুটে উঠেছে। 'আমি মুসলমান–কিন্তু আমার কবিতা সকল দেশের সকল কালের' বলার পাশাপাশি নজরুল মুসলমানদেরকে নিজের ঘরের সাথে তুলনা করেন। যেমন তিনি বলেন- "প্রথম গালাগালির ঝড়টা আমার ঘরের দিক অর্থাৎ মুসলমানের দিক থেকেই এসেছিল–এটা অস্বীকার করিনে; কিন্তু তাই বলে মুসলমানেরা যে আমায় কদর করেননি, এটাও ঠিক নয়।"[১১] নজরুল নিজেকে মুসলিম বলে পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন-

> চীন আরব হিন্দুস্থান নিখিল ধরাধাম
> জানে আমায়, চেনে আমায়, মুস্‌লিম আমার নাম ॥"[১২]

তিনি আরো বলেন-'ইসলাম আমার ধর্ম, মুসলিম আমার পরিচয় ॥'[১৩]গোলাম মুরশিদ দেখান যে, ধূমকেতু পত্রিকাতে নজরুল 'মুসলিম জাহান' নামক নিয়মিত বিভাগ প্রকাশের মাধ্যমে মুসলমানদের প্রতি সহানুভূতি ও ভালোবাসা এবং মুসলিম জাতীয়তাবাদী পরিচয় আগাগোড়া বজায় রেখেছেন। এমনকি কোথাও কোথাও তা প্রায় সবার অলক্ষে ফল্গুধারার মতো প্রবাহিত হয়েছে।[১৪]আহমদ শরীফ বলেন-"নজরুল নাস্তিক না হয়ে বরং ইসলামি মতাদর্শে আস্থাবান থাকতে চেয়েছেন।"[১৫]

নজরুল যে ইসলাম ধর্মের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায় প্রমিলাকে বিয়ে করার সময়। মুসলমান পাত্র আর হিন্দু পাত্রীর বিয়ে কোন্ ধর্মমতে হবে সে বিষয়ে প্রশ্ন দেখা দেয়। 'সিভিল ম্যারেজ' অনুযায়ী করতে গেলে দু'পক্ষকেই স্বীকৃতি দিতে হয় যে, 'আমরা ধর্ম মানি না'। নজরুল এতে দৃঢ়ভাবে আপত্তি জানিয়ে বলেন- "আমি মুসলমান–মুসলমানী রক্ত আমার শিরায় শিরায় ধমনীতে ধমনীতে প্রবাহিত, এ আমি অস্বীকার করতে পারবো না।"[১৬] একদিন খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন ও হাবিবুল্লাহ বাহার রোযার দিনে কবির হুগলীর বাসায় উপস্থিত হন। ইফতারের সময় ইফতারের উপকরণ তৈরি না করায় নজরুলের সাথে তাঁর শাশুড়ীর ঝগড়া হয়। "তাঁকে রাগ না করার জন্য বলা হলে তিনি বলে উঠেন-'মুসলমানের ঘরে মেয়ে দিতে পারলেন, আর এ সব জানবেন না মানে? তাঁকে জানতে হবে'।"[১৭]

---

[১১] "পত্রাবলী," নর ৯ম, পৃ. ১৮৩।
[১২] "অগ্রন্থিত গান," নর ১০ম, পৃ. ২১৬।
[১৩] "জুলফিকার," নর ৪র্থ, পৃ. ২৯৭।
[১৪] গোলাম মুরশিদ, বিদ্রোহী রণক্লান্ত:, পৃ. ১৫৭।
[১৫] আহমদ শরীফ, *আহমদ শরীফ রচনাবলী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬০৮-৯।
[১৬] খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন, *যুগস্রষ্টা নজরুল*, ৩য় সং (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৮), পৃ. ৪৯।
[১৭] তদেব, পৃ. ৬০।

মুসলমানের রক্ত শরীরে প্রবাহিত থাকায় ইসলামের অপমান তিনি সহ্য করতে পারেন নি। তরীকুল আলম *সবুজপত্র* পত্রিকায় 'আজ ঈদ' শীর্ষক প্রবন্ধে মুসলমানের কোরবানির মধ্যে নিষ্ঠুরতা ও বিভীষিকা দেখতে পান। নজরুল এতে ক্রুদ্ধ হন এবং এর প্রতিক্রিয়ায় *কোরবানি* কবিতাটি রচনা করেন।[১৮] বাংলার মৌলবি সাহেবদের উদ্দেশ্যে লিখিত নজরুলের চিঠিতেও নজরুল নিজেকে একজন ইসলামের খাদেম বলে পরিচয় দেন। সেখানে তিনি লিখেন-

> আমি আমার কবিতায়, ইসলামি গানে, গল্পে, উপন্যাসে, নাটকে, প্রবন্ধে, বক্তৃতায় আশৈশব ইসলামের সেবা করিয়া আসিতেছি। আমারই বহু চেষ্টায় আজ ইসলামি গান রেকর্ড হইয়া ঘুমন্ত আত্মভোলা মুসলিম জাতিকে জাগাইয়া তুলিয়াছি। আরবি-ফার্সি শব্দের প্রচলন বাংলা সাহিত্যে আজ বহু পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে–তাহাও এই বান্দারই চেষ্টায়। আমি কওমের নিকট হইতে হাত পাতিয়া কখনো কিছু চাহি নাই ইহার বদলাতে। কোনো কিছুর প্রতিদানের আশা না করিয়াই আমি লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া আমার যথাসাধ্য কওমের ও ইসলাম ধর্মের খেদমত করিয়া আসিতেছি।[১৯]

ইসলাম ধর্মের প্রতি নজরুলের এই বিশ্বাস তাঁর পুরো সাহিত্যে ফুটে উঠেছে। জগতের 'পরম পতি' হিসেবে স্রষ্টার ইচ্ছা পূরণ, তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন, তাঁর উদ্দেশ্যে নিজের জীবন-মরণ, নামাজ-রোজা-ইবাদত-বন্দেগি সমর্পণ করাই নজরুলের উদ্দেশ্য। 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন যে, স্বয়ং স্রষ্টা তাঁকে অপ্রকাশকে প্রকাশ, অমূর্তকে মূর্ত, জাতিতে-জাতিতে বিদ্যমান দ্বন্দ্ব-সংঘাত নির্মূল করতে; ধর্মীয় কুসংস্কার ও গোঁড়ামি থেকে ধর্মকে মুক্ত করতে; অধিকার বঞ্চিতদের অধিকার প্রতিষ্ঠা, মানুষের মধ্যকার মানবিকতা, মনুষ্যত্ব ও নৈতিকতাকে জাগ্রত করতে; যা কিছু মিথ্যা, কলুষিত, পুরাতন-পচা-সনাতন সেসব কিছুকে দূর ও অসুরকে বিনাশ করার জন্য' বিদ্রোহী' করে প্রেরণ করেছেন। কবির কণ্ঠে ভগবান সাড়া দেন। তিনি সেই স্বয়ম্-প্রকাশ তথা ভগবানের হাতের বীণা। তাঁর আত্মা সত্যদ্রষ্টা ঋষির আত্মা। বাংলার শ্যাম শ্মশানের মায়া নিদ্রিত ভূমে স্রষ্টা তাঁকে প্রেরণ করেছেন অগ্রদূত তুর্যবাদক করে।[২০]

এজন্য স্রষ্টা তাঁর উপরে যেটুকু দায়িত্ব দিয়েছেন সে দায়িত্বটুকু তিনি পালন করার চেষ্টা করছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন- "বাংলার শ্যাম শ্মশানের মায়া নিদ্রিত ভূমে আমায় তিনি পাঠিয়েছিলেন অগ্রদূত তূর্যবাদক করে। আমি সামান্য সৈনিক, যতটুকু ক্ষমতা ছিল তা দিয়ে তাঁর আদেশ পালন করেছি।"[২১] মহামতি সক্রেটিসও মনে করতেন যে, স্বয়ং ভগবান তাঁকে সত্যের

---

[১৮] রফিকুল ইসলাম, *কাজী নজরুল ইসলাম : জীবন ও সৃষ্টি* (কলকাতা : কেপি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, ১৯৯৭), পৃ. ৩৫।

[১৯] "পত্রাবলী," নর ৯ম, পৃ. ২৬২।

[২০] "রাজবন্দীর জবানবন্দী," নর ১ম, পৃ. ৪৩১-৪।

[২১] তদেব, পৃ. ৪৩৪।

প্রচারক হিসেবে প্রেরণ করেছেন।[২২] নজরুল স্রষ্টাকে বিভিন্নরূপে দেখেছেন। তার মধ্যে একটি হলো 'সুন্দর'। ১৯২৯ সালে বাংলার হিন্দু-মুসলমানের পক্ষ থেকে কলকাতা এলবার্ট হলে অভিভাষণে তিনি বলেন- "সুন্দরের ধ্যান, তাঁর স্তবগানই আমার উপাসনা, আমার ধর্ম।"[২৩]

স্রষ্টাপ্রেমের মতো রসুলপ্রেমও নজরুলের মধ্যে লক্ষ করা যায়। তিনি মনে করেন আল্লাহর সান্নিধ্য পেতে হলে প্রথমে রসুলকে ভালোবাসতে হবে। রসুল হলেন আল্লাহকে পাওয়ার সিঁড়ি। আর তাই রসুলের সাথে সাক্ষাত করতে রোজ-কেয়ামত পর্যন্ত অপেক্ষা করতে তিনি অস্থির হয়ে যান। রসুল ছাড়া একটি দিন তাঁর জন্য রোজ-কেয়ামত। এজন্য তাঁর স্পর্শ পাওয়ার জন্যে রসুল যে পথে ভ্রমন করেছেন নজরুল সেই মদিনার ধুলোহতে চান। বাস্তবসম্মত না হলেও আবেগের আতিশয্যে চোখের পানি দিয়ে দরিয়া বানিয়ে দিতে চান যাতে করে মাঝি তাঁকে রসুলের মদীনায় নিয়ে যেতে পারে। বিবি সকিনা কারবালাতে যেভাবে কেঁদেছিলেন সেভাবে কারবালার ধুলো মেখে 'ইয়া মোহাম্মদ' বলে কাঁদতে চান। স্রষ্টার সাথে সাময়িক বন্ধনমুক্তিতে তিনি যেমন অন্তরের মধ্যে রোদন অনুভব করেন; রসুলের দর্শন বিনাও সেরূপ রোদন অনুভব করেন। রসুলের নামে রয়েছে মধু রয়েছে বলে তিনি মনে করেন। তিনি বলেন-

মোহাম্মদ নাম যতই জপি, ততই মধুর লাগে।
নামে এত মধু থাকে, কে জানিত আগে ॥[২৪]

রসুলপ্রেম তাঁর এতই প্রবল যে, হজ্জফেরত হাজীদের কাছে জানতে চান তারা রসুলের পূণ্যভূমি ছেড়ে কিভাবে ফিরে আসল! তারা রসুলের পদধুলো মাখা আরবের মাটিতে গড়াগড়ি করেছে কিনা? তাদের কাছে তিনি আবে-হায়াতের পানি চান, যার স্পর্শে তিনি মক্কা মদিনার স্পর্শ অনুভব করতে পারেন। সবাই যখন ঈদের চাঁদ দেখে আনন্দে আন্দোলিত তখনও নজরুল সুখী হতে পারেন না, কেননা রসুলের সাক্ষাৎকে তিনি দেখেছেন ঈদের চাঁদের চেয়েও আনন্দাদায়ক হিসেবে; রসুলের সাক্ষাতের মধ্যেই রয়েছে পরমানন্দ। তাই তিনি রসুলকে পেতে চান, তাঁর সান্নিধ্য চান, তাঁর মহব্বত চান। নজরুল বলেন-

ওগো মুর্শিদ পীর ! বলো বলো
রসুল কোথায় থাকে ?
কোথায় গেলে কেমন করে
দেখতে পাব তাঁকে?[২৫]

---

[২২] মোঃ আবদুল হামিদ, *দার্শনিক প্রবন্ধাবলি: তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০৩), পৃ. ৪২।
[২৩] "প্রতিভাষণ," 'অভিভাষণ,' নর ৮ম, পৃ. ৫।
[২৪] "বনগীতি,"নর ৭ম, পৃ. ১১৬।
[২৫] "অগ্রন্থিত গান," নর ১০ম, পৃ. ২০৪।

আল্লাহ ও রসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের পাশাপাশি তাঁকে তকদিরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে দেখা যায়। ইসলামি ধর্মমতে মানুষের তকদির পূর্ব নির্ধারিত। আদম সৃষ্টির পূর্বেই তার ভাগ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। যাই কিছু ঘটুক না কেনো তা অবশ্যই তার ভাগ্য-লেখা অনুযায়ী হয়ে থাকে। নজরুলের জিজ্ঞাসা সেই পরম প্রভুর নিকট। সকল কিছু যদি তকদির বা ভাগ্যলিখন অনুযায়ীই হয় তাহলে পাপের কারণে কেনো শাস্তি পেতে হবে। নজরুল বলেন-

সৃজন-ভোরে প্রভু মোরে সৃজিলে গো প্রথম যবে
(তুমি) জান্‌তে আমার ললাট-লেখা, জীবন আমার কেমন হবে ॥
তোমারি সে নির্দেশ প্রভু,
যদিই গো পাপ করি কভু,
নরক-ভীতি দেখাও তবু, এমন বিচার কেউ কি স'বে ॥[২৬]

পূর্ব নির্ধারিত ভাগ্যলিপির সাথে ইচ্ছার স্বাধীনতার ধারণাটি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। মানুষ স্বাধীন নাকি অতিপ্রাকৃত সত্তার ইচ্ছার অধীন এ নিয়ে দর্শনের ইতিহাসে বিস্তর মতপার্থক্য রয়েছে। মুসলিম দর্শনের মুতাযিলা দার্শনিকবৃন্দ ব্যক্তি মানুষের স্বাধীনতার সমর্থন করেন। তাঁরা মনে করেন, মানুষের কর্মের স্বাধীনতা না থাকলে আল্লাহর পক্ষে পরকালে পাপীদের শাস্তি দেওয়ার যৌক্তিকতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়।[২৭] কাদারিয়া সম্প্রদায়ও কর্মের ক্ষেত্রে ব্যক্তি মানুষের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করেন।[২৮] কিন্তু বিপরীত মত লক্ষ করা যায় জাবারিয়া সম্প্রদায়ের চিন্তাতে। পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মধ্যে যারা মানুষের স্বাধীনতার পরিবর্তে পূর্বনিয়ন্ত্রণবাদের প্রতি সমর্থক জানান তাদের মধ্যে পদার্থিক নিয়ন্ত্রণবাদের সমর্থক স্যার আইজাক নিউটন, জৈবিক নিয়ন্ত্রণবাদের সমর্থক চার্ল্‌স ডারউইন, মনোসমীক্ষার জনক সিগমুন্ড ফ্রয়েড, মনস্তাত্ত্বিক নিয়ন্ত্রণবাদের সমর্থক স্কিনার, দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ ও সমাজতন্ত্রের প্রবক্তা কার্ল মার্কস, এবং স্পিনোজা অন্যতম।[২৯] তবে তাঁরা সকলেই পূর্বনিয়ন্ত্রণের জন্য স্রষ্টার ইচ্ছাকে দায়ী করেননি। আবার উইলিয়াম জেমস ব্যক্তি মানুষের স্বাধীনতার কথা স্বীকার করেন।

১৯৩০ সালের 'ওমর খৈয়াম-গীতি'তে দৈব-ভাগ্যের জন্য তিনি স্রষ্টাকে দায়ী করলেও ১৯৩১ সালের 'স্বদেশ' কবিতায় মনে করেন ব্যক্তি মানুষের কর্মের জন্য সে নিজেই দায়ী। স্রষ্টা তাকে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দিয়েই জগতে পাঠিয়েছেন। কাজেই নিজের কর্মের জন্য অন্যকে দায়ী না করে বরং নিজের উন্নতির জন্য নিজেকেই চেষ্টা করা উচিত বলে নজরুল মনে করেন। নজরুল বলেন-

'দৈব' 'ভাগ্য' বলে কিছু নাই, কে জাগাবে এই বোধ,
তাহারাই পারে তাহাদের 'পরে পীড়নের নিতে শোধ।[৩০]

[২৬] "ওমর খৈয়াম-গীতি," 'নজরুল গীতিকা,' নর ৩য়, পৃ. ১৭১।
[২৭] আমিনুল ইসলাম, *মুসলিম ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন* (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৮৫), পৃ. ৮৫।
[২৮] আমিনুল ইসলাম, *জগৎ জীবন দর্শন* (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০১১), পৃ. ৯৮।
[২৯] তদেব, পৃ. ৯৮-১০২।
[৩০] "স্বদেশ," 'অগ্রন্থিত কবিতা,' নর ৯ম, পৃ. ২৬।

এভাবে স্রষ্টার প্রতি আনুগত্য, রসুলের প্রতি ভালোবাসা এবং তাকদিরের প্রতি আস্থাশীলতার পাশাপাশি নজরুল নামাজ, রোজা, হজ্জকেও সাহিত্যালোচনায় অন্তর্ভুক্ত করেন; যা থেকে স্পষ্টত তাঁর মুসলিম পরিচয়টি ফুটে উঠে। অবশ্য নিজে মুসলিম পরিচয় বহন করলেও প্রচলিত প্রায় প্রতিটি ধর্ম সম্পর্কে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিলো; যা তাঁকে পরধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও অসাম্প্রদায়িক হতে সহায়তা করে। এ জন্য তিনি কেবল মুসলিম বা ইসলামি ঐতিহ্যের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ না রেখে প্রচলিত ধর্মীয় ও সামাজিক ঐতিহ্যকে অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছিলেন বলে রফিকুল ইসলাম মনে করেন।[৩১] তবে এখানে একটা কথা মনে রাখা দরকার যে, ঐতিহ্য অতিক্রম করা অর্থ মুসলমানিত্ব ভুলে যাওয়া নয়। নজরুল যে আজন্ম অসাম্প্রদায়িক ছিলেন তা ফুটে উঠেছে "জাতি-ধর্ম-ভেদ আমার কোনোদিনও ছিল না, আজো নেই" উক্তির মধ্যে। এ জন্য তাঁকে বাংলার অসাম্প্রদায়িক চিন্তার শক্তিশালী প্রচারক বলা যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে গোলাম মুরশিদ বলেন- "করাচি থেকে ফেরার সময় মুসলিম-পরিচয় সম্পর্কে তিনি ষোলো-আনা সজাগ ছিলেন।... তবে তাঁর কোনো রচনাতে বিভেদমূলক অথবা বিদ্বেষপূর্ণ সাম্প্রদায়িকতার ছাপ ছিলো না।"[৩২] আবুল ফজলও মনে করেন নজরুলের জীবনে কোনো দিন কোনো রকমের গোঁড়ামি, সংকীর্ণতা ও ধর্মান্ধতা স্থান পায় নাই।[৩৩] হিন্দু নারীকে বিয়ে করলেও ধর্মান্তরিত করার জন্য চাপ না দিয়ে উল্টো বাড়িতে হিন্দু ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান করার জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা করে দেওয়ার মধ্যে পরধর্মের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাশীল দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে উঠে।

ধর্মের বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে নজরুল

ধর্ম প্রবর্তিত হওয়ার অন্যতম একটি কারণ হলো মানুষের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করা; সকল ধরনের অন্যায় অবিচার, অকল্যাণ দূর করে শান্ত সুন্দর ও বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। নজরুলও মনে করেন ধর্মের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো অন্যায়ের প্রতিবাদ করা। কেননা ধর্ম মানে অন্যায় মেনে রণে ভঙ্গ দেওয়া নয় বরং অত্যাচারীকে তার অত্যাচার থেকে বিরতো রাখা। অন্যায়কে দৃঢ়ভাবে অন্যায় বলা, তার প্রতিবাদ করাই ধর্ম। অন্যায় দেখেও যারা তার প্রতিবাদ করে না, নজরুল তাদের 'কাপুরুষ' হিসেবে আখ্যা দেন। তিনি বলেন- "ধর্ম-পূজারি হচ্ছে সত্যের পূজারি; সত্যের পূজারি কখনো কাপুরুষ হয় না।"[৩৪] নজরুল মনে করেন, ধর্মের আগমন হয়েছে সকল ধরনের কুসংস্কার দূর করার জন্য, মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, মানুষের মধ্যকার উঁচু-নিচু ভেদ দূর করার জন্য; মানব কল্যাণই ধর্মের মূল কথা। মহানবীর বাণী 'যে মানুষের প্রতি সদয় নয় আল্লাহও তার

[৩১] রফিকুল ইসলাম, *কাজী নজরুল ইসলাম:*, পৃ. ২৪৭।

[৩২] গোলাম মুরশিদ, *বিদ্রোহী রণক্লান্ত:*,পৃ. ৭৭-৮।

[৩৩] আবুল ফজল, *বিদ্রোহী কবি নজরুল* (চট্টগ্রাম: বইঘর, ১৯৭৫), পৃ. ২৫।

[৩৪] "কানার বোঝা কুঁজোর ঘাড়ে,"নর **১১**, পৃ. ২৮৬।

প্রতি সদয় নয়'[৩৫]। বিদায় হজ্জের ভাষণেও মহানবী (সা.) সকল ধর্মের স্বাধীনতার কথা স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা দেন; ধর্মের ব্যাপারে জবরদস্তি না করার কথা বলেন। পবিত্র কোরআনের 'সূরা কাফিরূনে'ও অসাম্প্রদায়িকতার প্রতিধ্বণি রয়েছে।[৩৬]। অসাম্প্রদায়িক নজরুলের ভাষ্য 'মানুষকে ঘৃণা করতে শেখায় যে ধর্ম তাহা কোনো ধর্ম নয়'। তিনি আরোও বলেন-'যাহারা অন্য ধর্মকে ও অন্য মানুষকে ঘৃণা করে বা নীচ ভাবে, তাহারা নিজেই অন্তরে নীচ, তাহাদের নিজেরও কোনো ধর্ম নাই'।

নজরুলের মতে, ধর্মের অন্যতম আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো অসাম্প্রদায়িক মনোভাব গঠন। তাঁর মতে সাম্প্রদায়িকতা কোনো ধর্মের বৈশিষ্ট্য নয়। 'উমর ফারুক' কবিতায় তিনি দেখান যে, ধর্ম অত্যন্ত সহনশীল। এক ধর্ম অন্য ধর্মের উপর আঘাত করে না, জবরদস্তি চালায় না; বরং তাদের জান-মাল ও উপাসনালয় রক্ষা করে। কিন্তু নজরুল মনে করেন ধর্মানুসারীদের মধ্যে যারা ধর্মের এই উদার নীতি গ্রহণ না করে মানুষে মানুষে ভেদ করে তারা ধার্মিক নয় বরং গোঁড়া। কেননা মানুষের মধ্যেই স্রষ্টার অবস্থান। এ জন্য ধর্মের নামে কোনো জাতি কিংবা সম্প্রদায়কে উপেক্ষা বা অবজ্ঞা করা উচিত নয় বলে তিনি মনে করেন। নজরুলের এই দৃষ্টিভঙ্গি পবিত্র আল কোরআন ও হাদিস দ্বারা সমর্থিত। কোরআনে অন্য ধর্মের অনুসারীদের ব্যাপরে জবরদস্তি করতে নিষেধ করা হয়েছে।[৩৭] মহানবী (সা.) সব বিজিত জাতিকে নামে মাত্র কর দেওয়ার মাধ্যমে তাদের নিজ নিজ ধর্ম অনুসারে উপাসনার স্বাধীনতা দিয়েছেন।[৩৮] ধর্মের এই উদার দিকটি প্রমাণ করে যে, সকল ধর্মের প্রতি সহনশীল হওয়া, তাদের শ্রদ্ধা করা ধর্মাচারেরই একটি অংশ। ধর্মের এই উদারতার দিকটি নজরুল ফুটিয়ে তুলেছেন এভাবে-

তোমার ধর্মে অবিশ্বাসীরে তুমি ঘৃণ্য নাহি করে
আপনি তাদের করিয়াছ সেবা ঠাই দিয়ে নিজ ঘরে।
ভিন-ধর্মীর পূজা মন্দির
ভাঙিতে আদেশ দাওনি, হে বীর,
আমরা আজিকে সহ্য করিতে পারিনাকো পর-মত ॥
ক্ষমা করো হজরত ॥[৩৯]

---

[৩৫] Allama Sir Abdullah Al-Mamun Al-Suhrawardy, ed., *The Sayins of Muhammad*, 4th ed. (Dhaka: Islamic Foundation, 1978), 6

[৩৬] আল কোরআন, ১০৯:৬। সেখানে বলা হয়েছে 'তোমার ধর্ম তোমার কাছে আর আমার ধর্ম আমার কাছে'।

[৩৭] আল কোরআন, ২:২৫৬।

[৩৮] সৈয়দ আমীর আলী, *দ্য স্পিরিট অব্ ইসলাম*, অনু.,রশীদুল আলম (কলকাতাঃ মল্লিক ব্রাদার্স, ১৯৮৭), পৃ. ৩০৬।

[৩৯] "ক্ষমা করো হজরত!!," 'ঝড়,' নর ৬ষ্ঠ, পৃ. ১৪২।

নজরুলের সাহিত্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে ধর্ম বলতে তিনি বুঝতেন সৎভাবে জীবন যাপন করা, অন্যের অধিকার হরণ না করা, অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ না করা, আজাদ মানুষ বন্দী না করা, বিশ্বাসঘাতকতা না করা, ভিখারির মতো প্রার্থনার পরিবর্তে নিজের প্রচেষ্টায় সমস্যার সমাধান করা, লোভী মনকে দমন করা, চোর হয়ে সাধু সাজার অভিনয় ত্যাগ করা, ধর্মের পোশাক পরিধান করে খোদাকে ফাঁকি না দেওয়া, মনের পশুকে জবাই করা, অন্যকে কষ্ট না দেওয়া, বিবেকের শাসন মেনে চলা, মহান পবিত্র কাজের জন্য আত্মত্যাগ করা, মনুষ্যত্বের অপমান না করা, মানুষ ও অন্য ধর্মকে ঘৃণা না করা, পতিত-চণ্ডাল-ছোটলোককে আপন করে বুকে জড়িয়ে ধরা, নিজের দুর্বলতার জন্য অন্যকে নিন্দা না করা, আত্মপ্রবঞ্চনা ও আত্মনির্যাতন না করা, বিলাস-বাসনা ও ঐশ্বর্যের লোভ পরিত্যাগ করা, অবৈধভাবে রাজকোষ ব্যবহার না করা, যুদ্ধক্ষেত্রে নারী ও শিশুদের হত্যা না করা, মোসাহেবি ত্যাগ করা, পক্ষপাত না করা, দেশের অমঙ্গল চিন্তা না করা, কন্যাকে পুত্রের মতো শিক্ষা দেওয়া, খোদার উপর খোদকারী না করা, কারো দয়ার মুখাপেক্ষি না হওয়া, সুন্দর সমাজ প্রতিষ্ঠা করা প্রভৃতি। আর এগুলোকেই তিনি ধর্মের বৈশিষ্ট্য হিসেবে দেখেছেন।

ধর্মাচার প্রসঙ্গে নজরুল

ধর্মের সাথে ধর্মাচারের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। মানুষের মধ্যকার পশুবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ করে কল্যাণমুখী জীবন গড়া প্রতিটি ধর্মের উদ্দেশ্য। এ জন্য প্রতিটি ধর্মের নির্দিষ্ট কিছু আচার ও বিধি-বিধান রয়েছে। তবে প্রতিটি একেশ্বরবাদী ধর্মে স্রষ্টার গুণ অভিন্ন হলেও আচারিকভাবে ভিন্নতা তৈরি হয়। সমাজ ও সংস্কৃতির উন্নয়নের সঙ্গে আচারিক অনুষ্ঠানেও নতুন নতুন উপাদান যুক্ত হয়। তাই বলা যায় একটি পরিপূর্ণ, সরল ও একমাত্র চরমতম আদর্শ ধর্ম তার পূর্বের জায়গায় নেই। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কারণে ধর্মাচারে পরিমাণগত পার্থক্য দেখা দেয়। টোটেমবাদ ও বহুপ্রাণবাদ থেকে বহু-ঈশ্বরবাদ অতঃপর বহু-ঈশ্বরবাদ থেকে একেশ্বরবাদের দিকে অগ্রসর হওয়া থেকেই বোঝা যায় ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মাচারের বিবর্তন।[৪০]

ধর্মাচার সম্পর্কিত নজরুলের ধারণা মূল্যায়ন তার ব্যক্তি জীবনের ধর্মাচারের আলোচনা ব্যতীত সম্ভব হবে না। কেননা প্রতিটি কবির দুটো পরিচয় থাকে; প্রথমত তিনি মানুষ দ্বিতীয়ত কবি। ব্যক্তি ব্যতীত কবিকে জানা যায় না। কেননা ব্যক্তির ব্যক্তিত্বই ফুটে উঠে তার কবিতার মাধ্যমে। নজরুলও এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নন। সুতরাং ব্যক্তি নজরুলের ধর্মাচার মূল্যায়নপূর্বক ধর্মাচার সম্পর্কিত তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি মূল্যায়ন করা প্রয়োজন।

---

[৪০] ডি মায়াল এডোয়ার্ডস, *ধর্ম-দর্শন*, অনু. সুশীল কুমার চক্রবর্তী (কলকাতা: নবপত্র প্রকাশন, ১৯৫২), পৃ. ৭৯-৮১।

ধর্মবিশ্বাসী নজরুল কতোটা ধর্মাচারী ছিলেন তা নিয়ে অনেককে প্রশ্ন তুলতে দেখা যায়। রাজিয়া সুলতানা মনে করেন, নজরুল ব্যক্তি জীবনে ধর্মাচারের চেয়ে সাহিত্যে তার প্রতিফলন বেশি পরিমাণে দেখিয়েছেন।[৪১] আর গোলাম মুরশিদ উল্লেখ করেন যে, অসাম্প্রদায়িক নজরুল ইসলাম ধর্মের প্রতি আস্থাশীল হলেও ব্যক্তিজীবনে তিনি ধর্মকর্ম, আচার-অনুষ্ঠান পালন করতেন বলে বন্ধুরা কেউ লেখেন নি।[৪২] কিন্তু সূফী জুলফিকার হায়দার তাঁর *নজরুল জীবনের শেষ অধ্যায়ে* গ্রন্থে বলেছেন যে, একদিন তার বাড়িতে নজরুল নিজ ইচ্ছাতেই একবেলা নামাজ আদায় করেছেন।[৪৩] আবুল মনসুর আহমদও নজরুলকে নামাজ পড়তে দেখেছেন তবে তা ধর্মীয় নিয়ম অনুযায়ী ছিলো না।[৪৪] তবে গোলাম মুরশিদ অন্য এক জায়গায় বলেছেন যে, বালক নজরুল ধর্মাচারী, কিশোর ও যুবক নজরুল ধর্ম থেকে পালিয়ে বেড়াতে চাইতেন, কিন্তু বুলবুলের মৃত্যু, প্রমিলার অসুস্থতার ফলে নজরুল শেষের দিকে আধ্যাত্মিকতার দিকে ঝুকে যান এবং ধর্মকর্ম করা শুরু করেন।[৪৫] বন্ধু মুজাফ্‌ফর আহমদের সান্নিধ্যে আসার পর যুবক বয়সে নজরুল সাম্যবাদী আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ধর্ম থেকে দূরে অবস্থান করেছেন বলে মুরশিদ যে ধারণা করেছেন তা সর্বাংশে সঠিক নয়। কেননা নামাজ না পড়লেও ধর্মীয় চেতনার দিকটি তিনি কোনো সময়েই একেবারে ভুলে যাননি; যা তাঁর সাহিত্যিক জীবনের প্রতিটি ধাপে ধর্মীয় প্রত্যয় ব্যবহার থেকে সহজেই অনুমান করা যায়। এমনকি ‘সাম্যবাদী’ কাব্যেও তিনি ধর্মীয় প্রত্যয় ব্যবহার করে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, মার্কসীয় সাম্যবাদ তাঁর আদর্শ নয়। আর সাম্যবাদী কাব্যে তিনি ধর্মান্ধদের সমালোচনা করেছেন; ধর্মের নয়। ধর্মের বিরোধিতা থেকে নয় বরং ধর্মীয় কুসংস্কার দূর করে ধর্মের প্রতিষ্ঠাই তিনি চাইতেন।

অন্যদিকে নজরুল বরদাচরণ মজুমদারের কাছে যোগ-সাধনার দীক্ষা নেওয়া এবং তাঁর নির্দেশে নজরুল বাড়ির চিলেকোঠায় কালীপ্রতিমা স্থাপন করে সকাল-সন্ধ্যা মন্ত্রজপ করতেন বলে আজহারউদ্দীন দাবি করেছেন।[৪৬] কল্যাণী কাজী[৪৭] এবং অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত[৪৮]ও অনুরূপ দাবি করেছেন। কিন্তু বরদাচরনের মৃত্যুর পর নজরুল কনিষ্ঠ বন্ধু শান্তিপদ সিংহের কাছে স্বীকার করেন যে, যোগ সাধনা না নিয়ে ‘নামাজ নেওয়া উচিত ছিলো’।[৪৯] বুলবুলের মৃত্যুর শোক দূর করতে এবং স্ত্রীর অসুস্থতা হতে সুস্থ করতে নজরুলকে যে যা করতে বলেছেন, তিনি তাই করেছেন। সুতরাং

---

[৪১] রাজিয়া সুলতানা, *নজরুল-অন্বেষা*, ১ম খণ্ড (ঢাকা: মখ্‌দুমী অ্যাণ্ড আহ্‌সানউল্লাহ লাইব্রেরি), পৃ. ১১।

[৪২] গোলাম মুরশিদ, বিদ্রোহী রণক্লান্ত:, পৃ. ১৫৭।

[৪৩] সূফী জুলফিকার হায়দার, *নজরুল জীবনের শেষ অধ্যায়* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি,১৯৬৫), পৃ. ১৩।

[৪৪] আবুল মনসুর আহমদ, *আত্মকথা* (ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৯৯), পৃ. ২৬৭-৮।

[৪৫] গোলাম মুরশিদ, বিদ্রোহী রণক্লান্ত:,পৃ. ৪৩৫-৪৪১।

[৪৬] আজহারউদ্দীন খান, বাংলা সাহিত্যে নজরুল, তৃতীয় সং (কলকাতা: ডি এম লাইব্রেরি, ১৯৫৮), পৃ. ৫৬।

[৪৭] Kalyani Kazi, *Nazrul: The Poet Remembered* (New Delhi: Wisdom Tree, 2009), p. 136.

[৪৮] অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, জৈষ্ঠের ঝড় (কলকাতা: আনন্দধারা, ১৯৬৯), পৃ. ৩২৭।

[৪৯] শান্তিপদ সিংহ, *নজরুল কথা*, দ্বিতীয় সং (কলকাতা: নবজাতক, ১৯৯৮), পৃ. ৮৪।

বলা যায় পূজার্চনা করার ক্ষেত্রে ধর্মীয় ভক্তির চেয়ে শোকমুক্তিই মুখ্য উদ্দেশ্য হিসেবে ভূমিকা রেখেছে। তাছাড়া নজরুলের শাশুড়ী গিরিবালা দেবী ও স্ত্রী প্রমীলা দেবী ছিলেন হিন্দু ধর্মাচারী। ফলে তাদের বাড়িতে কালীমূর্তি থাকাটা অস্বাভাবিক নয় বরং খুবই স্বাভাবিক।

নজরুল ধর্ম সম্পর্কে উদার দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেন এবং ধর্মের আনুষ্ঠানিকতার পরিবর্তে এর চেতনার দিকের উপর গুরুত্বারোপ করেন। নিজে নিয়মিত ধর্মাচারী না হলেও ধর্মের প্রতি তাঁর আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি যে গভীর ছিলো তা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। রাজা রামমোহন রায়ও হিন্দু ধর্মের প্রচলিত আচারবিরোধী ছিলেন, কিন্তু বেদের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ও একেশ্বরবাদী চেতনা ব্রাহ্মধর্মে প্রচার করেন।[৫০]

প্রচলিত প্রায় প্রতিটি ধর্মে একেশ্বরের কথা বলা হয়। একই স্রষ্টাকে কেন্দ্র করে পূজারীরা বন্দেগি করে। কিন্তু তারপরও মাঝেমধ্যে ধর্মানুসারীদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। বিরোধ থেকে সংঘাত সংঘটিত হওয়ায় বোঝা যায় ধর্মাচারের ভিন্নতাই এর মূল কারণ। আর অধিকাংশ ধার্মিক ধর্ম বলতে শুধু ধর্মাচারকে বুঝে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে ধর্ম মানুষের মধ্যে উদারতা, পরমতসহিষ্ণুতার শিক্ষা দেয়। এ প্রসঙ্গে গোবিন্দচন্দ্র দেব বলেন-

> জগতের অগনিত মানুষ, যাদের সেই অনুভূতি নাই তাদের কাছে ধর্ম শুধু একটা বিশ্বাসের ব্যাপার। তারা তাদের ধর্মগ্রন্থের মারফত, পীর-দরবেশ, সাধু-সন্ন্যাসী ও ধর্ম প্রচারকদের মারফত ধর্মের কতগুলো কথা শুনেছে, আর ধর্মের নামে কতকগুলো আচার-অনুষ্ঠান যান্ত্রিকভাবে যুগ যুগ ধরে বংশ-পরম্পরায় পালন করে যাচ্ছে। ধর্ম তাই তাদের কাছে অন্ধবিশ্বাসের এক বড় পুঁটলী।[৫১]

ফলে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে পরস্পর-বিরোধী আচার প্রচলিত। সেইসব আচার-অনুষ্ঠানের স্বার্থকতা প্রমাণের জন্য মানুষ কলহে লিপ্ত হয় এবং নরহত্যার মতো জঘন্য কাজ করতেও কুণ্ঠিত হয় না। ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে যে ভেজাল ঢুকে মানুষের অকল্যাণের এক বড় হাতিয়ার হয়েছে, অযৌক্তিক ও কুসংস্কারের পুঁটলী হয়ে উঠেছে তা থেকে উদ্ধার করে ধর্মের কল্যাণময় দিকটি সংশয়যুক্ত মানুষের সামনে তুলে ধরাই দার্শনিকদের প্রধান কাজ বলে জি. সি দেব মনে করেন। এ জন্য বলা হয় বিশ্বমানবের সেবা ও কল্যাণ করাই হলো প্রকৃষ্ট ধর্মাচারণ।[৫২] বাঙালি মনীষীদের মধ্যে এর সমর্থন রয়েছে। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা এর মতে, ধর্ম শুধু উপাসনা, পরজগত চর্চা ও তপজপ নয়; ধর্ম হলো বিশ্বাস অনুভূতি ও যুক্তি বিচারের সমন্বয়ে গঠিত ব্যক্তিসত্তার সামগ্রিক বিকাশের পরিপূর্ণ পরিস্ফুটন। মানুষের কল্যাণ ও মুক্তির পথ প্রদর্শনই ধর্মীয় বিধি-বিধান ও আচার

---

[৫০] মোঃ মোজাহার আলী, "বাংলাদেশ দর্শনে ধর্ম, নৈতিকতা ও মানবতাবাদ: একটি দার্শনিক বিশ্লেষণ"(এমফিল থিসিস, দর্শন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১১),পৃ. ৮৪।

[৫১] গোবিন্দ্রচন্দ্র দেব, *তত্ত্ববিদ্যা-সার* (ঢাকা: অধুনা প্রকাশন, ২০০৪), পৃ. ৫০।

[৫২] মোঃ মোজাহার আলী, বাংলাদেশ দর্শনে ধর্ম, নৈতিকতা ও মানবতাবাদ:, পৃ. ১০২।

অনুষ্ঠানের লক্ষ্য। কেননা হিন্দু, ইসলাম, খ্রিস্টান প্রভৃতি ধর্মের সারকথা একই তা হলো মানবের সেবার মাধ্যমেই স্রষ্টার সান্নিধ্য।[৫৩] নজরুলের সাহিত্যেও মানুষ-ধর্মের মুলমন্ত্র ফুটে উঠেছে।

ধর্মের দু'টি দিক আছে-বিশ্বাস ও কর্ম। বিশ্বাসের দিক থেকে ধর্মের লক্ষ্যই হলো মানুষের কল্যাণসাধন। অন্যদিকে ধর্মে ধর্মে যে তিক্ত বিরোধ ও সংঘর্ষ দেখা যায় এ সবের মূলে রয়েছে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ও যাগযজ্ঞের পার্থক্য। ডাঃ লুৎফর রহমানের দৃষ্টিতে ধর্মের বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান পালন করলে তাকে আক্ষরিক অর্থে ধার্মিক বলা যাবে কিন্তু তার জীবন যদি সৎ ও কলুষমুক্ত না হয় তাহলে সে ধার্মিকের কোনো মূল্য থাকে না। তাই মানুষকে মানুষরূপে গড়ে তোলাই ধর্মের মূল উদ্দেশ্য।[৫৪] নজরুল মনে করেন ধর্ম শুধু ভাবের বিষয় নয় বরং বাস্তব জীবনে প্রতিফলনেরও বিষয়। ব্যক্তি তখনই প্রকৃত ধার্মিক হন যখন তিনি ভাবের পাশাপাশি কর্মক্ষেত্রেও প্রবেশ করেন; শুধু প্রার্থনা করার মাধ্যমে সকল সমস্যার সমাধান চান না। নজরুল বলেন- "ধর্মাভাব মানে এ নয় যে শুধু নামাজ, রোজা, পূজা, উপাসনা নিয়েই থাকবেন। কর্মকে যে ধার্মিক অস্বীকার করলেন, কর্মকে সংসারকে যিনি মায়া বলে বিচার করলেন, কর্ম, সংসার ও মায়ার স্রষ্টার তিনি বিচার করলেন।"[৫৫]

নজরুল ধর্মকে বুঝে পালন করার প্রতি গুরুত্ব দেন। কেননা শেষ বিচারে স্রষ্টা মানুষের অন্তরের দিক, তার আনুগত্য, প্রভৃতি দেখবেন। বিশেষ করে একজন মুসলমান হিসেবে নজরুল মানুষের অন্তরে যতো ধরনের কুপ্রবৃত্তি, পশুবৃত্তি বিরাজ করে তা থেকে রক্ষা বা মুক্তি পেতে নামাজ আদায় করার কথা বলেন। তবে সে নামাজ যেনো শুধুমাত্র মাটিতে কপাল ঠেকানো না হয়। বরং স্রষ্টাকে অন্তরে ধারণ করে হয়। আর যাকাতকে তিনি দেখেছেন গরিবের অর্থনৈতিক মুক্তির উপায় হিসেবে। এর একটি অর্থ এটা যে, ভোগের তরে মুসলমানের আগমন নয়; বরং দুনিয়াতে সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য আগমন। নজরুল আরো মনে করেন ধনীর আহারে গরিবের অধিকার না থাকলেও তার উদ্বৃত্ত সম্পদে গরিবের হক অবশ্যই রয়েছে। নজরুলের নিম্নোক্ত উক্তির মধ্যে রয়েছে সেই সাম্যাবস্থার ইঙ্গিত।

দে জাকাত, দে জাকাত, তোরা দে রে জাকাত।
তোর দীল্ খুলবে পরে, ওরে আগে খুলুক হাত ॥

নজরুল মনে করেন ইবাদত কবুল হওয়ার জন্য প্রথমে আত্মার শুদ্ধতা দরকার। স্রষ্টা মানুষের অন্তরের একাগ্রতা ও পরিশুদ্ধতা দেখেন। যার অন্তর খোদার রাহে নিবেদিত সে কখনো অভিনয় করতে পারে না। ইব্রাহিমের (আ:) অন্তরে কোনো ফাঁকি না থাকায় তাঁর প্রিয় সন্তানকে আল্লাহর

---

[৫৩] খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, বিভিন্ন ধর্মের উপদেশাবলী (ঢাকা: ঢাকা আহছানিয়া মিশন, ১৯৬৪), পৃ. ১-৫।
[৫৪] মোঃ মোজাহার আলী, বাংলাদেশ দর্শনে ধর্ম, নৈতিকতা ও মানবতাবাদ:, পৃ. ৪৬।
[৫৫] "ধর্ম ও কর্ম," নর ৭ম, পৃ. ৪৬।

নির্দেশে উৎসর্গ করতে রাজি হয়েছিলেন। আর তাতেই খোদা সন্তুষ্ট হয়ে যান। কেননা আল্লাহ পশুর রক্ত-মাংস চান না, চান বান্দার অন্তরের পবিত্রতা। বঙ্কিমের মধ্যেও অনুরূপ চিন্তা লক্ষ করা যায়। বঙ্কিমের মতে, চিত্তশুদ্ধি থাকলে সকল মতই শুদ্ধ আর চিত্তশুদ্ধির অভাবে সকল মতই অশুদ্ধ। যার চিত্তশুদ্ধি নাই, তার কোনো ধর্ম নাই। যার চিত্তশুদ্ধি আছে তার কোনো ধর্মের প্রয়োজন নাই; এ মত সকল ধর্মের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যার চিত্তশুদ্ধি আছে সে শ্রেষ্ঠ হিন্দু, শ্রেষ্ঠ মুসলমান, শ্রেষ্ঠ খ্রিস্টান, শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ। যার চিত্তশুদ্ধি নাই সে কোনো ধর্মেরই ধার্মিক নন।[৫৬]নজরুল মনে করেন বাংলার মুসলমানরা কোরবানির প্রকৃত তাৎপর্য ভুলে তার পরিবর্তে খোদার বিধান যেনো তেনো প্রকারে সাতজন মিলে একটি পশু কোরবানি করে মুক্তি পেতে চায়। অথচ তারা মানতে চায় না যে, পশু কোরবানি করার পূর্বে মনের মধ্যকার পশুকে সর্বাগ্রে কোরবানি করতে হয়। তা না হলে তার আর কশাইয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না। নজরুল বলেন-

বাঁচায়ে আপনা ছেলে-মেয়ে
জান্নাত পানে আছ চেয়ে
        ভাবিছ সেরাত হবেই পার।
কেননা, দিয়েছ সাতজনের
তরে এক গরু ! আর কি, ঢের !
        সাতটি টাকায় গোনাহ্ কাবার !
…   …   …
মনের পশুরে করো জবাই,
        পশুরাও বাঁচে, বাঁচে সবাই।
        কশাই-এর আবার কোরবানি![৫৭]

নজরুল প্রথাগত ধর্মাচারের চেয়ে ধর্মের অন্তরের দিকটিকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি মনে করেন ধর্মাচারী হয়েও যদি মানুষ মানুষের মর্যাদা দিতে না পারে, ক্ষুধার্তকে খাবার দেবার পূর্বশর্ত হিসেবে তার ধর্মের অনুসারী কী না বিবেচনা করে তাহলে সেই ধর্মাচারের কোনো মূল্য নেই। এজন্য 'মানুষ' কবিতায় তিনি বুভুক্ষু সাধারণ মানুষের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশের পাশাপাশি মন্দির-মসজিদের আচারসর্বস্ব ধর্মনিষ্ঠার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন। এজন্য মানুষকে অবমাননা করে প্রচারসর্বস্ব, সারশূন্যহীন ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতাকে বন্ধ করতে প্রয়োজনে শক্তি প্রয়োগের বলিষ্ঠ নির্দেশ দিয়েছেন।[৫৮]নানক মনে করতেন শুধু বাইবেল, কোরআন, গীতা পড়লে হবে না তার মর্মমূল অন্তরে ধারণ করতে হবে, ইন্দ্রিয়কে সংযত রাখতে হবে।[৫৯] গৌতম বুদ্ধও

---

[৫৬] মোহাম্মদ আবদুল হাই (সম্পাদিত), *বাঙালির ধর্মচিন্তা*, পৃ. ৬০। এবং আহমদ শরীফ, *বাঙলার মনীষা* (ঢাকা: অনন্যা, ২০০৫), পৃ. ৫৬।

[৫৭] "শহীদী-ঈদ," 'ভাঙার গান,' নর ১ম, পৃ. ১৭৯-৮০।

[৫৮] নজরুল ইসলাম, "উইলিয়ম জেমস ও জাঁ পল সার্ত্রের মানবতাবাদের আলোকে কাজী নজরুল ইসলামের মানবতাবাদ" (পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, দর্শন বিভাগ: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৯), পৃ.১৫৬।

[৫৯] আজিজুন্নহার ইসলাম ও কাজী নূরুল ইসলাম, *তুলনামূলক ধর্ম নৈতিকতা ও মানবকল্যাণ*, পৃ. ১৭০।

মনে করতেন আনুষ্ঠানিকতা নয় বরং সৎকর্ম ও সচ্চরিত্রের দ্বারাই মানুষ মুক্তি পেতে পারে। তাঁর মতে গঙ্গা, যমুনা, বা স্বরসতীতে অবগাহন করে কেউ কোনো দিন পুণ্য অর্জন করতে পারে না। কারণ তাই যদি হতো তাহলে জলে অবস্থান করা প্রাণীকুল সহজেই মুক্তি পেয়ে যেতো। এভাবে তিনি ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতার অন্তঃসারশূণ্যতাকে ব্যাখ্যা করে মানুষের আত্মশক্তিকে জাগ্রত করেন।[৬০]নজরুলও বুঝতে পেরেছিলেন ধর্ম কেবল কিছু মন্ত্রতন্ত্র কিংবা আচার-অনুষ্ঠানের ব্যাপার নয়। কারণ, শেষ বিশ্লেষণে ধর্মমাত্রেরই লক্ষ্য মানবকল্যাণ।[৬১]ধর্ম যেন আজ শুধু আনুষ্ঠানিকতায় বন্দি। নজরুল বলেন-

বলি দিয়া মোরা পূজেছি দেবীরে
নব-ভারতের পূজারী-দল
গিয়াছিনু ভুলি–দেবীরে জাগাতে
দিতে হয় আঁখি-নীলোৎপল।[৬২]

নজরুল মনে করেন ধর্মের মূল কথা হলো স্রষ্টার ইবাদত। তবে সে ইবাদত হতে হবে স্রষ্টাকে ভালোবেসে। তিনি বলেন-"পূজা মানে দেবতাকে সত্যি করে চিনে তাঁকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়া। যাঁকে আমি সত্য করে বুঝতে পারিনি, তাঁকে পূজা করতে যাওয়া তাঁর অপমান করা। মিথ্যা মন্ত্রের উচ্চারণে দেবতা পীড়িতই হয়ে ওঠেন দিন দিন, প্রসাদ দেন না।"[৬৩] নজরুলের মতে, স্রষ্টা প্রেম-ভিখারি; তিনি সেই বান্দার ডাকেই সাড়া দেন, যে তাঁকে ভালোবেসে অন্তরের অন্তস্তল থেকে ডাকে। কেননা মুখস্ত মন্ত্ররোলে স্রষ্টা বিরক্তই হন, আশিস দেন না। স্রষ্টাকে ভালো না বেসে শুধু মুখস্ত কিছু মন্ত্র দিয়ে নামাজ-রোজা-পূজার্চনা করলে এবং শিরনি দিয়ে স্রষ্টার ভালোবাসা পাওয়া যায় না। নজরুল বলেন-

খুঁজিস তারে ঠাকুর-পূজায়
উপাসনায় নামাজ রোজায়,
চাল কলা আর সিন্নি দিয়ে
ধরবি তারে হায় শিকারী !
পালিয়ে বেড়ায় মন-আঙিনায়
সে যে শিশু প্রেম-ভিখারি ॥[৬৪]

তিনি আরো বলেন-

নামাজ-রোজার শুধু ভড়ং

[৬০] এম. মতিউর রহমান, ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃতি (ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাষ, ২০১৬), পৃ, ৯২।
[৬১] আমিনুল ইসলাম, *বাঙালির দর্শন: প্রাচীনকাল থেকে সমকাল* (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৪), পৃ. ২১৬।
[৬২] "যতীন দাস," 'প্রলয়-শিখা,' নর ৪র্থ, পৃ. ১১৩।
[৬৩] "ধূমকেতু'র পথ," 'রুদ্র-মঙ্গল,' নর ২য়, পৃ. ৪২৯-৩০।
[৬৪] "গুল্‌-বাগিচা,"নর ৫ম, পৃ. ২৬২-৩।

ইয়া উয়া পরে সেজেছ সং,
ত্যাগ নাই তোর এক ছিদাম!
কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা করো জড়ো
ত্যাগের বেলাতে জড়সড়!
তোর নামাজের কি আছে দাম?[৬৫]

উপাসনালয় সম্পর্কিত নজরুলের চিন্তা

উপাসনালয় মাত্রই পবিত্র স্থান। তাই ভিন্ন ধর্মীয় উপাসনালয়কে ঘৃণা করার কোনো সুযোগ নাই। বরং অন্য ধর্মের উপাসনালয়কে সংরক্ষণ করা সকলের কর্তব্য। যেমনটি করেছিলেন হজরত উমর (রা:)। আর এটাই ইসলাম ধর্মের বিধান। জেরুজালেমের গীর্জায় নামাজের সময় হলে গীর্জার পাদ্রি উমর (রা:) কে সেখানে নামাজ পড়ার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু উমর তাতে রাজি না হয়ে বলেন যে, আজ যদি আমি এখানে নামাজ পড়ি তাহলে একদিন অন্ধ লোকসমাজ এটি মুসলমানদের প্রার্থনাগৃহ মনে করে তা দখল করতে চাইবে। সে সুযোগ যেন কেউ না পায় এজন্য তিনি সেখানে নামাজ আদায়ের প্রস্তাব দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করেন; এবং গীর্জার বাইরে উন্মুক্ত জায়গায় নামাজ আদায় করেন। এ থেকেও প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম ধর্ম অন্য ধর্মের প্রার্থনাগৃহকে সম্মান ও সংরক্ষণ করতে নির্দেশ দিয়েছে। অসাম্প্রদায়িক নজরুলও ধর্মের এই বিধানের পক্ষপাতি। 'উমর ফারুক' কবিতাতে তিনি এই ঘটনাটি উল্লেখের মাধ্যমে নিজের দর্শনটি প্রকাশ করেছেন।

কিন্তু ধর্মের এই উদার শিক্ষাটি ধর্মমাতালদের হাতে পড়ে কলঙ্কিত হয়েছে। যে মসজিদে বসে রসুল (সা.) ও তাঁর সাহাবিগণ রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন, রাষ্ট্রের মঙ্গল নিয়ে শলা-পরামর্শ করেছেন, শান্তির বার্তা বিশ্বের প্রতিটি কোণায় পৌঁছে দিয়েছেন, সেই মসজিদকে ধর্মমাতালরা তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির উপায় হিসেবে গ্রহণ করেছে। মসজিদ-মন্দিরে বসে এরা মানুষ হত্যার পরিকল্পনা করে। এ প্রসঙ্গে 'মন্দির ও মসজিদ' প্রবন্ধে নজরুলের অভিমত হলো, মানবতার দিকটিকে খেয়াল না করে যারা তাদেরই পায়ে দলা মাটি দিয়ে মন্দির-মসজিদ নির্মাণ করল, আর তা রক্ষার জন্য দাঙ্গায় মানুষকে হত্যা করলো, তারা আর যাই হোক প্রকৃত ধার্মিক হতে পারে না বরং তারা শয়তান। এজন্য নজরুল এই শয়তানদের উপাসনালয়ের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেন। ধর্মের বিরোধিতা থেকে নয় বরং ধর্মমাতালদের বিরোধিতা করতে তিনি রূপকের আশ্রয় নিয়েছেন। 'পথের দিশা' কবিতায় তিনি বলেন-

মসজিদ আর মন্দির ঐ শয়তানদের মন্ত্রণাগার,
রে অগ্রদূত, ভাঙতে এবার আসছে কি জাঠ কালাপাহাড় ?
জানিস যদি, খবর শোনা বন্ধ খাঁচার ঘেরাটোপে,

[৬৫] "ভাঙার গান," নর ১ম, পৃ. ১৭৯।

উড়ছে আজো ধর্ম-ধ্বজা টিকির গিঁঠে, দাড়ির ঝোপে ![৬৬]

'মানুষ' কবিতায় নজরুল দেখিয়েছেন যে, মন্দিরের পূজারী আর মসজিদের মোল্লা তাদের নিজেদের স্বার্থে উপাসনালয়কে ব্যবহার করেছে। মানবতাকে করেছে ভুলণ্ঠিত। আল্লাহ যেখানে বান্দাকে ক্ষুধার অন্ন দেওয়ার ক্ষেত্রে ইবাদতকে শর্ত হিসেবে উল্লেখ করেননি; সেখানে মানুষ নামাজ না পড়ার অজুহাতে ক্ষুধার্তকে খাবার না দেওয়ায় নজরুল ব্যথিত হন। ফলে তিনি চেঙ্গিস, গজনি মাহমুদ, কালা পাহাড়কে ভজনালয় ভেঙ্গে ফেলার জন্য যে আহ্বান করেন, সে আহ্বান প্রকৃতপক্ষে মসজিদ-মন্দির ভাঙার আহ্বান নয়। বরং সেই আহ্বান পূজারীর ও মোল্লার বিরুদ্ধে; যারা মানবতার দিকটিকে উপেক্ষা করে স্বার্থপূজায় ব্যস্ত। তাঁর এই বিদ্রোহ স্বার্থপূজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।

ধর্মান্ধতার সমালোচনায় নজরুল

নজরুল সমকালে ভারতের হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈরিতার সম্পর্ক বিদ্যমান ছিলো। নজরুল বিংশ শতাব্দীর বিশের দশকের হিন্দু-মুসলিমের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের পেছনে সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে দায়ী করেন। তিনি লক্ষ করেন ১৯২৬ সালের মে মাসে কৃষ্ণনগরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে দক্ষিণপন্থী ও সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্নদের চাপে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের 'হিন্দু-মুসলিম প্যাক্ট' বা 'বেঙ্গল প্যাক্ট' বাতিল করা হয়; যেখানে মুসলমানদের কিছু রাজনৈতিক সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিলো। নজরুলের কৃষক-শ্রমিক দলের কয়েকজন কর্মী ছাড়া আর সব রাজনীতিকই অতি হিন্দু বা অতি মুসলমান হয়ে পড়ে; এমনকি হিন্দু ও মুসলমান পরিচালিত পত্র-পত্রিকাগুলোও সাম্প্রদায়িক বিষ ছড়ায়।[৬৭] এই পরিপ্রেক্ষিতে নজরুল ধর্ম-বর্ণের ঊর্ধ্বে উঠে মানুষকে মানুষ হিসেবে দেখার আহ্বান করে 'কাণ্ডারী হুশিয়ার' গানটি রচনা করেন। একই বছর কলকাতায় হিন্দুদের রাজ-রাজেশ্বরী মিছিলকে কেন্দ্র করে সংঘটিত হয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা যা নজরুলকে যুগপৎ ব্যথিত ও বিস্ময়ে বিমূঢ় করে।[৬৮] গত শতাব্দীর এই সাম্প্রদায়িক অবস্থার মধ্যে অল্প সময়ের জন্য ভারতবর্ষে রাজা রামমোহন রায় ও মহাত্মা গান্ধী ব্যতীত হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের অন্য কেউ স্ব-সম্প্রদায়ের সীমা অতিক্রম করতে পারেন নি। এই সাম্প্রদায়িক কলুষিত সমাজের মাঝখানে নজরুল বিস্ময়করভাবে নিজেকে সাম্প্রদায়িকতামুক্ত রাখেন।[৬৯] সওগাত সম্পাদকের দৃষ্টিতেও নজরুল ছিলেন সাম্প্রদায়িকতার বহু ঊর্ধ্বে।[৭০]

---

[৬৬] "পথের দিশা," 'ফণি-মনসা,' নর ৩য়, পৃ. ৬২।

[৬৭] রফিকুল ইসলাম, কাজী নজরুল ইসলাম:, পৃ. ১১০-১১।

[৬৮] কামরুল আহসান, *নজরুল কাব্যে সাময়িকতা* (ঢাকা: নজরুল ইন্সটিটিউট, ২০০১), পৃ. ৬৫।

[৬৯] তদেব, পৃ. ১২৩।

[৭০] মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন, *সওগাত-যুগে নজরুল ইসলাম* (ঢাকা: নজরুল ইন্সটিটিউট, ১৯৮৮), পৃ. ৭৫।

নজরুল বেদনার সাথে লক্ষ করেন ধর্মের মধ্যে উদার নৈতিকতার শিক্ষা থাকলেও কিছু অনুসারী তা ভুলে স্বার্থের দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে, ধর্মের মুখোশ পরে অধার্মিক কাজ করে, এবং সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ছড়িয়ে দেয়। ধর্মের নৈতিক বিধান প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশী রক্তলেখক, চির-বিদ্রোহী বীর নজরুল সত্য-সুন্দরের প্রতিষ্ঠার জন্য, সকল ধরনের অশুভ ও অমঙ্গলকে সমাজ হতে দূর করার জন্য কলমযুদ্ধ শুরু করেন। কেননা তিনি জানতেন যে তিনি একা রক্ত ঝরাতে পারবেন না এজন্যই "রক্ত ঝরাতে পারি নাকো একা/ তাই লিখে যাই এ রক্তলেখা" লিখেন। নজরুলের এই ইচ্ছাকে প্রবলতর করে তৎকালীন সমাজের পারিপার্শ্বিক অবস্থা, শাসক ও শোসিতের দ্বন্দ্ব, মুসলমানদের মধ্যকার 'আশরাফ-আতরাফ'ভেদ, হিন্দু-মুসলমান দ্বন্দ্ব, সাম্প্রদায়িকতা, হিন্দুদের 'ছুৎমার্গ', বর্ণভেদ, কুসংস্কার ও গোঁড়ামি, ধর্মান্ধতা, এবং নৈতিকতার চরম অবক্ষয়। তিনি এগুলোকে দেখেছেন সমাজে 'বিষফোঁড়া' হিসেবে। প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁ এর চিঠির উত্তরে নজরুল এই বিষফোঁড়াকে সমাজ হতে দূর করতে 'হাতুড়ে ডাক্তার' এর পরিবর্তে 'অস্ত্র-চিকিৎসকে'র ভূমিকা পালন করতে চান। তৎকালীন বোদ্ধামহলও চাইতেন সমাজে বিদ্যমান ধর্মের নামে অধার্মিক কার্যাবলী, কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা এবং অনৈতিক দিকগুলো সবার সামনে উন্মোচিত হোক। *সওগাত* পত্রিকার সাথে নজরুলের সম্পাদিত চুক্তিতে এই বিষয়টি স্পষ্টভাবে দেখা যায়। সেখানে বলা হয়-"সাপ্তাহিক 'সওগাতে'র 'চানাচুর' বিভাগ পরিচালনা করবেন। ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক দুর্নীতি ও ভণ্ডামির বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করবেন।"[৭১]বন্ধু শৈলজানন্দের মেসের, হেমেন্দ্রকুমার রায়ের কন্যার বিবাহ উৎসব ও নলিনাক্ষ সান্যালের বিবাহের তিক্ত অভিজ্ঞতা, এবং অমুসলমান মেয়েকে বিয়ে করায় হুগলীর হিন্দু বাড়িওয়ালারা কর্তৃক বাড়িভাড়া দিতে না চাওয়া নজরুলকে ধর্মীয় গোঁড়ামি ও ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে কলম ধরতে অনুপ্রাণিত করে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে, ভণ্ড মোল্লা-পুরোহিতদের বিরুদ্ধে, ভণ্ড তপস্বীদের বিরুদ্ধে তিনি যে সংগ্রাম শুরু করেছিলেন তা তিনি আমৃত্যু চালিয়ে গেছেন। নজরুল মুসলমান সমাজের গতানুগতিক জীবনের প্রতি ধিক্কার জানিয়ে সাহিত্যিক জীবনের প্রথমেই তাই 'মোহররম', 'কোরবানি', 'শাত্-ইল-আরব' প্রভৃতি কবিতা রচনা করে অলসতার ঘুম ভাঙাতে চেয়েছেন।[৭২] নজরুলের এই সংগ্রামকে কাজী আবদুল ওদুদ কয়েকটি ভাগেভাগ করেছেন[৭৩]–

ক. অত্যাচারী শাসক সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম;
খ. বঞ্চনাকারী ভোগলিপ্সু শোষকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম;
গ. সামাজিক অসাম্য ও শ্রেণি বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম; এবং
ঘ. সাম্প্রদায়িকতা, সামাজিক সংস্কার ও ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম।

[৭১] তদেব, পৃ. ১২৫।
[৭২] কাজী আবদুল ওদুদ.*নজরুল-প্রতিভা*, ১ম সং (ঢাকা: ওরিয়েন্ট পাবলিশার্স, ১৯৪৯), পৃ. ৪।
[৭৩] শাহাবুদ্দীন আহমদ, *নজরুল সাহিত্য বিচার* (ঢাকা: মুক্তধারা, ১৯৭৬), পৃ. ১২৪।

অসাম্প্রদায়িক নজরুল হিন্দু-মুসলমানের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান মনে প্রাণে চাইতেন বলে বারবার তাঁর সাহিত্যে ঐক্যের সুর বাজিয়েছেন। তাই হিংসা-বিদ্বেষ-কন্টকিত সমাজে অসাম্প্রদায়িক ভারত গঠনের জন্য কোরবানি, মহর্‌রম, দুর্গা-পূজা, সরস্বতি-পূজা সবই নজরুলের সাহিত্যের বিষয় হয়েছে। আল্লাহ-ভগবান, মসজিদ-মন্দির-গির্জা, ঈসা-মূসা, কৃষ্ণ-বুদ্ধ, মুহাম্মদ প্রভৃতি ধর্মীয় ঐতিহ্যকে বাঙালি পাঠকের মানসিক সংকীর্ণতাকে দূর করার জন্য সাহিত্যে আলোচনা করেন। 'পুতুলের বিয়ে' নাটকে অসাম্প্রদায়িক চেতনা শিশুমনে প্রসারিত করার জন্য নজরুল পুরুত-ঠাকুরের ধর্মীয় গোঁড়ামিকে তুলে ধরেন।[৭৪] কমলি ও টুলির সংলাপের মাধ্যমে নাট্যকার বলেন- "অন্য ধর্মের কাউকে ঘৃণা করলে ভগবান অসন্তুষ্ট হন। ওদের আল্লাও যা, আমাদের ভগবানও তা"। মানবতার মহানাাদর্শে অনুপ্রাণিত নজরুলের কাব্য-ভাবনার এক প্রধান অংশ জুড়ে আছে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি কামনা। এজন্য তিনি যেখানেই ইসলাম ধর্মীয় প্রত্যয় ব্যবহার করেন সেখানেই হিন্দু ধর্মীয় প্রত্যয় ব্যবহার করেন 'সব্যসাচী'র[৭৫] মতো। 'মিলন-গান', 'যা শত্রু পরে পরে', 'পথের দিশা', 'হিন্দু-মুসলিম যুদ্ধ' প্রভৃতি কবিতাগুলোতেও নজরুলের এই অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছে। দেশমাতার মুক্তির জন্য ইসলামি ঐতিহ্য প্রধান কবিতায় যেমন তিনি 'হায়দরী হাঁক' হিন্দু ঐতিহ্য প্রধান কবিতায় তেমনি 'ওঙ্কার ধ্বনি' উচ্চারণ করেন। ১৯১৯ সালে বাঙালি পল্টন থেকে *বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা*'র সম্পাদকের নিকট লিখিত পত্রে সম্বোধনের ক্ষেত্রে হিন্দু সংস্কৃতির 'আদাব' এবং শেষ অংশে মুসলিম সংস্কৃতির 'খাদেম' শব্দটি ব্যবহার করেন। 'বিদ্রোহী' কবিতাও তার অনন্য উদাহরণ।

নজরুল নিজেকে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যকার ভেদাভেদ ধ্বংসকারী, স্বয়ং স্রষ্টা কর্তৃক প্রেরিত অগ্রদূত তুর্যবাদক হিসেবে মনে করেন। তাই তিনি সকল ধরনের অসাম্য, গোঁড়ামি, ও ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন। এজন্য নজরুলকে 'প্রথম যথার্থ প্রতিবাদের কবি'[৭৬] হিসেবে অশ্রুকুমার শিকদার আখ্যা দেন। নজরুল বুঝতে পারেন বিভিন্ন ধর্ম ও সংস্কৃতিকে একত্রিত করতে পারলেই কেবল তাদের মধ্যে স্থায়ী আন্তঃধর্মীয় শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে; ধর্মের বিশ্বজনীন দিকটি উদ্ভাসিত হবে; গোঁড়ামি, হীনমন্যতা, বিদ্বেষ, ধর্মান্ধতা ও প্রতিযোগিতা হ্রাস পাবে। তাই 'নিরঙ্কুশভাবে অসাম্প্রদায়িক' নজরুল বাংলার হিন্দু-মুসলমান দু'টি জাতিকে একই মায়ের সন্তান ও একই জল-মাটি-ভাষা হতে উৎপত্তি বলে পরিচয় করে দিয়ে তাদের সকল ভেদাভেদ ভুলে একই কাতারে এসে দাঁড়াতে আহ্বান করেন। নজরুল বলেন-

---

[৭৪] মোঃ সাইফুল ইসলাম, *নজরুলের নাটক: বিষয় ও আঙ্গিক* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০৮), পৃ. ৭৪।

[৭৫]গোলাম মুরশিদ, বিদ্রোহী রণক্লান্তঃ, পৃ. ১২১।

[৭৬] অশ্রুকুমার শিকদার, সুবর্ণ জয়ন্তী বার্ষিক সংখ্যা, 'আনন্দ বাজার' ১৩৭৯, পৃ. ৫৬।

মোরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু-মুসলমান।
মুসলিম তার নয়ন-মণি, হিন্দু তাহার প্রাণ॥[৭৭]

ধর্মকে যারা সমাজ থেকে স্বতন্ত্র এক অতিপ্রাকৃত ব্যাপার হিসেবে মনে করেন, 'ঘুমের ঘোরে'র পরির উপলব্ধির মধ্য দিয়ে নজরুল সেই ভ্রান্ত ধারণাকে দূর করার জন্য বলেন ধর্ম সমাজ থেকে আলাদা কিছু নয় বরং সমাজে বসবাসকারী মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্যেই ধর্মের আবির্ভাব। ধর্মের অন্তর্নিহিত সত্যের পরিবর্তে এর বাহিরের খোলসটাকে আঁকড়ে ধরা এবং এটিকেই সত্য মনে করা গোঁড়ামি। এই গোঁড়ামি ও ধর্মান্ধতা ধর্মের বিধান না হলেও বিশ্বের প্রায় প্রতিটি ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে এর প্রভাব লক্ষ করা যায়। ফলে মানবজাতির ইতিহাসে এমন কোনো অপরাধ নাই যা ধর্মের নামে সংঘটিত হয়নি।[৭৮] ধর্মান্ধ ও ধর্মমাতালদের আস্ফালন যুগ যুগ ধরে বিদ্যমান। একবিংশ শতাব্দীতে এসেও ধর্মের নামে বোমাবাজী, মানুষ হত্যা, জঙ্গিপনা ইত্যাদি এখন বৈশ্বিক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অতি সাম্প্রতিককালের নিউজিল্যান্ডের স্কাইচার্চের মসজিদে হামলা, শ্রীলংকায় গীর্জায় বোমাহামলা, মিয়ানমারে রাখাইনদের উচ্ছেদ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইলের আগ্রাসী নীতি, ভারতে গো রক্ষার নামে গো-মাংস ভক্ষণকারীদের উপরে হামলা, বাংলাদেশে মন্দির-প্যাগোডায় হামলা প্রভৃতি আজ অন্যতম জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যা। সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর নজরুল মনে করেন যারা ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করে তারা ধর্মের প্রকৃত সত্য বুঝতে পারেনি। তিনি বলেন-"তাহারা ধর্ম-মাতাল। ইহারা সত্যের আলো পান করে নাই, শাস্ত্রের এলকোহল পান করিয়াছে"[৭৯]। বার্ট্রান্ড রাসেলের নৈতিক চিন্তাতেও ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কুসংস্কারকে বিজ্ঞানসম্মত ও যুক্তিনিষ্ঠ চিন্তার পরিপন্থী হিসেবে দেখানো হয়েছে।[৮০]

মুসলিম সমাজের অনগ্রসরতার পেছনে মোল্লাগিরি এবং ধর্মীয় অপব্যাখ্যাজাত গোঁড়ামি ও ধর্মান্ধতাকে নজরুল দায়ী করেছেন। তাঁর মতে বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে যে পরিমাণ ধর্মান্ধতা ও কুসংস্কার ভর করে আছে তা বিশ্বের আর কোথাও নাই। 'ঝিলিমিলি' নাটকে মির্জা সাহেবের 'মুখে এক আর অন্তরে আরেক' চরিত্রায়নের মাধ্যমে ধর্মান্ধদের দ্বৈততা দেখিয়েছেন। সংস্কারবশত এই ধর্মান্ধ ও গোঁড়ার দল চিরকাল প্রজ্জ্বলিত জ্ঞানালোকটুকু ফতোয়ার মাধ্যমে নিভানোর কাজে ব্যস্ত।[৮১]

---

[৭৭] "সুর-সাকী," নর ৪র্থ, পৃ. ২৭৩।

[৭৮] Hans Kung, *Christianity and the Wold Religions*, Trans. Peter Heinegg (London: Collins Publishers, 1986), p. 442.

[৭৯] "মন্দির ও মসজিদ," 'রুদ্র-মঙ্গল,' নর ২য়, পৃ. ৪৩২।

[৮০] এম. আব্দুল হামিদ, "বার্ট্রান্ড রাসেলের নৈতিক চিন্তা" অন্তর্গত, *দার্শনিক প্রবন্ধ সংকলন* (ঢাকা: অনন্যা, ২০১১), পৃ. ৯২।

[৮১] মোঃ সাইফুল ইসলাম, *নজরুলের নাটক:*,পৃ. ৫১।

তাই তিনি মনে করেন যতদিন না এদের নির্মূল করা যাবে ততোদিন ইসলামের পুনর্জাগরণ সম্ভব হবে না। নজরুল বলেন-

বিশ্ব যখন এগিয়ে চলেছে আমরা তখনো বসে
বিবি-তালাকের ফতোয়া খুঁজেছি ফেকা ও হাদিস চষে![৮২]

মোল্লাদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন-

> মওলানা মৌলবি সাহেবকে সওয়া যায়, মোল্লাকেও চক্ষু-কর্ণ বুঁজিয়া সহিতে পারি, কিন্তু কাঠমোল্লার অত্যাচার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। ইসলামের কল্যাণের নামে ইহারা যে কওমের, জাতির ধর্মের কী অনিষ্ট করিতেছেন, তাহা বুঝিবার মতো জ্ঞান নাই বলিয়াই ইহাদের ক্ষমা করা যায়।[৮৩]

নজরুল মনে করেন বাংলার মুসলমানরা আল্লাহর বাণী অন্তরে ধারণ করলে সকল ধরনের ভেদাভেদজ্ঞান দূর হতো; শান্তিবস্থা বিরাজ করতো; ভোগজ্ঞান দূর হতো। কিন্তু তা সম্ভব হচ্ছে না ভোগের পাঁকে কর্দমবিলাসী মহিষের মতো পড়ে থাকার কারণে। তিনি মনে করেন যক্ষা হলে রোগী আপনজন হলেও যেমন বাড়ির বাহিরে পাঠাতে হয়, তেমনি ইসলামের কল্যাণের জন্য প্রয়োজনে এই ধর্মান্ধদের সমাজের বাহিরে পাঠাতে হবে। বাহ্যিক প্রকাশ দিয়ে মুসলমান পরিচয় না দিয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানে অগ্রসর হতে বলেন। অন্যথায় মুসলিম ও ইসলাম দুটোই করতলগত হতে বাধ্য। নজরুল বলেন-

> চোগা-চাপকান, দাড়ি-টুপি দিয়া মুসলমান মাপিবার দিন চলিয়া গিয়াছে। পৃথিবীর আর সব দেশের মুসলমানদের কাছে আজ আমরা অন্তত পাঁচ শতাব্দী পিছনে পড়িয়া রহিয়াছি। ...যাহারা আগে চলিয়া গিয়াছে তাহাদের সঙ্গ লইবার জন্য যদি আমাদের একটু অতিমাত্রায় দৌড়াইতে হয় এবং তাহার জন্য পায়জামা হাঁটুর কাছে তুলিতে হয়, তাই না হয় তুলিলাম। ঐ টুকুতেই কি ঈমান বরবাদ হইয়া গেল? ইসলামই যদি গেল, মুসলিম যদি গেল, তবে ঈমান থাকিবে কাহাকে আশ্রয় করিয়া?[৮৪]

হিন্দু ধর্মে নরকে নারায়ণ বলে অভিহিত করা হয়েছে। আবার সেই ধর্মেই মানুষকে পশুর চেয়েও ঘৃণ্য মনে করার মতো জঘন্য বিধি 'ছুৎমার্গ'। নজরুল মনে করেন মানবের এই অপমান ধর্মের নামে ধর্মান্ধদের সৃষ্টি। তিনি বলেন-"মানুষকে এত ঘৃণা করিতে শিখায় যে ধর্ম, তাহা আর যাহাই হউক ধর্ম নয়, ইহা আমরা চ্যালেঞ্জ করিয়া বলতে পারি।... যত ছোঁয়াছুঁয়ির নীচ ব্যবহার ভণ্ড বকধার্মিক আর বিড়াল-তপস্বী দলের মধ্যেই।"[৮৫]'বাঁধনহারা' উপন্যাসেও নজরুল হিন্দু-

---

৮২ "খালেদ," 'জিঞ্জির,' নর ৩য়, পৃ. ১২৪।
৮৩ "তরুণের সাধনা," 'অভিভাষণ,' নর ৮ম, পৃ. ১০।
৮৪ "গোঁড়ামি ও কুসংস্কার," 'অভিভাষণ,' নর ৮ম, পৃ. ১১।
৮৫ "ছুঁৎমার্গ," 'যুগবাণী,' নর ১ম, পৃ. ৩৯২।

মুসলমান মিলনের প্রধান অন্তরায় হিসেবে ছোঁয়াছুঁয়ির উপসর্গটাকে দায়ী করেছেন। 'জাতের বজ্জাতি' কবিতাতে 'জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা বিরোধী আন্দোলনের'[৮৬] আবেগ লক্ষ করা যায়। অন্তসারশূন্য জাতিভেদ প্রথা এ দেশের মানুষের মনুষ্যত্বকে টুঁটি টিপে মেরেছে। নজরুল মনে করেন এই বিশ্রী প্রথাকে নির্মূল করতে পারলে ভারত সফলতার পুষ্পে পুষ্পিত হবে। নজরুল জাত-বেজাতের ও ছোয়াছুঁয়ির এই জঘন্য ব্যাপারটিকে মানব মন থেকে দূর করার আহ্বান করে বলেন–

> হিন্দু মুসলমানকে ছুঁইলে তাঁহাকে স্নান করিতে হইবে, মুসলমান তাঁহার খাবার ছুঁইয়া দিলে তাহা তখনই অপবিত্র হইয়া যাইবে, তাঁহার ঘরের যেখানে মুসলমান গিয়া পা দিবে সেস্থান গোবর দিয়া (!) পবিত্র করিতে হইবে, তিনি যে আসনে বসিয়া হুঁকা খাইতেছেন মুসলমান সে আসন ছুঁইলে তখনই হুঁকার জলটা ফেলিয়া দিতে হইবে, –মনুষ্যত্বের কি বিপুল অবমাননা! হিংসা, দ্বেষ, জাতিগত রেষারেষির কি সাংঘাতিক বীজ বপন করিতেছ তোমরা! অথচ মঞ্চে দাঁড়াইয়া বলিতেছ, 'ভাই মুসলমান এস, ভাই ভাই এক ঠাঁই, ভেদ নাই ভেদ নাই!' কি ভীষণ প্রতারণা! মিথ্যার কি বিশ্রী মোহজাল! এই দিয়া তুমি একটা অখণ্ড জাতি গড়িয়া তুলিবে?শুনিয়া শুধু হাসি পায়।[৮৭]

'আমার মানুষ-ধর্ম' নজরুলের নিকট সবচেয়ে বড় ধর্ম। ব্রাহ্মণ, শূদ্র, হিন্দু, মুসলমান সকলের উপরে তিনি মানুষকে স্থান দেন। নজরুলের ক্ষেত্রে এটি শুধু আবেগের কথা নয়, একান্ত বিশ্বাসের কথা।[৮৮] তিনি মনে করেন মানবধর্ম সকল ধর্মের মূল কথা হলেও নামাজ-পূজার অজুহাতে ধর্মান্ধরা যখন মোল্লা ও পুরোহিতের ছদ্মবেশে সেই ক্ষুধার্ত মানবকে খাবার না দিয়ে দ্বার বন্ধ করে দেয় তখন মানবতা ভূলুণ্ঠিত হয়। অথচ মানব হৃদয়ই সমস্ত কিছুর কেন্দ্রস্থল, মানব হৃদয়ই দেবতার আবাসভূমি।[৮৯] সেই মানুষের অপমান স্রষ্টার অপমান তুল্য। ইসলাম ধর্মের পাশাপাশি শিখ ধর্মেও বলা হয়েছে যে প্রত্যেকের হৃদয়েই স্রষ্টা লুকিয়ে আছেন এবং তাঁর আলো দ্বারাই সবার হৃদয় আলোকিত হয়।[৯০] নজরুল মনে করেন, কোরান-পুরান-বেদ-বেদান্ত-বাইবেল-ত্রিপিটক-জেন্দাবেস্তা এবং গ্রন্থসাহেব রক্ষার জন্য যে ধর্মানুসারীরা মানুষকে হত্যা করতে পারে, তাদের অধিকার হরণ করতে পারে, তারা আর যাই হোক ধর্মের প্রকৃত অনুসারী নয়। মানুষের এই হৃদয়ের মধ্যেই একাকার হয়ে রয়েছে সকল যুগের কেতাব, জ্ঞান, ধর্ম, যুগাবতার। এই হৃদয়ই কাশি, মথুরা, বৃন্দাবন, বুদ্ধ-গয়া, জেরুজালেম, মদিনা, কাবা-ভবন, মসজিদ, মন্দির, গীর্জা। নবী, ওলি,

[৮৬] যোগেশচন্দ্র বাগল, *মুক্তির সন্ধানে ভারত*, ১ম সং (কলকাতাঃ এস. কে মিত্র এণ্ড ব্রাদার্স, ১৯৪০), পৃ. ৩৬৫।

[৮৭] "ছুঁৎমার্গ," 'যুগবাণী,' নর ১ম, পৃ. ৩৯৩-৪।

[৮৮] কামরুল আহসান, নজরুল কাব্যে সাময়িকতা, পৃ. ১৬৯।

[৮৯] পারভীন আক্তার জেমী, *নজরুল সাহিত্যে বিপ্লবী চেতনা* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১০), পৃ. ১২৩।

[৯০] M.A. Macauliffe, *The Sikh Religion*, Vol. I (Oxford: Clarendon Press, 1909), 330.

পয়গম্বর, যোগী কেহই অন্য ধর্মের লোককে গালি না দিলেও ধর্মান্ধরা তা নির্দ্বিধায় করে। ধর্মান্ধ ও ধর্মব্যবসায়ীরা স্বার্থের জন্য অজ্ঞান জনগণকে 'মার শালা যবন, মার শালা কাফের' বলে ক্ষেপিয়ে তোলে; হিংসার মদ্যপান করিয়ে মাতাল করে তোলে। নজরুল এদের ভয়াবহতার চিত্র অঙ্কন করে তাদেরকে প্রতিহত করতে বলেন। তিনি বলেন-

কোনো 'ওলি' কোনো দরবেশ যোগী কোনো পয়গাম্বর,
অন্য ধর্মে, দেয়নি কো গালি,–কে রাখে তার খবর ?
যাহারা গুণ্ডা, ভণ্ড, তারাই ধর্মের আবরণে
স্বার্থের লোভে ক্ষ্যাপাইয়া তোলে অজ্ঞান জনগণে
... ...
ধর্মজাতির নাম লয়ে এরা বিষাক্ত করে দেশ,
এরা বিষাক্ত সাপ, ইহাদের মেরে কর সব শেষ।
নাই পরমত-সহিষ্ণুতা সে কভু নহে ধার্মিক,
এরা রাক্ষস-গোষ্ঠী ভীষণ অসুর-দৈত্যাধিক।[৯১]

ভারতে হিন্দু-মুসলমান যখন তাঁদের স্বার্থের দ্বন্দ্বে লিপ্ত তখন নজরুল ধর্মের উদারতার দিকটি তুলে ধরেন। আমার ধর্ম যেন অন্য ধর্মকে আঘাত না করে, অন্যের মর্মবেদনার সৃষ্টি না করে এই দিকটি তিনি নিশ্চিত করতে বলেন। কেননা উদারতাবিহীন ধর্ম কোনো ধর্ম নয়। এজন্য বলা হয় - "বিশ্বাসবিহীন ধর্ম আকারসর্বস্ব এবং উদারতাবিহীন ধর্ম গোঁড়ামিরই নামান্তর"[৯২]। নবী, পয়গম্বরগণ কোনো নির্দিষ্ট জাতির জন্য আবির্ভূত না হলেও ধর্মমাতালরা নবী রসুলদের নিজস্ব সম্পদে পরিণত করেছে। নজরুল বলেন-

অবতার–পয়গম্বর কেউ বলেননি, আমি হিন্দুর জন্য এসেছি, আমি মুসলমানের জন্য এসেছি, আমি ক্রিশ্চানের জন্য এসেছি। তাঁরা বলেছেন, আমরা মানুষের জন্য এসেছি– আলোর মত, সকলের জন্য। কিন্তু কৃষ্ণের ভক্তেরা বললে, কৃষ্ণ হিন্দুর, মুহম্মদের ভক্তেরা বললে, মুহম্মদ মুসলমানদের, খ্রিস্টের শিষ্যেরা বললে, খ্রিস্ট ক্রিশ্চানদের। কৃষ্ণ-মুহম্মদ-খ্রিস্ট হয়ে উঠলেন জাতীয় সম্পত্তি। আর এই সম্পত্তিত্ব নিয়েই যত বিপত্তি।[৯৩]

'মন্দির ও মসজিদ' প্রবন্ধে নজরুল দেখান, যে মানুষের পায়ে দলা মাটি দিয়ে মসজিদ-মন্দির নির্মাণ করা হয় সেই উপাসনালয়ের ইট রক্ষার নামে যখন মানুষ হত্যা করা হয় তখন আল্লাহ বা ভগবান ব্যথিত হন। তাঁর মতে আল্লাহ আর ভগবানে কোনো পার্থক্য নেই। মসজিদও যার,

---

[৯১] "গোঁড়ামি ধর্ম নয়," 'শেষ সওগাত,' নর ৬ষ্ঠ, পৃ. ১০৯।

[92] Philip H. Hwang, "An Inter-religious Dialogue: Its Reasons, Attitudes and Necessary Assumptions" in Henry O. Thompson ed..*The Global Congress of the World Religions* (New York: The Rose of Sheraton Press, 1982), p. 80.

[৯৩] "হিন্দু-মুসলমান," 'রুদ্র-মঙ্গল,' নর ২য়, পৃ. ৪৩৭।

মন্দিরও তাঁর। সুতরাং যে ভজনালয় মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারে না তার কোনো দরকার নেই। নজরুল বলেন-

> আমি ভাবি, যখন রোগ-শীর্ণ জরা-জীর্ণ অনাহার-ক্লিষ্ট বিবস্ত্র বুভুক্ষু সর্বহারা ভুখারিদের দশ লক্ষ করিয়া লাশ দিনের পর দিন ধরিয়া ঐ মন্দির-মসজিদের পাশ দিয়া চলিয়া যায়, তখন ধসিয়া পড়ে না কেন মানুষের ঐ নিরর্থক ভজনালয়গুলো? কেন সে ভূমিকম্প আসে না পৃথিবীতে? কেন আসে না সেই রুদ্র–যিনি মানুষ-সমাজের শিয়াল-কুকুরের আড্ডা ঐ ভজনালয়গুলো ফেলবেন গুঁড়িয়ে? দেবেন মানুষের ট্রেডমার্কার চিহ্ন ঐ টিকি-টুপিগুলো উড়িয়ে?[৯৪]

নজরুল স্রষ্টাকে পক্ষপাতহীন সত্তা হিসেবে দেখেছেন। স্রষ্টা নির্দিষ্ট কোনো ধর্মের নন; তিনি আশরাফ-আতরাফ, ব্রাহ্মণ-শূদ্র, রাজা-প্রজা, ধনী-গরিব সকলের। তিনি যদি নির্দিষ্ট কোনো ধর্মের স্রষ্টা হতেন তাহলে অন্য ধর্মের লোক একদিনও বাঁচতো না। যখন মড়ক আসে তখন হিন্দু-মুসলিম-খ্রিস্টান-বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্মগোষ্ঠীর মাঠে-ছাদে সমানভাবে বর্ষিত হয়; আবার যখন তাঁর আশির্বাদ হয়ে বৃষ্টি বর্ষিত হয় তখন সকলের মাঠে-ফসলে সমানভাবে বর্ষিত হয়। স্রষ্টা মানুষের মধ্যে পক্ষপাতিত্ব না করলেও ধর্মান্ধরা আল্লাহর ও মা কালীর ‘প্রেষ্টিজ’ রক্ষার জন্য অহেতুক দাঙ্গা-মারামারিতে লিপ্ত হয়। নজরুল হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গাকে ‘আল্লা আর ভগবানের মারামারি’ বলে বিদ্রুপ করেন। ধর্মান্ধরা খোদার উপর খোদকারি করে স্ব স্ব দেবতাকে উপাসনালয়ে তালা মেরে জেল কয়েদির মতো বন্দী করে পাহারা দেয়। তিনি বলেন-“যিনি সকল মানুষের দেবতা, তিনি আজ মন্দিরের কারাগারে, মসজিদের জিন্দান-খানায়, গির্জার gaol-এ বন্দী। মোল্লা-পুরুত, পাদরি-ভিক্ষু জেল-ওয়ার্ডের মতো তাহাকে পাহারা দিতেছে। আজ শয়তান বসিয়াছে স্রষ্টার সিংহাসনে।”[৯৫] নজরুল মনে করেন ধর্মান্ধরা ধর্মকে টিকি-দাড়ির মাধ্যমে পার্থক্য করে ধর্ম ও স্রষ্টাকে তাদের ব্যক্তিগত সম্পদে পরিণত করে ফেলেছে। ফলে এই টিকি-দাড়ির জন্যই যত মারামারি সংঘটিত হয়। সকল ধর্মের উদ্দেশ্য অভিন্ন; স্রষ্টাকে সন্তুষ্ট করা, তাঁর সাথে প্রেম করা। কিন্তু ধর্মান্ধরা তাদের নিজেদের প্রয়োজনে এক ধর্মকে বিভিন্ন ধর্মে রূপান্তরিত করে ধর্মব্যবসা শুরু করেছে। নজরুল বলেন—

> হিন্দুত্ব–মুসলমানত্ব দুই-ই সওয়া যায়, কিন্তু তাদের টিকিত্ব দাড়িত্ব অসহ্য, কেননা ঐ দুটোই মারামারি বাধায়। টিকিত্ব হিন্দুত্ব নয়, ওটা হয়ত পণ্ডিত্ব। তেমনি দাড়িও ইসলামত্ব নয়, ওটা মোল্লাত্ব। এই দুই ‘ত্ব’ মার্কা চুলের গোছা নিয়েই আজ এত চুলোচুলি ! আজ যে মারামারিটা বেঁধেছে, সেটাও এই পণ্ডিত–মোল্লায় মারামারি, হিন্দু–মুসলমানে মারামারি নয়। এত মারামারির মধ্যে এইটুকুই ভরসার কথা যে, আল্লা ওর্ফে নারায়ণ হিন্দুও নন মুসলমানও নন।

---

[৯৪] “মন্দির ও মসজিদ,” ‘রুদ্র-মঙ্গল,’ নর ২য়, পৃ. ৪৩৫।

[৯৫] তদেব, পৃ. ৪৩২।

তাঁর টিকিও নেই, দাড়িও নেই। একেবারে 'ক্লিন'। টিকি– দাড়ির ওপর আমার এত আক্রোশ এই জন্য যে, এরা সর্বদা স্মরণ করে দেয় মানুষকে যে, তুই আলাদা আমি আলাদা। মানুষকে তার চিরন্তন রক্তের সম্পর্ক ভুলিয়ে দেয় এই বাইরের চিহ্নগুলো।[৯৬]

এরপরও যারা ধর্মের নামে গোঁড়ামি করে, জাতিতে জাতিতে ভেদ সৃষ্টি করে "লক্ষ্যভ্রষ্ট" প্রবন্ধে নজরুল তাদেরকে 'শয়তানের চেলা' বলে সম্বোধন করেন। নজরুলের ভাষ্য- "আজ পৃথিবীতে ধর্ম-প্রচারকের নামে পাদ্রি পুরোহিত মৌলানার রূপ ধারণ করিয়া শয়তান বাহির হইয়াছে। ইহারা ধর্মে ধর্মে কেবল সংঘাত আনিবার চেষ্টা করিতেছে। ...ইহারা শয়তানের গুপ্তচর, পশ্বাচারী, ভোগী, ঘোর স্বার্থপর একদল ধনিকের ঘুষ ও বেতন-ভোগী"[৯৭]। নজরুল দেখান যে, দেব-মন্দিরের সবচেয়ে কাছে যারা থাকে সেই পাণ্ডারাই দেবতার সবচেয়ে বড় ভক্ত নয়। যখন মানুষের অন্তরে পশুত্ব জেগে উঠে, অন্য মানুষের অধিকার হরণ করে তা নির্বিকারে চেপে যায়, নারীর সতিত্ব হরণ করে, অন্যের সম্পদ পয়মাল করে নজরুল তখন তাদের মুখমণ্ডলে শয়তানের প্রতিচ্ছায়া দেখতে পান। এই মানুষরূপী শয়তান একেক সময় একেক আকার ধারণ করে মানুষের ক্ষতি করে থাকে। নজরুল বলেন-

উহাদের দুই দলের নেতা একজন, তাহার আসল নাম শয়তান। সে নাম ভাঁড়াইয়া কখনো টুপি পরিয়া পর-দাড়ি লাগাইয়া মুসলমানদের খেপাইয়া আসিতেছে, কখনো পর-টিকি বাঁধিয়া হিন্দুদের লেলাইয়া দিতেছে, সে-ই আবার গোরা সিপাই গুর্খা সিপাই হইয়া হিন্দু-মুসলমানদের গুলি মারিতেছে![৯৮]

নজরুল ধর্মান্ধদের ধর্মাভিনয়কে ধরিয়ে দিয়েছেন। একদিকে মুসলমান সমাজের ধর্মাচার, গোঁড়ামি ও ধর্মান্ধতার কথা যেমন তিনি উচ্চারণ করেছেন এবং তার সমূল উচ্ছেদ কামনা করেছেন, তেমনি হিন্দু সমাজের আচার-ব্যবহারের সংকীর্ণতা, ধর্ম-বর্ণ-জাতিভেদ ও সামাজিক অনাচার-কুসংস্কারের প্রতিও তীব্র কশাঘাত হেনেছেন।[৯৯] মোহার্‌রম মাসে মুসলমানদের একাংশ ইমাম হোসেনের শোকে মাতম করতে গিয়ে শরীরকে ক্ষত-বিক্ষত করলেও যখন সত্যিকারে ইসলামের জন্য রক্ত প্রয়োজন তখন তাদের খুঁজে পাওয়া যায় না; তাদের ত্যাগের মহিমা তখন আর প্রাণে সাড়া জাগায় না। তেমনি হিন্দুরা আগুন, ঢাক-ঢোল নিয়ে দেয়ালি উৎসব করে থাকে কিন্তু দেশমাতার মুক্তির সংগ্রামে তাদের সেই উদ্দীপনা দেখা যায় না। নজরুল বাঙালি ধর্মসমাজের এই দ্বিমুখিতার দিকটি ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর মতে, ধর্মের জন্য ধর্মপালন নয়, ভালবেসে স্রষ্টার

---

[৯৬] "হিন্দু-মুসলমান," 'রুদ্র-মঙ্গল,' নর ২য়, পৃ. ৪৩৭।
[৯৭] "লক্ষ্যভ্রষ্ট," নর ৯ম, পৃ. ৩০১।
[৯৮] "মন্দির ও মসজিদ," 'রুদ্র-মঙ্গল,' নর ২য়, পৃ. ৪৩২।
[৯৯] কামরুল আহসান, নজরুল কাব্যে সাময়িকতা, পৃ. ১৬৯।

পূজা নয় বরং যেখানে স্বার্থ নিহিত সেখানে স্রষ্টা পূজা; আর যেখানে স্বার্থ নেই সেখানে স্রষ্টাপূজা অনুপস্থিত। তাই 'লক্ষ্মী'র হাতে লক্ষ্মীভাণ্ড থাকায় তাঁর পূজায় ডামাডোল দৃশ্যমান হলেও অন্য ক্ষেত্রে অদৃশ্যমান। স্রষ্টা পূজা এখন স্বার্থপূজায় বন্দী। নজরুল ধর্ম-ব্যবসায়ীদের মুখোশ উন্মোচন করে বলেন-

আমার হরিনামে রুচি
কারণ পরিণামে লুচি
আমি ভোজনের লাগি করি ভজন ॥[১০০]

অন্যত্র তিনি বলেন-

মুসলমানের মোহররমের লাঠি খেলার মতোই এ দেয়ালি উৎসবেরও আগুন আর বোমাও আজ শুধু অভিনয় মাত্র। আজ যারা আগুন নিয়ে খেলার অভিনয় করছে, কাল তারা সত্য আগুন দেখে আর্তনাদ করে উঠবে, আজ যারা বোমার নিষ্ফল শব্দ করে আস্ফালন করছে, কাল সত্যকার বোমার বিদারণ দেখে মূর্ছিত হয়ে পড়বে। আজ দেশের বাইরে ভিতরে চলেছে এই অভিনয়–শুধু অভিনয়, শুধু কৃত্রিমতা, শুধু মিথ্যা।[১০১]

অভিনয়, ছলনা, প্রতারণা, ভীরুতা প্রভৃতিকে দাড়ি-টুপির মাধ্যমে আড়াল করার প্রবণতা তৎকালীন মুসলিম সমাজে দৃশ্যমান ছিলো। তারা ধর্মকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করতো। নিজেকে ঈমানদার হিসেবে উপস্থিত করলেও এদের অন্তরে ছিলো বিষধর ফণি। এই সকল ভণ্ডদের মুখোস উন্মোচন করে নজরুল বলেন—

ঈমান! ঈমান! বলো রাতদিন, ঈমান কি এত সোজা ?
ঈমানদার হইয়া কি কেহ বহে শয়তানি বোঝা ?
শোনো মিথ্যুক! এই দুনিয়ায় পূর্ণ যার ঈমান,
শক্তিধর সে টলাইতে পারে ইঙ্গিতে আসমান!
আল্লার নাম লইয়াছ শুধু, বোঝোনিকো আল্লারে।
নিজে যে অন্ধ সে কি অন্যেরে আলোকে লইতে পারে ?[১০২]

ধর্মের অন্যতম একটি দিক হলো রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে টিকিয়ে রাখা। তাই নজরুল সকল ধরনের ধর্ম-কলহ দূর করে নিজেদের স্বাধীনতাকে অর্জন করতে বলেন। তাঁর মতে স্রষ্টার পূজা-অর্চনা করার অনেক সময় পাওয়া যাবে। কেননা আল্লাহ ও হরি অবিনশ্বর; তারা অনাদি অনন্তকাল থেকে আছেন, থাকবেন। কিন্তু সময় গেলে আর স্বাধীনতা অর্জিত হবে না। কিন্তু বাংলার মোল্লা-পুরোহিতগণ দীর্ঘদিন যাবৎ ব্রিটিশদের অধীনে পশুর মতো জীবন-যাপন করলেও

---

[১০০] 'সুর-সাকী', নর ৪র্থ, পৃ. ২৮৫।
[১০১] "দেয়ালি-উৎসব," নর ১১তম, পৃ. ২৮৭।
[১০২] "কৃষকের ঈদ," 'নতুন চাঁদ,' নর ৬ষ্ঠ, পৃ. ৩৮।

দেশমাতাকে মুক্ত করার জন্য দৃশত কোনো প্রচেষ্টা চালায় নি। বরং ধর্মের আবরণে নিজেদের দুর্বলতাকে ঢাকতে চেয়েছে। নজরুল এই সকল মোল্লা-পুরোহিতদের বিরুদ্ধে হানলেন প্রচণ্ড আঘাত। যুবকদেরকে সংস্কারের পাষাণ স্তুপ আঁকড়ে ধরে থাকা পুরাতন, জরা এবং বার্ধক্যের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে বলেন। কেননা সমাজের কুসংস্কার দূরীকরণে তাদের ভূমিকা তেজপ্রদীপ্ত সূর্যের ন্যায়।[১০৩] আত্মমর্যাদা বিকিয়ে দিয়ে, গোলামি জীবনযাপন করে যারা স্রষ্টার বন্দনা করে, ধর্মের কথা বলে নজরুল তাদের প্রখরভাবে সমালোচনা করেন। তিনি বলেন-

> 'লানত' গলায় গোলাম ওরা সালাম করে জুলুমবাজে,
> ধর্ম-ধ্বজা উড়ায় দাড়ি, 'গলিজ' মুখে কোরান ভাঁজে।
> তাজ-হারা যার নাঙ্গা শিরে গরমাগরম পড়ছে জুতি,
> ধর্ম-কথা বলছে তারাই, পড়ছে তারাই কেতাব-পুঁথি।
> উৎপীড়কে প্রণাম করে শেষে ভগবানে নমি,
> হিজ্‌ড়ে ভীরুর ধর্ম-কথার ভণ্ডামিতে আসছে বমি।[১০৪]

নারী শিক্ষার ব্যাপারে তৎকালীন মুসলমানদের ভাবনার সমালোচনা দেখা যায় নজরুলের সাহিত্যে। তৎকালীন শতাব্দীর পর শতাব্দী জুড়ে শিক্ষার অভাব নারীকে পরাধীন, শৃঙ্খলিত ও বৈষম্যপীড়িত করে রেখেছিলো।[১০৫] নারী শিক্ষার ফলে তাদের ক্ষমতায়ন হোক, আপন মৃত্তিকার উপর দাঁড়াক, পুরুষের চোখে নয় নিজের চোখে বিশ্ব দেখুক, সামাজিক গুরুত্ব বৃদ্ধি পাক তা পুরুষতান্ত্রিক ও গোঁড়া ধার্মিকদের নিকট ছিলো উপেক্ষিত। নারীদেরকে শিক্ষার সুযোগ প্রদানের আহ্বান করে নজরুল বলেন-

> কন্যাকে পুত্রের মতোই শিক্ষা দেওয়া যে আমাদের ধর্মের আদেশ, তাহা মনেও করিতে পারি না। আমাদের কন্যা-জায়া-জননীদের শুধু অবরোধের অন্ধকারে রাখিয়াই ক্ষান্ত হই নাই, অশিক্ষার গভীরতর কূপে ফেলিয়া হতভাগিনীদের চিরবন্দিনী করিয়া রাখিয়াছি।... আমরা মুসলমান বলিয়া ফখর করি, অথচ জানি না–সর্বপ্রথম মুসলমান নর নহে–নারী।[১০৬]

সঙ্গীত বিষয়ে বাঙ্গালি মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনা নজরুলের মধ্যে লক্ষ করা যায়। তিনি মনে করেন সুর আল্লাহর রহমত। তিনি যাকে পছন্দ করেন তাকেই তা দান করেন। অশ্লীল সঙ্গীতের বিরুদ্ধে ইসলামের বিধি-নিষেধ থাকলেও বাংলার গোঁড়া মুসলমানদের একটা অংশ,

---

[১০৩] মোঃ ওমর কাজী, *নজরুল ও হুইটম্যান*, সম্পা.,ইসরাইল খান (ঢাকা: কাশবন প্রকাশন, ২০০৮), পৃ. ৪৮।

[১০৪] "অগ্রন্থিত কবিতা," নর ৯ম, পৃ, ২১।

[১০৫] শিপ্রা সরকার "শিক্ষা ও উন্নয়ন: পারস্পরিক সম্পর্ক",*দর্শন ও প্রগতি*, বর্ষ ৩৩, ১ম ও ২য় সংখ্যা, ২০১৬, পৃ. ১৩৪।

[১০৬] "অবরোধ ও স্ত্রী-শিক্ষা," 'অভিভাষণ,' নর ৮ম, পৃ. ১২।

নজরুল যাদেরকে কাঠমোল্লা বলে সম্বোধন করেন তারা পুরো সঙ্গীতকেই হারাম বলে ফতোয়া দেয়। ফলে একসময় পুরো ভারতে মুসলমান শিল্পীদের প্রাধান্য থাকলেও তা আস্তে আস্তে কমে যেতে থাকে। নজরুল মুসলমানদের এই অনুর্বর চিন্তার সমালোচনা করে বলেন-

> আজ বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে একজনও চিত্রশিল্পী নাই, ভাস্কর নাই, সঙ্গীতজ্ঞ নাই, বৈজ্ঞানিক নাই, ইহা অপেক্ষা লজ্জার আর কি আছে ? এইসবে যাহারা জন্মগত প্রেরণা লইয়া আসিয়াছিল, আমাদের গোঁড়া সমাজ তাহাদের টুটি টিপিয়া মারিয়া ফেলিয়াছে ও ফেলিতেছে। ... পশুর মতো সংখ্যাগরিষ্ঠ হইয়া বাঁচিয়া আমাদের লাভ কী, যদি আমাদের গৌরব করিবার কিছু না থাকে।[১০৭]

ধর্মান্ধমুক্ত সমাজ বিনির্মাণের জন্য যারাই চেষ্টা করেছেন তারাই ধর্মান্ধদের আক্রমনের লক্ষ্য হয়েছেন। ব্রাহ্ম ধর্মের অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গোঁড়া হিন্দুদের শুধু নয়, ব্রাহ্মনেতাদের সঙ্গেও মতপার্থক্য সব সময় লেগে ছিলো। নজরুলের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। নজরুলের এই ধর্মচিন্তা ও তার প্রচার, ধর্মব্যবসায়ী ও ধর্মান্ধদের স্বার্থে আঘাত লাগে। তাঁকে হিন্দু-মুসলিম দু'পক্ষ থেকেই কাফের ও ধর্মবিদ্রোহী এবং অবজ্ঞাসূচক 'যবন' উপাধিতে ভূষিত করে। কিন্তু নজরুল কখনো আঘাতের পরিবর্তে প্রতিঘাত করেননি। তিনি ছিলেন 'অসূয়ার অতীত'[১০৮]। উল্টো যারা নজরুলকে ভুল বুঝেছে তাদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন-"কেউ বলেন, আমার বাণী যবন, কেউ বলেন, কাফের। আমি বলি ও দুটোর কিছুই নয়। আমি মাত্র হিন্দু-মুসলমানকে এক জায়গায় ধরে এনে হ্যান্ডশেক করাবার চেষ্টা করেছি, গালাগালিকে গলাগলিতে পরিণত করার চেষ্টা করেছি।"[১০৯]এখানে একটা বিষয় পরিষ্কার হওয়া দরকার যে, নজরুল হিন্দু ও ইসলাম এই দুই ধর্মের মিলন ঘটিয়ে নতুন কোনো ধর্মের আবিষ্কার করতে চাননি; চেয়েছেন এর অনুসারীদের মধ্যকার ধর্মান্ধতাকে দূর করতে। অবশ্য ধর্মান্ধ কর্তৃক 'কাফের' উপাধি প্রাপ্তিতে তিনি ব্যথিত ছিলেন না। কেননা কাফের বলতে তিনি বুঝতেন ভেদজ্ঞান, সংস্কার, অজ্ঞতা, বাধাবন্ধনকে। আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ এর মধ্যে যা কিছু বাধা তাকেই তিনি কাফের মনে করেন। আর সাহিত্যের মধ্যে হিন্দুয়ানি ছাপ থাকলেই তিনি হিন্দু হয়ে গেলেন বা কাফের হয়ে গেলেন তাও যুক্তিযুক্ত নয়। 'বিদ্রোহী' কবিতায় যে স্রষ্টার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা যায় তাকে রফিকুল ইসলাম ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে-"স্রষ্টার বিরুদ্ধে তাঁর বিদ্রোহ রোমান্টিক বিদ্রোহ এবং তা অবিশ্বাস নয় কারণ মানুষ, ঘটনা ও বস্তুকে তিনি ধর্ম দ্বারা গৌরবান্বিত করেছেন, ঐতিহ্যের সঙ্গে তাঁর যোগ অবিমিশ্র।[১১০]

---

[১০৭] "তরুণের সাধনা," 'অভিভাষণ,' নর ৮ম, পৃ. ১৪।

[১০৮] আবুল ফজল, *বিদ্রোহী কবি নজরুল* (চট্টগ্রাম: বইঘর, ১৯৭৫), পৃ. ২০।

[১০৯] "প্রতিভাষণ," 'অভিভাষণ,' নর ৮ম, পৃ. ৫।

[১১০] রফিকুল ইসলাম, কাজী নজরুল ইসলাম:, পৃ. ২৪৮।

নজরুলের আধ্যাত্মিকতা

আধ্যাত্মিকতা ধর্মের একটি অন্যতম অনুষঙ্গ। পরমপ্রভুর সাথে সান্নিধ্য লাভ করতে ধ্যানের কোনো বিকল্প নেই। সাধারণত *আধ্যাত্মিকতা* শব্দটির মধ্যে মন ও প্রাণ অপেক্ষা বৃহত্তর কোনো কিছুর স্বীকৃতি দেওয়া হয়ে থাকে। অন্তরাত্মার তথা মানবাত্মার চেয়ে ঊর্ধ্বগতির কোনো এক প্রবল আকর্ষণ ধারাকে আধ্যাত্মিকতা বলা হয়ে থাকে।[১১১] শুধু ইসলাম ধর্মে নয় বরং সব ধর্মেই আধ্যাত্মিকতার স্থান রয়েছে।[১১২] প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার মূল উৎস বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, রামায়ণ, পুরাণ ও মহাভারত প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ কার্যত আর্যগণ কর্তৃক রচিত এবং বলা যায় প্রথম দিকে এদের প্রভাবেই ভারতীয় উপমহাদেশে অধ্যাত্মবাদের সূচনা ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করে। সেদিক থেকে বলা যায় যে, খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতক থেকে ষষ্ঠ শতকের বৈদিক যুগে বেদ ও উপনিষদকে কেন্দ্র করে অধ্যাত্মবাদের সূচনা হয়। স্কলাস্টিক বা পণ্ডিতীয় যুগেও আধ্যাত্মিক প্রবণতা লক্ষ করা যায়।'[১১৩] বৌদ্ধ ধর্মের প্রবক্তা গৌতম বুদ্ধ ধ্যানের মাধ্যমেই নির্বাণ লাভের পন্থা আবিষ্কার করেন। ইসলামের নবী হযরত মোহাম্মদ (সা.) হীরা পর্বতের গুহায় মাঝেমধ্যে ধ্যানমগ্ন থাকতেন। এরই এক পর্যায়ে পরম প্রভুর বাণী ও নবুওয়াত লাভ করেন।

গবেষকদের অনেকে আধ্যাত্মিকতাকে ধর্ম ও দর্শনের মিলনজাত সংস্কৃতি হিসেবে দেখেন।[১১৪] এর অন্যরূপ হলো সুফিবাদ। সুফিবাদ আল্লাহর প্রেম ও ধ্যানের উপর নির্ভর করে গড়ে উঠা এক ধরনের চিন্তন ও অনুভূতি এবং জীবনবাদী দর্শন। গভীর ধ্যানমগ্ন অবস্থায় একজন সুফি সাধক আধ্যাত্মিক জ্যোতি লাভ করেন। এ জ্যোতির সাহায্যে তিনি সত্যের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অবলোকন করেন।[১১৫] খোদার সাথে প্রেম ও তাঁর মধ্যে নিজেকে বিলীন করে দেওয়াই এই মতবাদের মূল লক্ষ্য বা সুর। ইসলামের প্রারম্ভিক যুগেই সুফি ভাবধারার বীজ সূচিত হয়। ধারণা করা হয় যে, ইসলামের নবী (সা.) এর জীবদ্দশাতেই 'আহলে সুফ্ফা' এর মাধ্যমে ইসলামে আধ্যাত্মিকতা বা সুফিবাদের উদ্ভব হয়। অনেকে মনে করেন হাসান আল বসরীর মাধ্যমে ইসলামে সুফিবাদের প্রসার পূর্ণতা পায়। সুফিবাদ অনুসারে খোদাই একমাত্র পরম সত্তা; তিনিই সমস্ত জ্ঞান ও প্রেমের আধার। খোদার সাথে মানুষের সম্পর্ক প্রেমের সম্পর্ক। প্রেম-লাভই মানব জীবনের পরম সম্পদ ও একমাত্র লক্ষ্য।"[১১৬] সুফিবাদের পরিচয় দিতে গিয়ে এম. আবদুল হামিদ বলেন-

---

[১১১] সৌভিক রেজা, *ত্রিশোত্তর বাংলা কবিতায় অধ্যাত্মচেতনা*(ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০৭), পৃ. ১৬।

[১১২] আবুল ফজল, *সমাজ সাহিত্য রাষ্ট্র* (ঢাকা: গতিধারা, ২০১৩), পৃ. ৭৩।

[১১৩] মোঃ রফিকুল ইসলাম, "বাংলাদেশে দর্শনচর্চার গতিপ্রকৃতি ও সমকালীন চিন্তন বিশ্লেষণ", পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ (দর্শন বিভাগ: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০২), পৃ. ৩।

[১১৪] সৌভিক রেজা, *ত্রিশোত্তর বাংলা কবিতায় অধ্যাত্মচেতনা*, পৃ. ২১।

[১১৫] মোঃ আবদুল হামিদ, *দার্শনিক প্রবন্ধাবলি: তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৩), পৃ. ২১৬।

[১১৬] এম. আবদুল হামিদ, *দার্শনিক প্রবন্ধ সংকলন* (ঢাকা: অনন্যা, ২০১১), পৃ. ১৫।

সুফিবাদী সাধক বলতে ইসলাম ধর্মাবলম্বী মুসলমান মরমীদেরকেই বুঝায়। কিন্তু সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত মরমীদেরকে কোনো বিশেষ ধর্মাবলম্বীর গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ করা যায় না। সুফি-সাধকগণ সাধারণত আত্মশুদ্ধির ব্যাপারে মানুষের দৈহিক আবেদনের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করেন না, কিন্তু মরমী সাধকগণ মানুষের আত্মশুদ্ধির ব্যাপারে দৈহিক আবেদনের গুরুত্বকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করেন। হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান মরমী সাধকগণ আত্মনিগ্রহকে মুক্তির বা মোক্ষলাভের উপায় বলে মনে করেন, কিন্তু মুসলিম মরমী সাধকগণ জীবনের পার্থিব তাৎপর্য নস্যাৎ করে আত্মিক সাধনার মুক্তির অনুসন্ধান করেন না।[১১৭]

সুফিবাদের বিকাশের প্রথম পর্যায়ে সুফিসাধকগণ খোদার সাথে আত্মার মিলনের উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করলেও সর্বখোদাবাদী ছিলেন না। কিন্তু, শেষ স্তরে, সুফিবাদ সর্বখোদাবাদ আকার ধারণ করে। এজন্য দেখা যায় বায়েজীদ বোস্তামী এবং মনসুর আল-হাল্লাজ সুফিবাদকে সর্বখোদাবাদে রূপদান করেন।[১১৮] ফানা ও বাকার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সাথে একাকার হয়ে যাওয়াই সুফিবাদের মূল দর্শন।

খাজা ময়েনদ্দিন চিশ্‌তী, শেখ শফরগঞ্জ, নিজামুদ্দিন আউলিয়া, শাহ্ মখদুম, শাহ্ জালাল, খান জাহান আলী প্রমুখ সুফি সাধকগণ উপমহাদেশে সুফিবাদের প্রসার ঘটান। এদের সহজ সরল ও অনাড়ম্বর জীপন-যাপন দেখে এ অঞ্চলের মানুষ আকৃষ্ট হয়। অষ্টম শতাব্দীতে এ অঞ্চলে ইসলামের প্রচার ও প্রসার শুরু হলে সুফি মানবতাবাদের উদ্ভব ঘটে। সকল ধর্মেই মানুষকে সম্মান দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। মুসলমান সুফিদের মানবতাবাদের প্রতিক্রিয়ায় হিন্দু সমাজের আধ্যাত্মিক দীনতা দূর করতে ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্য দেব 'প্রেম দর্শন' বা 'বৈষ্ণববাদ' নামের আর একটি মানবতাবাদী দর্শন প্রতিষ্ঠা করেন। আর চৈতন্যেত্তর কালে সুফিবাদ ও বৈষ্ণববাদের প্রভাবে বাংলার মাটিতে লালন শাহ এর নেতৃত্বে বাউলতত্ত্ব নামে আর একটি মানবতাবাদী মতবাদ চালু হয়।[১১৯] মুসলিম মরমীয় দর্শন, বৈষ্ণব দর্শন, তান্ত্রিক মতবাদ, ও দেশজ ধারণা সমন্বিত হয়েছে বাউল দর্শনে।[১২০]

কাজী নজরুল ইসলাম সুফিবাদী আধ্যাত্মিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করার ফলে মক্তব, পীরের মাজার, সন্ন্যাসী ফকিরের প্রতি কৌতুহল তাঁর মধ্যে ভক্তিবাদ ও রহস্যময়তার বীজ উপ্ত করে।[১২১]বুলবুলের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে তাঁর মধ্যে অলৌকিক অধ্যাত্ম সাধনার দিকটি সরাসরি প্রকাশিত হলেও এর বীজ বাল্যকাল থেকেই তাঁর মধ্যে লুকায়িত ছিলো। যার প্রথম স্ফুরণ দেখা

---

[১১৭] তদেব, পৃ. ১৪।
[১১৮] তদেব, পৃ. ১৭।
[১১৯] তদেব,পৃ. ১১০।
[১২০] রেজিনা আকতার আলম, নজরুলের মানবতাবাদী দর্শন, পৃ. ২২৭।
[১২১] গোলাম মুরশিদ, বিদ্রোহী রণক্লান্ত:, পৃ. ২৮।

যায় 'চাষার সং' নাটকের দুটি গানে। গান দুটির প্রভাব পরিলক্ষিত হয় নজরুলের পরিণত বয়সের ইসলামি গানেও। আমি আল্লা নামের বীজ বুনেছি এবার মনের মাঠে/ ফলবে ফসল বেচবো তারে কিয়ামতের হাটে' রচনাটি তাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি তাঁর 'পরম সুন্দর', 'মধুরম'কে আবিষ্কার করতে যেয়ে নিজের অসীমতা আবিষ্কার করেন। রেঁনে ডেকার্টের মতো নজরুলও মনে করেন তাঁর নিজ অস্তিত্বের সন্ধান অন্বেষণই তিনি করেছেন। তাই নিজ অস্তিত্ব অনুসন্ধানের অনিবার্য কারণরূপে তিনি স্রষ্টার অস্তিত্বকে স্বীকার করে নেন। এবং এই স্রষ্টার সমীপেই তিনি তাঁর সবকিছু সঁপে দেন। তাঁকে পাওয়ার কামনা তাকে কোনো বন্ধনেই বাঁধতে দেয়নি। নজরুল যে আজন্ম তাঁর পরম প্রভুর ধ্যানে নিমগ্ন, তার কথা বলতে গিয়ে বলেন-

> আমি আমার জন্মক্ষণ থেকে যেন আমার শক্তি বা আমার অস্তিত্বকে, existence-কে খুঁজে ফিরছি। যখন আমি বালক, তখন আকাশের দিকে তাকিয়ে আমার কান্না আসত–বুকের মধ্যে বায়ু যেন রুদ্ধ হয়ে আসত। আমার কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলতাম–'ঐ আকাশটা যেন ঝুড়ি, আমি যেন পাখির বাচ্চা, আমি ঐ ঝুড়ি চাপা থাকব না–আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে।' তাই ইউনিভার্সিটির দ্বার থেকে ফিরে ইউনিভার্সের দ্বারে হাত পেতে দাঁড়ালাম। জীবনে কোনো দিন কোনো বন্ধনকে স্বীকার করতে পারলাম না। কোনো স্নেহ-ভালবাসা আমায় বুকে টেনে রাখতে পারল না। এই পরম তৃষ্ণা যে কোনো পরম-সুন্দরের তা বুঝতে পারিনি। বুঝতে পারিনি বলেই অবুঝের মত-পথ থেকে পথান্তরে ঘুরেছি। অনন্ত শূন্যে অনন্ত শ্বেত শতদলের মাঝে একখানি অপরূপ সুন্দর মুখ দেখেছি–সেই মুখ যেন নিত্য আমাকে অসুন্দরের পথ থেকে ফিরিয়েছে–কেবল ঊর্ধ্বের পানে আকর্ষণ করছে।[১২২]

নিজের অস্তিত্ব অনুসন্ধানের মাধ্যমে যে তিনি স্রষ্টার সন্ধান পেয়েছেন এবং সেই স্রষ্টার স্তবগানই তাঁর সাহিত্য রচনার উদ্দেশ্য তার ইঙ্গিত পাওয়া যায় নজরুলের এই উক্তির মধ্যে-"আমি কবি যশঃপ্রার্থী হয়ে জন্মগ্রহণ করিনি। আমি আমার অস্তিত্বকে, আমার শক্তিকে খুঁজতে এসেছিলাম পৃথিবীতে তাঁর দেখা পেয়েছি–তাঁর পরম-সুন্দর নয়নের প্রসাদ পেয়েছি–এই কথাই যেন আমার ফিরে-পাওয়া বেণুকায় গেয়ে যেতে পারি।"[১২৩] ১৯৪১ সালে বনগাঁ সাহিত্যসভার চতুর্থ বার্ষিক সম্মেলনে প্রদত্ত সভাপতির বক্তব্যে নজরুল যা বলেন তার পুরোটাই ছিলো আধ্যাত্মিক বক্তব্য। সেখানে তিনি বলেন যে, তিনি তাঁর পরম-সুন্দরের ধ্যানে মগ্ন থাকেন। কিন্তু যখনই তাকে বিভিন্ন সভায় আমন্ত্রণ করা হয় এবং তিনি তাতে যোগদান করেন তখনই তাঁর ধ্যানচ্যুতি ঘটে। তাঁর পরম-সুন্দরের সাথে বিচ্ছেদ ঘটে। কিন্তু তিনি সে বিচ্ছেদ চান না। তিনি মনে করেন তাঁর 'পরম সুন্দর' এর আহ্বানে সাড়া দিতে গিয়ে তিনি ধ্যানের মধ্যে চলে যান এক নিস্তব্ধ শূণ্যে যেখানে কোনো বাণী নেই, কোনো সুর নেই, নেই কোনো অনুভূতি, আছে শুধু ইঙ্গিত। তিনি শুনতে পেতেন

---

[১২২] "মধুরম," 'অভিভাষণ,' নর ৮ম, পৃ. ৪৪।

[১২৩] তদেব, পৃ. ৪৫।

তাঁর বাণী 'ফিরে আয়, ফিরে আয়'। তিনি নিজের মধ্যে দেখতে পেতেন পরম-প্রভুর প্রকাশ; যার নির্দেশ অনুযায়ী চলে তাঁর সকল সাধনা, তপস্যা, কামনা, বাসনা, জীবন, মরণ। তিনি বলেন-

> এই 'মিস্টিসিজম' বা মিস্ট্রির মাঝে যে মিষ্টি, যে মধু পেয়েছি, তাতে আজ আমার বাণী কেবল 'মধুরম মধুরম মধুরম'। এই মধুরমকে প্রকাশের ভাব-ভঙ্গি-ভাষা এখন আমার চির-মধুরের ইচ্ছাধীন। আজ আমার সকল সাধনা, তপস্যা, কামনা, বাসনা, চাওয়া, পাওয়া, জীবন, মরণ তাঁর পায়ে অঞ্জলি দিয়ে আমি আমিত্বের বোঝা বওয়া দুঃখ থেকে মুক্তি পেয়েছি। আজ দেখি, অনন্ত আকাশ বেয়ে যেন আমার সেই পরম-সুন্দরের পরমাশ্রু ঝরে পড়ছে–অনন্ত ভুবন ধরতে পারছেন না সে পরমা শ্রীকে–অনন্ত নীহারিকালোক থেকে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ছুটে আসছে উন্মাদ বেগে সেই পরমা শ্রীপ্রসাদ লোভে।[১২৪]

ফারসি ভাষা শেখার ফলে নজরুল হাফিজ, ওমর খৈয়ামসহ অধিকাংশ ফারসি লেখকের রচনা পড়ে ফেলেছিলেন। তাদের অনেকেই সুফি মতাদর্শী ছিলেন। হাফিজকে তিনি সুফি-দরবেশ বলে মনে করতেন।[১২৫] তাছাড়া বিভিন্ন ধর্মের ধর্মতত্ত্ববিদদের দর্শন ও আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কে তিনি অবগত ছিলেন। ফলে তাঁর সাহিত্যেও সুফিবাদী চিন্তা ও আধ্যাত্মিকতার সুস্পষ্ট প্রতিফলন দেখা যায়। যেমন তিনি বলেন-

ঐ রূপ দেখে রে পাগল হল
মনসুর হল্লাজ
সে 'আনল্‌হক' 'আনল্‌হক' বলে
ত্যজিল জীবন ॥

তুই খোদকে যদি চিনতে পারিস
চিনবি খোদাকে,
তোর রুহানি আয়নাতে দেখ রে
সেই নূরি রওশন ॥[১২৬]

তিনি স্রষ্টাকে ততোই ভালোবাসেন যেমন ভালোবেসেছিলেন মজনু লাইলিকে। তিনি সর্বদাই তাঁর প্রেমে মশগুল থাকতে চান। দিবস রাত তাঁর নাম জপতে চান। আল্লাহ নামের মধ্যে এতই মধু আছে যে ঐ নাম জপলে তিনি বেহুঁশ হয়ে যান। তিনি তাঁর অস্তিত্ব অনুভব করেন অন্তরে। তাঁর নাম জপলে বেহেশতের পিয়াসা মিটে যায়; ঈদের চাঁদ তাকে যে আনন্দ দিতে পারে না সে আনন্দ পান আল্লাহর নাম জপলে। এজন্য তিনি বলেন- 'আমি চাই না বেহেশত, রব বেহেশতের মালিক লয়ে'[১২৭]ফলে সেই স্রষ্টার উদ্দেশ্যে নজরুল নামাজ রোজা সবকিছু উৎসর্গ করেন। নজরুল মনে

---

[১২৪] তদেব, পৃ. ৪৪।
[১২৫] "মুখবন্ধ," 'রুবাইয়াত-ই-হাফিজ,' নর ৪র্থ, পৃ. ১২৯।
[১২৬] "জুলফিকার," নর ৪র্থ, পৃ. ৩০০।
[১২৭] "গুল-বাগিচা," নর ৫ম, পৃ. ২৭৫।

করেন বেহেশতের সুখ দুনিয়াতেও পাওয়া যায়, যদি আল্লাহর নাম সর্বদা মুখে রাখা যায়। কেননা আল্লাহর নাম জপার মধ্যেই রয়েছে জান্নাতের সুখ। এর ফলে ব্যক্তির দুনিয়াতে থাকে না কোনো ভয়, সে প্রচার করে শুধু আনন্দেরই সুসংবাদ।আল্লাহর কাছে যে যা চায় তাঁকে তিনি তাই দেন। কিন্তু নজরুল আল্লাহর নিকট থেকে কোনো ধন-সম্পদ, অর্থকড়ি, যশ-মান-সম্মান চান না; চান শুধু তাঁর নামের 'সরবত', তাঁর নামের বরকত তথা সান্নিধ্য। তাই নজরুল তাঁর তনু-মন-প্রাণ-নয়ন-বাহু-শ্রবণ সবকিছু যেন তাঁর হুকুম মেনে চলে সে প্রার্থনাই করেন।

ওগো অন্তর্যামী, ভক্তের তব শোন শোন নিবেদন
যেন থাকে নিশিদিন তোমার সেবায় মোর
তনু-প্রাণ-মন ॥[১২৮]

নাস্তিকদের একটা অংশ আল্লাহর অস্তিত্ব ও তাঁর প্রতি পূজার্চনাকে অর্থহীন কাজ মনে করে থাকে। নজরুল তাদের উদ্দেশ্যে বলেন- "আমাদের পরম প্রভুর ধ্যান করা মানে সময় নষ্ট করা নয়, আমাদেরই না-জানা পূর্ণতাকে স্বীকার করা; আমারই ঘুমন্ত অফুরন্ত শক্তিকে জাগিয়ে তোলা।'[১২৯] এই উক্তির মধ্যে দিয়ে নজরুল একদিকে যেমন স্রষ্টাকে এক পূর্ণতম সত্তা হিসেবে স্বীকার করেছেন আবার অন্যদিকে মানুষের মধ্যে অফুরন্ত ক্ষমতা বিদ্যমানতার কথা বলেছেন। আর এই সুপ্ত বা ঘুমন্ত ক্ষমতার কারণেই তিনি স্রষ্টার কাছাকাছি পৌছান। তিনি মনে করেন যে, একবার মানুষ যখন তার মধ্যকার ঘুমন্ত ক্ষমতাকে জাগাতে পারে তখন পৃথিবীর কোনো ঘৃণ্য জিনিসই তাকে বিচলিত করতে পারে না। সে একই সাথে মন্দ-ভালোর সাথে পূর্ণ-অভয়চিত্তে বিচরণ করতে পারেন। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিনগুণের অতীত হয়েও ওই তিনগুণে নেমে বিপুল কর্ম করতে পারেন। খোদার নাম সর্বদা জপলে মানুষের অন্তরের সকল কদর্যতা দূর হয়; ফলে খোদার সৃষ্টির রহস্যভেদ তিনি করতে পারেন বলে নজরুল মনে করেন।

হর্‌দম জপে মনে কল্‌মা যে জন
খোদায়ী তত্ত্ব তার রহে না গোপন,
দীলের আয়না তার হয়ে যায় পাক সাফ,
সদা আল্লার রাহে তার রহে মতি ॥[১৩০]

২.৪. উপসংহার

ধর্মবিশ্বাসী নজরুলের উপর ধর্মীয় মনস্তত্ত্বের প্রভাব লক্ষ করার মতো। জীবনের বিভিন্ন বাঁকে আস্তিক নাস্তিক প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গের সাথে চলেছেন। মার্কসবাদী তথা সাম্যবাদী বন্ধু মুজাফফর এর সাহচর্য, সাহিত্য আড্ডা কোনো কিছুই নজরুলের 'সুন্দরে'র নিকট থেকে আলাদা করতে পারেনি।

[১২৮]"অগ্রন্থিত গান," নর ১০ম, পৃ. ৩৬০-১ এবং "অগ্রন্থিত গান,"নর ১১তম, পৃ. ৬২।
[১২৯] "ধর্ম ও কর্ম," নর ৭ম, পৃ. ৪৬।
[১৩০]"অগ্রন্থিত গান," নর ১০ম, পৃ. ২২৩।

সুন্দরের প্রেম তাঁকে এতই আবিষ্ট করে রেখেছিলো যে, ক্ষণিকের জন্য হলেও পরম সুন্দরের সাথে তাঁর বিচ্ছেদ হলে তিনি ব্যথিত হয়ে উঠেন। তিনি তাঁর বন্ধুর হাতের বীণা হয়ে আবির্ভূত হয়েছেন। পুরো জীবন তাঁর নির্দেশই পালন করে গেছেন। স্রষ্টার প্রতি যে ভালোবাসা ঠিক তদ্রুপ ভালোবাসা লক্ষ করা যায় ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর প্রতি। তিনি তাঁর সাক্ষাৎ চান; আর এ জন্যে রোজ হাশর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারেন না। তিনি রসুলের স্পর্শ নেওয়ার জন্য মক্কা-মদীনার ধূলি হতে চান। আল্লাাহ ও তাঁর রসুলের প্রতি বিশ্বাসের পাশাপাশি সেই সকল বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেন যা ইসলাম ধর্ম আবশ্যকীয় করেছে। ইসলামের প্রতি আনুগত্যশীল মুসলিম হলেও নজরুলের মধ্যে কোনো গোঁড়ামি ছিলো না। তিনি প্রতিটি ধর্মের সহাবস্থানের উপর বিশ্বাসী ছিলেন। এ জন্য হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি কামনা করে ‘কাণ্ডারী হুঁশিয়ার’ কবিতা রচনা করেন। ধর্মের নামে গোঁড়ামি, ও অধার্মিক ক্রিয়াকর্মের সমালোচনা করেন। ধর্মান্ধদের সমালোচনায় আচার সর্বস্বতার পরিবর্তে বুঝে ধর্মপালন করার প্রতি গুরুত্ব দেন। খোদাকে না জেনে শুধু মুখস্ত মন্ত্ররোলে যে তিনি অসন্তুষ্ট হন তা অন্ধ লোকসমাজ বুঝতে পারে না। স্রষ্টাকে অন্তর দিয়ে অনুভব করা ও তাঁর ধ্যানের মাধ্যমে নজরুল আধ্যাত্মিক নজরুলে রূপান্তরিত হন।

তৃতীয় অধ্যায়

ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও স্বরূপ সম্পর্কে কাজী নজরুল ইসলাম

ভূমিকা

ধর্মদর্শনের ইতিহাসে ঈশ্বরের আলোচনা একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। প্রাচীন যুগ থেকে শুরু করে সমকালীন দার্শনিকদের আলোচনার একটি অন্যতম বিষয় এই দৃশ্যমান জগতের অন্তরালের প্রকৃত সত্তা নিয়ে। এই জগতের আদি উপাদান কি, দৃশ্যমান জগতের অন্তরালে কোনো প্রকৃত জগত আছে কি না, নাকি এই জগতই প্রকৃত জগত, যদি এই জগতই প্রকৃত জগত হয়ে থাকে তাহলে এর পরিচালনার পেছনে কোনো অতীন্দ্রিয় সত্তার হাত রয়েছে কি না, এ সকল প্রশ্ন সর্বদাই চিন্তাশীল মানুষের মনকে আন্দোলিত করেছে। এর উত্তর খুঁজতে গিয়ে দার্শনিকদের মধ্যে মতানৈক্য লক্ষ করা যায়। কেউ জগতের অপরূপতার পেছনের কারণ হিসেবে এক পরম সত্তার অস্তিত্বকে স্বীকার করে নেন, আবার কেউ যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক প্রমাণের মাধ্যমে ঈশ্বরের অস্তিত্বকে প্রমাণ করতে না পেরে তাঁর অস্তিত্বকে অস্বীকার করেন। ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে গিয়ে তারা দাঁড় করান বস্তুবাদী যুক্তি-তর্ক। এ জন্য বিশ্বাসীদের ঈশ্বর আর দার্শনিকদের ঈশ্বর, আস্তিক আর নাস্তিকের ঈশ্বরের মধ্যে ভিন্নতা দেখা যায়। এই ভিন্নতাকে স্বীকার করেই দার্শনিকরা তাঁদের মতের স্বপক্ষে যুক্তি ও প্রমাণ দিয়েছেন। দর্শনের ইতিহাসের এই দার্শনিক বিতর্কে কাজী নজরুল ইসলাম একজন যুক্তিবিদ।

নজরুল মূলত কবি, প্রাবন্ধিক, গল্পকার, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক, ও গীতিকার। ফলে অন্যান্য সাহিত্যিকদের মতো তাঁর চিন্তাতেও আবেগের দিকটির উপস্থিতি লক্ষণীয়। তবে সাহিত্য রচনায় আবেগ রসদ জোগালেও তিনি কখনো যুক্তিকে নির্বাসনে পাঠান নি। ফলে জগতের প্রাকৃতিক অপরূপতা তাঁর চিন্তাশীল মনকে এর কারণ অনুসন্ধানে মগ্ন করে। এর প্রতিফলন তাঁর ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে যুক্তি, বহুঈশ্বরবাদ, দ্বি-ঈশ্বরবাদ এবং নিরীশ্বরবাদের প্রতিক্রিয়ায় ঈশ্বরের একত্ববাদীতা প্রমাণ করার দার্শনিক প্রচেষ্টার মধ্যে লক্ষ করা যায়। এমনকি ঈশ্বরের গুণাবলি বর্ণনার পাশাপাশি দার্শনিক বিতর্কের একটি অন্যতম দিক জগতের সাথে ঈশ্বরের সম্পর্ক বিষয়ক আলোচনাও নজরুলসাহিত্যে প্রতিফলিত। তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্বের আলোচনায় ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের সাথে পাশ্চাত্য দর্শনের একটি মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন। কিন্তু যেহেতু তিনি ধর্মের প্রতি অনুরাগী সেহেতু ঈশ্বর সম্পর্কিত ধর্মীয় যুক্তি তাঁর চিন্তায় প্রাধান্য পেয়েছে। এভাবে দার্শনিক ও ধর্মীয় যুক্তি ও প্রমাণের মাধ্যমে ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও স্বরূপকে উদ্ঘাটন করতে সচেষ্ট হয়েছেন।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও স্বরূপ প্রসঙ্গে কাজী নজরুল ইসলাম

দর্শনের ইতিহাসে দার্শনিকদের মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্বের অনিবার্যতা ও তাঁর গুণাবলি কেমন তা নিয়ে বিপরীতধর্মী মত রয়েছে। ঈশ্বরের স্বরূপ বিষয়ে নজরুলের দৃষ্টিভঙ্গি বুঝতে হলে দার্শনিকদের

দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা ব্যতীত সম্ভব হবে না। তাই দার্শনিকদের দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনার পাশাপাশি নজরুলের মতামত উপস্থাপন করা হলো।

ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে নজরুলের যুক্তি

সুফিবাদী মুসলিম পরিবারে জন্ম নেয়া 'নজরুলের ধর্মের প্রতি আস্থা ও ভক্তি ছিল গভীর'[১]। এই আস্থা ও ভক্তির ভিত্তিমূলে রয়েছে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি। দার্শনিকগণ ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে যে সকল যুক্তি প্রদান করেছেন নজরুল সাহিত্যে সে সকল যুক্তির স্পষ্ট ছাপ লক্ষণীয়। ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে দার্শনিকগণ প্রধানত চার ধরনের যুক্তি দিয়েছেন। যুক্তি চারটি হলো- (ক) তত্ত্ববিদ্যামূলক যুক্তি; (খ) কার্যকারণ বিষয়ক তথা বিশ্বতাত্ত্বিক যুক্তি; (গ) উদ্দেশ্যমূলক যুক্তি এবং (ঘ) নৈতিক যুক্তি। ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে প্রথম *তত্ত্ববিদ্যামূলক যুক্তির* অবতারণা করেন সেন্ট আনসেলম। ঈশ্বর যে অস্তিত্বশীল এই মত প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে তিনি বলেন, আমাদের মনের ভিতর ঈশ্বর বা অনন্ত সত্তার যে ধারণা আছে, তাই দেখিয়ে দেয় যে, ঈশ্বর আছেন। ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে যুক্তি তুলে ধরে তিনি বলেন-"সংজ্ঞাগত অর্থে, ঈশ্বর একটি পরিপূর্ণ সত্তা; এটি অনস্তিত্বশীল হওয়ার চেয়ে অস্তিত্বশীল হওয়াই উত্তম; সুতরাং ঈশ্বর অস্তিত্বশীল।"[২] রেঁনে ডেকার্ট (১৫৯৬-১৬৫০) এর মতে, পূর্ণতার ধারণা অস্তিত্বের নির্দেশক। তাই ঈশ্বর যদি পূর্ণ হয়ে থাকেন, তাহলে অবশ্যই তাঁকে অস্তিত্বশীল হতে হবে।[৩] অর্থাৎ মানব মনে পূর্ণতম সত্তার যে ধারণা বিদ্যমান তাই প্রমাণ করে যে, ঈশ্বর অস্তিত্বশীল। নজরুল জগতের অপরূপতা তথা জগতে বিদ্যমান সুন্দর ফুল-ফল-ফসল, নদ-নদী-পাহাড়-স্রোত, জ্ঞান-যশ-সম্মান, পাখির কলকাকলি, আকাশের তারকারাজি প্রভৃতি দেখে তাঁর মনে এক 'পরম পতি'র অস্তিত্ব অনুভব করেন। যাকে তিনি 'সুন্দর' হিসেবে আখ্যা দেন। তাঁর মতে ঈশ্বর সুন্দর, তাই এই নিখিল বিশ্ব সুন্দর ও শোভাময়। নজরুল বলেন- 'তুমি সুন্দর, তাই নিখিল বিশ্ব সুন্দর শোভাময়'।[৪] অন্যত্র তিনি বলেন-

> এই সুন্দর ফুল, সুন্দর ফল, মিঠা নদীর পানি
> খোদা তোমার মেহেরবাণী।

নিখিল বিশ্বের এই অপরূপ সৌন্দর্য দেখে ফরাসি দার্শনিক ভলতেয়ার (১৬৯৪-১৭৭৮) ঈশ্বরের অস্তিত্বে অস্বীকার করে থাকতে পারেন নি। গোটা প্রকৃতির অপরূপতা দেখে তিনি বলেন-

[১] আহমদ শরীফ, *একালে নজরুল*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা,২০১৫, পৃ. ৯৯।

[২] (God, by definition, is a perfect being; It is better to exist than not to exist; Therefore, God exists)T. J. Mawson, *Belief in God: An Introduction to the Philosophy of Religion* (Oxford: Clarenden press, 2005), p.125.

[৩] John H. Hick, *Philosophy of Religion*, Fourth ed. (New Jersey 07632: Englewood Cliffs. 1990), p. 18.

[৪] কাজী নজরুল ইসলাম,"ঘুমের ঘোরে", 'ব্যথার দান', নজরুল রচনাবলী, ১ম খণ্ড, জন্মশতবর্ষ সংস্করণ, (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১২), পৃ. ২২৫। অতঃপর খণ্ডসংখ্যাসহ নর লিখিত হবে।

"ঈশ্বর যদি অস্তিত্বশীল না-ও হতেন, তা হলে ঈশ্বরকে আবিষ্কার করতে হতো; কিন্তু গোটা প্রকৃতি আমাদের কাছে চিৎকার করে বলছে যে ঈশ্বর আছেন।"[৫] আরেক ফরাসী দার্শনিক রুশো (১৭১২-১৭৭৮) জীবজগতের বিশেষ সুবিধাজনক অবস্থা দেখে ঈশ্বরের অস্তিত্বের কথা স্বীকার করেন। তাঁর মতে, জীবজগতে মানুষের উচ্চতর ও সুবিধাজনক অবস্থা দেখে আমার মনে বদান্য স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতার ভাব জেগে উঠে। এই ঈশ্বর অনাদি কাল থেকেই আছেন এবং সব ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পরও থাকবেন।[৬] ভলতেয়ার ও রুশোদের মতো প্রাকৃতিক অপরূপতা দেখে নজরুলেরও অন্তরে ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতার ভাব জেগে উঠে। তাই তিনি দ্বার্থহীনভাবে ঘোষণা করেন যে, তাঁর জীবন-মরণ সব কিছু ঈশ্বরের রাহে সমর্পিত।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ক *কার্যকারণ যুক্তি*'র[৭] পক্ষে টমাস একুইনাস বলেন যে, ঈশ্বরকে আবশ্যিকভাবে অস্তিত্বশীল হতে হবে। নশ্বর কোনো বস্তু ঈশ্বর হতে পারেন না। তিনিই ঈশ্বর হবেন যিনি কোনো সময়ই অনস্তিত্বশীল ছিলেন না, বরং তিনিই সকল কিছুকে অস্তিত্বশীল করেছেন। আর তিনিই হলেন ঈশ্বর।[৮] নীতিপরায়ণ জন প্রেস্টন এর মতে ঈশ্বর হলেন সবকিছুর আদি কারণ। আর আদি কারণ হিসেবে ঈশ্বর স্বয়ংজাত।[৯]ভারতীয় ন্যায় দর্শন অনুসারে মাটির ঘটের কর্তা যেমন কুম্ভকার তেমনি এই বিরাট পৃথিবীর যাবতীয় অনিত্য পদার্থের একজন স্রষ্টা থাকবেন, আর তারই নাম ঈশ্বর। *উপনিষদে*ও বলা হয়েছে, অনিত্যের পিছনে নিত্য, অধ্রুবের পিছনে যে ধ্রুব সত্য কিছু আছে, তারই নাম ঈশ্বর।[১০] ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করার ক্ষেত্রে প্রখ্যাত জার্মান দার্শনিক লাইব্‌নিজ (১৬৪৬- ১৭১৬) বলেন- "আমি যে এই কলম দিয়ে এই বই লিখছি, তার কারণ, আপতদৃষ্টিতে আমার ইচ্ছা, সেই ইচ্ছার কারণ আরো কিছু। এভাবে কার্যকারণ-ধারা বিশ্লেষণ করতে করতে শেষ পর্যন্ত আমরা জানি যে, আমার লেখার কারণ ঈশ্বরের ইচ্ছা।"[১১] লাইবনিজ এর নাম দিয়েছেন 'পর্যাপ্তকারণ'। বিচারকের বরাবর লিখিত 'রাজবন্দীর জবানবন্দী'তে নজরুল যে বক্তব্য উত্থাপন করেন তা যেনো ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ক লাইব্‌নিজের কার্যকারণ বিষয়ক যুক্তিরই প্রতিফলন। নজরুল বলেন-

---

[৫] আমিনুল ইসলাম, জগৎ জীবন দর্শন, ১ম সং (ঢাকা: মওলা ব্রাদার্স, ২০১১), পৃ. ২৪২

[৬] আমিনুল ইসলাম, আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শন, ৪র্থ সং (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০০), পৃ. ২১৬।

[৭] কার্যকারণ যুক্তি অনুযায়ী প্রত্যেকটি কার্যের একটি কারণ থাকবে। তবে সে কারণ অবিরাম গতিতে সামনে অগ্রসর হতে পারে না। একটা পর্যায়ে যেয়ে থামতে হয়। এই শেষ কারণই হলো ঈশ্বর।

[৮] Alvin Plantinga, *God, Freedom, and Evil*(Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company, 1977), p. 77.

[9] Janine Marie Idziak, "Divine Commands Are the Foundation of Morality", *in* Michael L. Peterson and Raymond J. VanArragoned., *Contemporary Debates in Philosophy of Religion* (Oxford: Blackwell Publishing Ltd, 2004), p. 291.

[১০] গোবিন্দচন্দ্র দেব, *তত্ত্ববিদ্যা-সার*, ২য় মুদ্রণ(ঢাকা: অধুনা প্রকাশন, ২০০৮), পৃ. ২১৬।

[১১] তদেব, পৃ. ২১৪।

সুর আমার বাঁশির নয়, সুর আমার মনে এবং আমার বাশিঁ সৃষ্টির কৌশলে। অতএব দোষ বাঁশিরও নয় সুরেরও নয়; দোষ আমার, যে বাজায়; তেমনি যে বাণী আমার কণ্ঠ দিয়ে নির্গত হয়েছে, তার জন্য দায়ী আমি নই। দোষ আমারও নয়, আমার বীণারও নয়; দোষ তাঁর-যিনি আমার কণ্ঠে তাঁর বীণা বাজান। সুতরাং রাজবিদ্রোহী আমি নই; প্রধান রাজবিদ্রোহী সেই বীণা-বাদক ভগবান। তাঁকে শাস্তি দিবার মতো রাজ-শক্তি বা দ্বিতীয় ভগবান নাই।[১২]

নজরুল মনে করেন তিনি যা লিখছেন তা তার নয় বরং তাঁর সুন্দরের। তিনিই তাঁর কথাকে কবির হাত দিয়ে লিখিয়েছেন। যেমন তিনি বলেন- "তখনো একথা ভাবতে পারিনি, এ লেখা আমার নয়, এ লেখাআমারি সুন্দরের, আমারি আত্মা-বিজড়িত আমার পরমাত্মীয়ের।"[১৩] আবার আনওয়ার হোসেনকে লিখিত পত্রে লেখেন-"আমি যার হাতের বাঁশি, সে যদি আমায় না বাজায় তাতে আমার অভিযোগ করবার কিছুই নেই। কিন্তু আমি মনে করি–সত্য আমায় তেমন করেই বাজাচ্ছে, তাঁর হাতের বাঁশি করে।"[১৪]

নজরুল মনে করেন তাঁর কণ্ঠ দিয়ে যে বাণী নির্গত হয় তার কারণ হিসেবে যেমন একজন ঈশ্বর অবশ্যই থাকবেন তেমনি অণু-পরমাণুর অন্তর্গত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ইলেক্ট্রন-প্রোটন থেকে শুরু করে মহাকাশের ছায়াপথ, সূক্ষ্ম জীবকোষের বৃদ্ধি ও বিকাশ, মানুষের জটিল মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়া পর্যন্ত সবকিছুর নিখুঁত রূপান্তর তথা গতির পেছনের কারণ হিসেবে একজন পরিকল্পনাকারীও অবশ্যই থাকবেন। নজরুল সকল প্রকার প্রক্রিয়ার পেছনের কারণ হিসেবে ঈশ্বরকে মনে করেন। তিনি মনে করেন, ঈশ্বর রূপের স্রষ্টা; তিনি নিজ মনে এই পৃথিবীর সোন্দর্য বৃদ্ধি করে চলছেন। অথচ জগতের রূপ দৃষ্টগ্রাহ্য হলেও এই রূপের স্রষ্টা ঈশ্বর দৃষ্টির আড়ালেই থেকে যান।নজরুলের মতে চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-তারা, ফুলের সুরভি, পাখির মন মাতানো সুরের কারণও ঈশ্বর। নজরুল বলেন-

ফুলে পুছিনু, "বলো, বলো ওরে ফুল!
কোথা পেলি এ সুরভি, রূপ এ অতুল?"
"যাঁর রূপে উজালা দুনিয়া", কহে গুল্,
"দিল সেই মোরে এই রূপ এই খোশবু।
আল্লাহু আল্লাহু॥"

"ওরে কোকিল, কে তোরে দিল এ সুর,
কোথা পেলি পাপিয়া এ কণ্ঠ মধুর?"
কহে কোকিল ও পাপিয়া, "আল্লাহ্ গফুর,
তাঁরি নাম গাহি 'পিউ পিউ, কুহু কুহু'–
আল্লাহু আল্লাহু॥"

---

[১২] "রাজবন্দীর জবানবন্দী," নর ১ম, পৃ. ৪৩২।
[১৩] "আমার সুন্দর,"নর ৭ম, পৃ. ৩৮।
[১৪] "পত্রাবলী," নর ৯ম, পৃ. ১৯৩।

"ওরে ও রবি-শশী, ওরে ও গ্রহ-তারা,
কোথা পেলি এ রওশ্‌নী জ্যোতিঃধারা?"
কহে, "আমরা তাঁহারি রূপের ঈশারা–
মুসা বেহুঁশ হলো হেরি যে খুবরু।
আল্লাহু আল্লাহু ॥"[১৫]

নজরুল মনে করেন ঈশ্বরকে অবশ্যই অমর হতে হবে। কেননা মরনশীল কখনো কোনো কিছুর আদি কারণ হতে পারে না। সুতরাং সৃষ্টি মরণশীল হলেও স্রষ্টাকে অমর হতে হবে। মানুষের মরণশীলতা দেখেই নজরুল বুঝতে পারেন মানুষের কারণ মানুষ নয়। এমনকি বিশ্বের যাবতীয় কিছু যেহেতু লয়প্রাপ্ত সুতরাং তারাও কোনোকিছুর আদি কারণ হতে পারে না। উপরন্তু স্রষ্টার ধারণার মধ্যেই তাঁর অবিনশ্বরতার দিকটিরয়েছে বলে দার্শনিকগণ দেখিয়েছেন। সে উপলব্ধি থেকেই নজরুল বলেন- "আমি মর, কিন্তু বিধাতা অমর।"[১৬] ফলে আমার কারণ আমি হতে পারি না। এভাবে নজরুল দেখালেন জগতে যা কিছু ঘটে তাঁর একটি কারণ থাকবে আর সে কারণই হলো ঈশ্বর বা ভগবান। মানুষের প্রতিটি কাজ, ইচ্ছা, অভিপ্রায় সবকিছুর মূল কারণ ঈশ্বরের ইচ্ছা। নজরুলের এই চিন্তার মধ্যে নিহিত রয়েছে *কার্যকারণ বিষয়ক যুক্তি*র মর্মকথা।

উদ্দেশ্যমূলক যুক্তির মূল কথা হলো, এই বিশ্বজগতের নিয়ত নিয়মশৃঙ্খলা, ঐক্য ও সামঞ্জস্য স্পষ্টভাবে একজন সর্বশক্তিমান কর্তার নির্দেশ করে যিনি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই জগত সৃষ্টি করেছেন। আর তিনিই হলেন ঈশ্বর। এই মত মনে করে যে পৃথিবী সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশ্য পূরণের জন্যই নিয়ত অগ্রসরমান। প্রাচীন গ্রিসের হিরাক্লিটাস, প্লেটো ও এরিস্টটলের দর্শনের পাশাপাশি প্রাচীন ভারতের ন্যায় দার্শনিকেদের চিন্তাতেও উদ্দেশ্যবাদের অভিব্যক্তি লক্ষ করা যায়। উদ্দেশ্যবাদকে স্পষ্ট করতে গিয়ে দার্শনিক পেলি (১৭৪৩-১৮০৫) তাঁর *Natural Theology or Evidence of the Existence and Attributes of the Deity* গ্রন্থে ঘড়ির উপমার আশ্রয় নেন। তাঁর মতে মরুভূমিতে চলা অবস্থায় কোন ব্যক্তি যদি একটি বড় পাথরখণ্ড দেখতে পায় তাহলে তার বিস্ময়াভূত হওয়ার তেমন কারণ থাকে না যেমন থাকে যদি একটি ঘড়ি দেখতে পায়। কেননা বাতাস, বৃষ্টি, উত্তাপের ফলে বালু পাথরে রূপান্তরিত হতে পারে। কিন্তু একটি ঘড়ি দেখে যেমন এর একজন নির্মাতার কথা মনে পড়ে তেমনি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের এই বিচিত্র সৃষ্টির পেছনেও কোনো না কোনো বুদ্ধিমান স্রষ্টার হাত রয়েছে।[১৭] আর তিনিই হলেন ঈশ্বর। নজরুলও মনে করেন এ বিশ্বের প্রতিটি সৃষ্টি পরমসত্তার উদ্দেশ্যের অভিব্যক্তি। কবি নজরুলও সেই উদ্দেশ্যের বাইরে নন। তাঁকে সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে নজরুল বলেন- "আমি কবি, অপ্রকাশ সত্যকে প্রকাশ করবার

[১৫] "অগ্রন্থিত গান,"নর ১০ম, পৃ. ২২৪-৫।

[১৬] "রাজবন্দীর জবানবন্দী," নর ১ম, পৃ. ৪৩২।

[১৭] John H. Hick, *Philosophy of Religion*, 23. and see also T. J. Mawson, *Belief in God: An Introduction to the Philosophy of Religion*, 133.

জন্য, অমূর্ত সৃষ্টিকে মূর্তি দানের জন্য ভগবান কর্তৃক প্রেরিত। কবির কণ্ঠে ভগবান সাড়া দেন। আমার বাণী সত্যের প্রকাশিকা, ভগবানের বাণী।"[১৮]

নজরুল তাঁর সাহিত্যভাণ্ডারের মধ্যে দিয়ে এভাবে গড়ে তোলেন ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে নানা যুক্তি। ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষের এই সকল যুক্তি প্রমাণ করে যে, সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে তিনি শুধুমাত্র সাহিত্যিক কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করেননি বরং সুচিন্তিত দার্শনিক চিন্তার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন তাঁর পুরো সাহিত্যে।দর্শনের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বা পঠন-পাঠন না থাকলেও তিনি যে দার্শনিক যুক্তি দিয়েছেন, তাঁর এই সকল যুক্তির সাথে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য দার্শনিকদের যুক্তি বিস্ময়করভাবে মিলে যায়।

ঈশ্বরের সংখ্যা সম্পর্কে নজরুল

ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে যুক্তি দেওয়ার পর স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠে নজরুলসাহিত্যে ঈশ্বরের সংখ্যা সম্পর্কিত কোন্ মতটির সমর্থন পাওয়া যায়। ঈশ্বরের সংখ্যা নিয়ে নজরুলের সাহিত্যে আলোচনার কারণ হলো নজরুল যে সমাজে বাস করতেন, সে ভারতীয় সমাজে বস্তুবাদী ধ্যান-ধারণা থেকে চার্বাক, জৈন ও বৌদ্ধ দার্শনিকগণ ঈশ্বরের অস্তিত্বকে স্বীকার করেন নি। আবার যারা স্বীকার করেছেন তাদের মধ্যেও ঈশ্বরের সংখ্যা নিয়ে রয়েছে বিতর্ক। ইসলাম ধর্মের একেশ্বরবাদের বিপরীতে হিন্দু ধর্মে বহু-দেবদেবতার উপস্থিতি, খ্রিষ্ট ধর্মের ত্রিত্ববাদ প্রভৃতি সাধারণ মানুষকে দ্বন্দ্বের মধ্যে ফেলে দেয়। নজরুল সমাজের একজন সদস্য হিসেবে ধর্মের অন্তর্নিহিত অর্থের উপর গুরুত্ব দিতেন। এ জন্য অনেক সময়ে তাঁর সাহিত্যে আপতদৃষ্টিতে বহুঈশ্বরের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। তবে হিন্দু দেব-দেবীদের উল্লেখ করলেও তিনি যে একেশ্ববাদী ছিলেন তা তাঁর সাহিত্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। এমতাবস্থায় ঈশ্বরের সংখ্যা সম্পর্কিত নিরীশ্বরবাদী, দ্বি-ঈশ্বরবাদী ও বহু-ঈশ্বরবাদী ধারণার বিপরীতে একেশ্বরবাদী ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করার নজরুলেরপ্রয়াস উল্লেখ করা হলো।

বহুঈশ্বরবাদের বিপরীতে নজরুলের একেশ্বরবাদ

নজরুল তাঁর সাহিত্যে আল্লাহর পাশাপাশি হিন্দু দেব-দেবীর উল্লেখ করেছেন। উপরন্তু ব্যক্তি জীবনে তিনি মাঝে মাঝে যেমন ইসলামী ধর্মাচার করতেন, তেমনি কালী পূজাও করেছেন বলে মত প্রচলিত রয়েছে। তাই তাঁর ধর্মমত ও ঈশ্বরের সংখ্যা সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। তবে তিনি সাহিত্যে বহু দেব-দেবতার উল্লেখ ও স্তুতিগান করলেও মূলত তিনি একেশ্বরবাদী ছিলেন। কেননা সকল ধর্মের ঈশ্বরকে তিনি একই মনে করতেন। নজরুলের এই একেশ্বরবাদের বিশ্বাস যে শুধুমাত্র মুসলিম পরিবারে জন্ম নেয়ার ফলে হয়েছে তা নয় বরং হিন্দু গ্রামের মুসলিম পাড়ায় জন্মগ্রহণ ও পরবর্তিতে লেটোর দলে গান করার সময় হিন্দু ধর্মশাস্ত্র ও পুরাণের অধ্যয়ন

[১৮] "রাজবন্দীর জবানবন্দী," নর ১ম, পৃ. ৪৩১।

করতে হয়েছিলো। বাংলার ইতিহাস এবং শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্ম সংস্কার আন্দোলন, রাজা রামমোহন রায়, স্বামী বিবেকানন্দসহ অন্যান্যদের ধর্মমত সম্পর্কেও তিনি অধ্যয়ন করেছিলেন। ধর্মের তুলনামূলক অধ্যয়নের মাধ্যমে তিনি বুঝতে পারেন, সকল ধর্মের ঈশ্বরের ধারণা মূলত এক। তাঁর মতে, ঈশ্বরকে বিভিন্ন নামে ডাকলেও আসলে তিনি এক ও অভিন্ন। 'উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন' প্রবন্ধে নজরুল সরাসরি এক আল্লাহতে বিশ্বাসের কথা বলেন। অন্যত্র তিনি বলেন-

এক আল্লারে ভয় করি মোরা, কারেও করি নাভয়,
মোদের পথের দিশারী এক সে সর্বশক্তিময়।"[১৯]

হিন্দু ধর্মে অসংখ্য দেব-দেবীর উপস্থিতি থাকলেও ধর্ম-সংস্কারের ফলশ্রুতিতে একেশ্বরবাদের বা অদ্বৈতবাদের আবির্ভাব ঘটে। হিন্দু ধর্মের অসংখ্য দেব-দেবী একই ঈশ্বরের বিভিন্ন প্রকাশ বা রূপ বলে স্বীকৃতি পেয়ে থাকে।[২০]এর উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে বেদের প্রাচীনতম অংশ ঋগ্বেদের উদ্ধৃতি দিয়ে। ঋগ্বেদে বর্ণিত আছে-

"একং সদ্বিগ্রা বহুধা বদন্তি
অগ্নির্যম: মাতরিশ্বা ইতি।"

[বিশ্বের পিছনের সত্তা এক; জ্ঞানী পুরুষেরা তাকে অগ্নি, যম, মাতরিশ্বা ইত্যাদি নাম দিয়ে থাকেন।][২১]ঋগ্বেদের অন্যত্র বলা হয়েছে-"জ্ঞানী-ঋষিগণ এক ঈশ্বরকে বহু নামে ডাকে"[২২]।

হিন্দু ধর্ম বহুদেবতায় বিশ্বাসী হলেও এ ধর্ম মতে ঈশ্বর এক, যিনি 'ব্রহ্ম' নামে পরিচিত। ব্রহ্ম অপরিবর্তনীয়, অসীম, বিশ্বব্যাপী পরিব্যাপ্ত ও ব্রহ্মাণ্ডের অতীত। অষ্টম শতাব্দীর ভারতীয় দার্শনিক শঙ্কর (৭৮৮-৮২০) তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'অদ্বৈত বেদান্ত'তে দেখিয়েছেন, 'পরম সত্তা'হিসেবে একমাত্র 'ব্রহ্মই' সত্য এবং এক ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নেই।[২৩]*ঋগ্বেদে* বলা হয়েছে-"বন্ধুগণ, তাঁকে ছাড়া আর কাউকে উপাসনা করো না, যিনি একমাত্র ঈশ্বর।"[২৪]হিন্দু ধর্মে ঈশ্বরের গুণ হিসেবে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এই তিনটি প্রধান নামের উল্লেখ রয়েছে। এদের প্রত্যেকটির আবার রয়েছে অসংখ্য রূপ। যেমন শিবের একটি রূপ হলো কালী। ফলে যিনিই ব্রহ্ম তিনিই আবার বিষ্ণু, তিনিই শিব বা কালী। ফলে একই ঈশ্বর ভিন্ন ভিন্ন নামে ভক্তের কাছে উপস্থিত হন। হিন্দু ধর্ম যে অদ্বৈতবাদী ধর্ম সে সম্পর্কে বলতে গিয়ে আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেন-"দেবতাকে কেন্দ্র করিয়া যে বৈদিক ধর্মের অভ্যুদয় হইয়াছে তাহা প্রথমতঃ নানা দেবতাবাদ স্বীকার করিলেও পরিণামে বৈদিক বহু-দেবতাবাদ

---

[১৯] "ভয় করিও না, হে মানবাত্মা," 'শেষ সওগাত,' নর ৬ষ্ঠ, পৃ. ৭৩।

[২০] জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়, "সভ্যতার বিবর্তনে ধর্ম", অন্তর্গত, মোহাম্মদ আবদুল হাইসম্পা.,*বাঙালির ধর্মচিন্তা*(ঢাকা:সূচীপত্র, ২০১৪), পৃ. ১২৯।

[২১] গোবিন্দচন্দ্র দেব, তত্ত্ববিদ্যা-সার, পৃ. ২০৮।

[২২] ঋগ্বেদ: ১:১৬৪:৪৬। দ্র. রমেশ চন্দ্র দত্ত, *ঋকবেদ* (কলকাতা:হরফ প্রকাশনী, ১৯৭৬), পৃ. ৫৪।

[23] Chad Meister, *Introducing Philosophy of Religion* (London: Routledge, 2009), p. 46.

[২৪] ঋগ্বেদ, ৮:১:১।

এক-দেবতাবাদেই পর্যবসিত হইয়াছে।"[২৫]বিখ্যাত হিন্দু দার্শনিক রামানুজও (১০১৭-১১৩৭) অদ্বৈতবাদী ছিলেন। *ঋগ্বেদে* দেবতার কথা ৩৩টি থাকলেও কবি, ভক্ত ও ঠাকুরাণী, দিদিগণের গল্পে গল্পে তা তেত্রিশ কোটি হয়েছে বলে বঙ্কিম মনে করেন।[২৬]হিন্দু ধর্ম একেশ্বরবাদী হলেও অসংখ্য দেবতার উৎপত্তি কিভাবে হলো সে সম্পর্কে বঙ্কিমের মত হলো, প্রথমে জড়োপাসনা করা হতো, তখন জড়কে চৈতন্যবিশিষ্ট বিবেচনা করা হতো। কিন্তু জাগতিক সকল ব্যাপার নিয়মাধীন হওয়ায় এর পেছনে একজন সর্বনিয়ন্তা পাওয়া যায়। তিনিই ঈশ্বর। কিন্তু এতদিন যে সকল জড়কে চেতনসত্তা হিসেবে উপাসনা করা হতো ভক্তরা ঈশ্বরকে স্বীকার করলেও তাদের উপাসনা লোপ পায় না। তাদেরকে সেই সর্বস্রষ্টা ঈশ্বর কর্তৃক চৈতন্য এবং বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত বলে উপাসিত হতে থাকে।[২৭]বহু দেব-দেবীতে উপাসনা করার ব্যাপারে *আয়ুর্বেদের* বিধি-নিষেধ হলো-"তারাই অন্ধকারে প্রবেশ করে যারা প্রাকৃতিক বস্তুর উপাসনা করে; যেমন বায়ু, পানি, আগুন ইত্যাদি। তারা গভীর অন্ধকারে ডুবে যারা 'শম্ভূতির' উপাসনা করে।"[২৮]*গীতাতেও* বলা হয়েছে "ঈশ্বর ভিন্ন অন্য দেবতা নাই। যে অন্যদেবতাকে ভজনা করে সে অবিধিপূর্বক ঈশ্বরকেই ভজনা করে"[২৯]।

এভাবে বেদ, রামায়ণ, পুরাণ আর মহাভারতের সর্বত্র কেবল একই ঈশ্বরের জয় কীর্তন করা হয়েছে। দেবতাদের প্রাকৃতিক অনন্তকার্যে পরম্পরাকে লক্ষ করে বেদের ঋষিগণও স্বীকার করতে বাধ্য হন যে, ঈশ্বর বহু নয়-এক ও অভিন্ন। গীতায় বলা হয়েছে "তাই পরমেশ্বর থেকে উচ্চতর আর দ্বিতীয় কোনো সত্তা নেই। তিনি সর্বময় ও সকলের কর্তা। একটি মালার মধ্যে যেমন অসংখ্য মণিমুক্তা একই সুতায় গাঁথা থাকে, নিখিল ভুবনের সবকিছুই তেমনি পরমেশ্বরের মধ্যে গ্রথিত রয়েছে।"[৩০]

ইসলাম একেশ্বরবাদী ধর্ম। স্রষ্টার পরিচয় সম্পর্কে *আল কোরআনে* বলা হয়েছে-"বল তিনি (আল্লাহ) এক ও অদ্বিতীয়, অনাদী, অনপেক্ষ; তিনি কাউকে জন্ম দেন না, নিজেও জাত নন, তাঁর সদৃশ আর কেউ নেই"।[৩১] তিনি শুধু আদি কারণই নন বরং তিনি পরম স্রষ্টা, পরম নিয়ন্তা। ইসলামে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করতে নিষেধ করা হয়েছে। কেউ যদি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করে, তাহলে তার কোনো ক্ষমা নেই, সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। ইসলামে আল্লাহর ৯৯টি গুনবাচক নাম আছে। তাঁর যে কোনো একটি দ্বারা আল্লাহকে ডাকলে তিনি সাড়া দেন।

---

[২৫] শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বেদান্তদর্শন অদ্বৈতবাদ*, ১ম খণ্ড (কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০১৬), পৃ. ৫৩।
[২৬] বঙ্কিচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, "বেদের দেবতা,"*বাঙালির ধর্মচিন্তা*, পৃ. ২১৭।
[২৭] তদেব, পৃ. ২১৯।
[২৮] আয়ুর্বেদ, ৪০:৯। (শম্ভূতি হলো সৃষ্ট বস্তু যেমন চেয়ার, টেবিল, প্রতিমা ইত্যাদি)।
[২৯] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "ধর্মের সরল আদর্শ,"*বাঙালির ধর্মচিন্তা*, পৃ. ২৩৬।
[৩০] এম. মতিউর রহমান, *ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃতি*(ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০১৬), পৃ. ১৬২।
[৩১] আল কোরআন, ১১২:১-৪।

সেমিটিক ধর্মসমূহ একত্ববাদী হলেও খ্রিষ্টধর্মে 'ত্রিত্ববাদ' বা তিন খোদার সমষ্টির ধারণা প্রচলিত আছে। তিন খোদার আকিদা একেশ্বরবাদিতার পরিপন্থি হওয়ায় আলফ্রেড এ গার্ভ খ্রিষ্টধর্মের সংজ্ঞায় 'তিনে মিলে এক এবং একে তিন' ধারণা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ত্রিত্ববাদের মধ্যে একেশ্বরবাদ রক্ষা হয় বলে দেখানোর চেষ্টা করেন। এটাকে তারা নাম দিয়েছেন *ত্রিত্বের একত্ব*।[৩২]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, পৃথিবীতে বিদ্যমান প্রচলিত প্রায় প্রতিটি আস্তিক ধর্মেই জগতের স্রষ্টারূপে এক শক্তিকে স্বীকার করেছে। এই শক্তিকে ঈশ্বর, ভগবান, আল্লাহ, খোদা, গড প্রভৃতি নামে ডাকা হয়। তিনি সবার কাছে সমান এবং কারও একার নন। তিনি আমাদের শুধু স্রষ্টাই নন, রক্ষাকারী এবং ত্রাণকর্তা।[৩৩]নজরুল মনে করেন যে, ঈশ্বরকে যে নামেই ডাকা হোক না কেন তিনি পূজারীর ডাকে নিশ্চয় সাড়া দেন। তিনি বলেন-

সাড়া দেন তিনি এখানে তাঁহারে যে নামে যে কেহ ডাকে
যেমন ডাকিয়া সাড়া পায় শিশু যে নামে ডাকে সে মা'কে![৩৪]

অন্যত্র তিনি বলেন-

তোমারে কত নামে হায় ডাকিছে বিশ্ব শিশু প্রায়,
কতভাবে পূজে তোমায় ফেরেশতা হুর পরী ইনসান ॥[৩৫]

নজরুল মনে করেন ঈশ্বর সব ধর্মের মর্ম বোঝেন। তাই তাকে যে নামেই ডাকা হোক না কেন, যে রীতিতেই শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হোক না কেন, তিনি তা বুঝতে পারেন। নজরুল বলেন-

একের লীলা এ, দুজন নাই
তাঁহারি সৃষ্ট সবাই ভাই,
কত নামে ডাকি–সর্বনাম এক তিনি,
তাঁরে চিনি নাকো, নিজেরে তাই নাহি চিনি।[৩৬]

নজরুল শ্যামা, কালী, ভগবান, আল্লাহ, সুন্দর সকলকে এক করে দেখেছেন। 'কোরবানি' কবিতায় প্রশ্ন করেন '**রহমান কি রুদ্র নন?**' এরপরও যারা আল্লাহ ও ভগবানের মধ্যে পার্থক্য করেন তাদেরকে নজরুল পাগল বলে সম্বোধন করেন। নজরুল বলেন-"পাগলা তারা, আল্লা ও ভগবানে ভাবে ভিন্ন যারা।"[৩৭] আবার 'পুতুলের বিয়ে' নাটকে কমলি ও টুলির সংলাপের মাধ্যমে নজরুল বলেন- "ওদের আল্লাও যা, আমাদের ভগবানও তা"। একেশ্বরের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন-

---

[৩২] মোঃ আককাছ আলী, "ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ: একটি ঐতিহাসিক ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ"(পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, আরবি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়), পৃ. ৫১।

[৩৩] আজিজুন্নহার ইসলাম ও কাজী নূরুল ইসলাম, *তুলনামূলক ধর্ম নৈতিকতা ও মানবকল্যাণ* (ঢাকা: সংবেদ, ২০১৬), পৃ. ৫৪।

[৩৪] "সাম্য," 'সাম্যবাদী,' নর ২য়, পৃ. ৯৩।

[৩৫] "গুল্-বাগিচা,"নর ৫ম, পৃ. ২৭৯।

[৩৬] "নতুন চাঁদ,"নর ৬ষ্ঠ, পৃ. ৪।

[৩৭] "সুর-সাকী," নর ৪র্থ, পৃ. ২৭৩।

"লায়লির প্রেমে মজনুঁ পাগল/ আমি পাগল 'লা-ইলা'র"। নজরুলের মতে, ধর্মানুসারীরা যে নামেই তাঁকে ডাকুক না কেন তিনি তুষ্ট হন, কেননা ঈশ্বর হিন্দুরও নন মুসলমানেরও নন। তাই নজরুল ধর্মের বেলায় তাঁর একটাই ভরসা, আর সেটি হলো যে, ভক্তের দল বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত হলেও স্বয়ং ঈশ্বর কোনো দলের নয় বরং তিনি সকলের। নজরুলের ভাষায়-

> নারায়ণের গদা আর আল্লার তলোয়ার কোনো দিনই ঠোকাঠুকি বাঁধবে না, কারণ তাঁরা দুজনেই এক, তাঁর এক হাতের অস্ত্র তাঁরই আর এক হাতের ওপর পড়বে না। তিনি সর্বনাম, সকল নাম গিয়ে মিশেছে ওঁর মধ্যে। এত মারামারির মধ্যে এইটুকুই ভরসার কথা যে, আল্লা ওর্ফে নারায়ণ হিন্দুও নন মুসলমানও নন।[৩৮]

কালী পূজা করেছেন, শ্যামা সংগীত রচনা করেছেন বলে যারা নজরুলের ধর্মবিশ্বাস নিয়ে প্রশ্ন তোলেন, বলা যায় তারা নজরুলকে খণ্ডিতভাবে মূল্যায়ন করেছেন। নজরুল যেহেতু বিশ্বাস করতেন ঈশ্বরকে যে নামেই ডাকা হোক তিনি সাড়া দিবেন, সেহেতু তিনি একই সত্তা, যিনি আল্লাহ, তিনিই ঈশ্বর। এ থেকে এটা সহজেই অনুমেয় যে, নজরুল একেশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন এবং তাঁরই উদ্দেশ্য প্রার্থনা নিবেদন করেছেন। তিনি মাজার, মসজিদ, দরগার পাশাপাশি মন্দিরেও পরম প্রভুর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেছেন। তিনি মনে করতেন এই পৃথিবীর একমাত্র অধিপতি হলেন আল্লাহ। আল্লাহ ব্যতিরেকে যারা অধিপতিত্ব দাবী করবে নজরুল তাদের 'শয়তান'বলেছেন। নজরুল মনে করেন তাদের প্রতিহত করে আল্লাহর রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তিনি বলেন- "এই পৃথিবীর রাজরাজেশ্বর একমাত্র আল্লাহ। যারা এই পৃথিবীতে নিজেদের রাজত্বের দাবী করে তারা শয়তান। সে শয়তানদের সংহার করে আমরা আল্লার রাজত্বের প্রতিষ্ঠা করব।"[৩৯]অন্যত্র নজরুল বলেন-

> এক সে স্রষ্টা সব সৃষ্টির এক সে পরম প্রভু
> একের অধিক স্রষ্টা কোনো সে ধর্ম কহে না কভু।
> তবু অজ্ঞানে যদি শয়তানে শরিকী স্বত্ব আনে,
> তার বিচারক এক সে আল্লা–লিখিত আল-কোরানে।[৪০]

নজরুল সকল ভেদাভেদ ভুলে একেশ্বরের ইবাদত করতে বলেন এবং তিনি মনে করেনভারতে হিন্দু-মুসলমানরা এক ঈশ্বরকে বিভিন্ন নামে পৃথক করে এবং তাঁর সৃষ্টির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার কারণেই মার খাচ্ছে। ভারতের ক্ষুধা-দারিদ্র, অত্যাচার-উৎপীড়নের মূল কারণও এটা। 'লক্ষ্যভ্রষ্ট' প্রবন্ধে নজরুল বলেন-

> ভারতবাসী হিন্দু-মুসলমান আজ দৃষ্টি-বিভ্রান্ত, তাই অন্ধের মতো এক আল্লার সৃষ্টি হইয়াও পরস্পরে দ্বন্দ্ব-কলহ করিয়া আত্মহত্যা করিতেছে। নিত্যপূর্ণ পরম অভেদ যিনি, তাঁহার সৃষ্টিতে ভেদ সৃষ্টি করিয়া ইহারা তাঁহার ক্রোধভাজন হইয়াছে। তাই ভারতে এত দারিদ্র্য, এত ব্যাধি,

[৩৮] "হিন্দু-মুসলমান," 'রুদ্র-মঙ্গল,' নর ২য়, পৃ. ৪৩৭।
[৩৯] "আমার লীগ কংগ্রেস," নর ৭ম, পৃ. ৬৩।
[৪০] "গোঁড়ামি ধর্ম নয়," 'শেষ সওগাত,' নর ৬ষ্ঠ, পৃ. ১০৮।

এত ক্লৈব্য, এত ভয়, এত বিদ্বেষ, এত হানাহানি, এত উৎপীড়ন। তাই এই পরাধীনতার অভিশাপ। যতদিন ভারত একমেবদ্বিতীয়মকে ত্যাগ করিয়া তাঁহার শক্তি বা অংশের পূজা করিবে, ততদিন সে এই অভিশাপ হইতে মুক্ত হইবে না। যিনি ব্যক্ত-অব্যক্ত সর্ব সৃষ্টি স্থিতি সংহারের, সর্বশক্তির একমাত্র পূর্ণ পরম অধীশ্বর–তাহাকে ছাড়া আর কোনো শক্তিকে, কোনো দেবতাকে বা আর কাহাকেও পূজা করার অজ্ঞনতামুক্ত না হওয়া পর্যন্ত, পৃথিবীর মানুষ লঞ্ছনা, পীড়ন, শাস্তি মুক্ত হইবে না। ততদিন পৃথিবীতে শান্তি, সর্বজনীন ভ্রাতৃত্ব আসিবে না।[৪১]

নজরুলের অভিমত হলো যে, যারা যুক্তি দিয়ে ঈশ্বরের বহুত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করতে চায় তাদের আর একত্ববাদের লড়াইয়ে একত্ববাদেরই জয় হবে। কেননা ঈশ্বর সর্বশক্তিমান ও মহাপরাক্রমশালী। এক ঈশ্বরের মন্ত্রেই সকল অসাম্য দূর হবে বলে নজরুল মনে করেন। তিনি বলেন-

তৌহিদ আর বহুত্ববাদে বেঁধেছে আজিকে মহা-সমর,
লা-শরিক 'এক' হবে জয়ী ... কহিছে 'আল্লাহু-আকবর'।
জাতিতে জাতিতে মানুষে মানুষে অন্ধকারের এ ভেদ-জ্ঞান,
অভেদ 'আহাদ'-মন্ত্রে টুটিবে, সকলে হইবে এক সমান।[৪২]

দ্বি-ঈশ্বরবাদের প্রতিক্রিয়ায় নজরুলের একেশ্বরবাদ

ঈশ্বর বিশ্বাসীদের মতে, ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান এবং মহান। কিন্তু যারা একেশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না তারা *অশুভের সমস্যার*[৪৩] মাধ্যমে ঈশ্বরের সর্বজ্ঞতা, সর্বশক্তিমানতা ও মহানুভবতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেন। গ্রিক দার্শনিক এপিকিউরাসের (খ্রিস্টপূর্ব ৩৪১-২৭০) চিন্তাতে অশুভের সমস্যা প্রথম দেখা যায়। আর জন স্টুয়ার্ট মিল, এফ. এইচ. ব্রাডলিসহ অন্য অনেক দার্শনিক একই সাথে ঈশ্বরের পরম শুভ, সর্বশক্তিমত্তা, সর্বজ্ঞতার পাশাপাশি অশুভের উপস্থিতিকে স্ববিরোধী হিসেবে দেখেছেন।[৪৪] সংশয়বাদী দার্শনিক ডেভিড হিউম এ সম্পর্কে বলেন-"ঈশ্বর অশুভকে প্রতিরোধ করতে ইচ্ছুক, তবে কি তিনি সক্ষম নন? তাহলে তিনি শক্তিহীন। যদি তিনি প্রতিহত করতে সক্ষম হন, কিন্তু তাহলে কি তিনি প্রতিহত করত ইচ্ছুক নন? তাহলে তিনি অমঙ্গলকর। যদি তিনি একই সাথে অশুভকে দমন করতে ইচ্ছুক ও সক্ষম উভয়ই হন তাহলে কেন অশুভ বিদ্যমান?"[৪৫] এ মতে, ঈশ্বর যদি মহান হন তাহলে তিনি তাঁর সৃষ্টির মঙ্গল কামনা করবেন, যদি সর্বজ্ঞ হন তাহলে অশুভের উৎস সম্পর্কে তিনি জ্ঞাত হবেন, যদি সর্বশক্তিমান হন তাহলে

[৪১] "লক্ষ্যভ্রষ্ট," নর ৯ম, পৃ. ৩০০।

[৪২] "অগ্রন্থিত কবিতা,"নর ৯ম, পৃ. ১১৬।

[৪৩] John H. Hick, Philosophy of Religion, 39-41.

[৪৪] Alvin Plantinga, God, Freedom, and Evil, 11.

[45] "Is [God] willing to prevent evil, but not able? Then he is impotent. Is he able, but not willing? Then he is malevolent. Is he both able and willing? Whence then is evil?" see. David Hume, *Dialogue Concerning Natural Religion* (Hackett: Indianapolis IN, 1988), p. 63.

তিনি অশুভকে প্রতিহত করতে সক্ষম হবেন। অশুভের বিনাশ হবে এবং শুভের প্রতিষ্ঠা হবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে, পৃথিবীতে যুদ্ধ-বিগ্রহ, মারামারি, খুন, রাহাজানি, লুণ্ঠন, অন্যায়, নিষ্ঠুরতা, অমানবিক আচরণ প্রভৃতি *নৈতিক* অশুভ এবং আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, খরা, বন্যা, মহামারি প্রভৃতি *প্রাকৃতিক* অশুভ লেগেই আছে।[৪৬] উপরন্তু যারা অসৎ তারাই দাপটের সাথে বেঁচে আছে, এবং সৎ ব্যক্তিরা তাদের ভয়ে তটস্থ হয়ে থাকে।

দ্বি-ঈশ্বরবাদের উপস্থিতি লক্ষ করা যায় জরথুস্ত্রবাদে। অশুভের সমস্যা আলোচনার মাধ্যমে এই মতবাদে বিশ্বাসীগণ দেখান যে, প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের সংখ্যা এক নয় বরং দুই। একটি হলো *আহুরা মাজদা* বা শুভের ঈশ্বর আর অন্যটি *আহ্‌রিমান* বা অশুভের ঈশ্বর। এই দুই ঈশ্বর সর্বদা দ্বন্দ্বে লিপ্ত। যিনি শুভের ঈশ্বর তিনি চান যে সর্বদা শুভ প্রতিষ্ঠিত হোক, আর যিনি অশুভের ঈশ্বর তিনি চান পৃথিবীতে অশুভের জয় হোক। প্রশ্ন হলো তাহলে জগতের এই নিয়ম-শৃঙ্খলা কিভাবে বিরাজ করে। এর উত্তরে তাঁরা বলেন যে, দুই ঈশ্বরের প্রতিযোগিতার মাঝ দিয়ে পৃথিবী তার সাম্যাবস্থা বিরাজ করে থাকে। এভাবে তারা একেশ্বরবাদের বিরোধিতা করেন। আবার একদল পৃথিবীতে ঈশ্বরের সর্বশক্তিমত্তা, সর্বজ্ঞতা ও সর্বকল্যাণদাতা হওয়া সত্ত্বেও অশুভের উপস্থিতি দেখে ঈশ্বরের অস্তিত্বেরই বিরোধিতা করেন। তাদের যুক্তি- "ঈশ্বর যদি অস্তিত্বশীল হন, তিনি সর্বশক্তিমান ও নৈতিকভাবে পূর্ণ হবেন। একজন সর্বশক্তিমান ও নৈতিকভাবে পূর্ণ সত্তা কখনো অশুভকে অস্তিত্বশীল হওয়ার অনুমতি দিবেন না। কিন্তু আমরা অশুভকে প্রত্যক্ষ করছি। সুতরাং ঈশ্বর অস্তিত্বশীল নন।"[৪৭]

ঈশ্বরে অবিশ্বাসীদের এই সকল যুক্তি যারা মেনে নিতে নারাজ তাদের মধ্যে স্টোয়িক মত উল্লেখযোগ্য। তাঁদের মতে, জগৎসংসার পরমেশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট এবং এ জন্যই তা এক কল্যাণকর মহৎ উদ্দেশ্যের অভিব্যক্তিস্বরূপ। আমিনুল ইসলাম এ প্রসঙ্গে বলেন যে, স্টোয়িকরা তাঁদের মত প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে নঞর্থক ও সদর্থক এই দুই ধরনের যুক্তি দেন। নঞর্থক যুক্তিতে তাঁরা অশুভের অস্তিত্বকে অস্বীকার করেন। এ মতে, পৃথিবী শুভ ও পূর্ণ। পৃথিবীতে যে সব জিনিসকে অশুভ বলে মনে হয় আসলে সেগুলো আপেক্ষিক অর্থেই অশুভ। 'বাদ্যযন্ত্রের একটি তার বেসুরো হলেও তা যেমন গোটা ঐক্যতানকে নষ্ট না করে অধিকতর শ্রুতিমধুর করে তোলে তেমনি অশুভের সমাবেশে সুখের মাধুর্যও বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। সদর্থক মতে, রোগ-শোক, দুঃখ-বেদনা, আধি-ব্যাধি, দুর্ভিক্ষ-দারিদ্র প্রভৃতি অশুভ প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার অপরিহার্য ফলশ্রুতি এবং শুভ অর্জনের প্রয়োজনীয় উপায়। অন্ধকার আছে বলেই আলোর এতো কদর, দুঃখ আছে বলেই সুখের এতো চাহিদা।

---

[৪৬] John H. Hick, *Evil and the God of Love*(London: Palgrane Macmillan, 2010), p. 12.

[47] "If God existed, he would be all-powerful and morally perfect. An all-powerful and morally perfect being would not allow evil to exist. But we observe evil. Hence, God does not exist." see at. Peter van Inwagen, "The Problem of Evil", in *The Oxford Handbook of Philosophy of Religion*.p. 188.

অশুভের উপস্থিতি শুভের শক্তি ও পরিমাণ বৃদ্ধি করে এবং সর্বোচ্চ ও সর্বাধিক শুভ অর্জনের পথ সুগম করে। না পাওয়ার বেদনা না থাকলে পাওয়ার আনন্দ উপভোগ্য হয় না।[৪৮] তবে জন ম্যাকি তাঁর *Evil and Omnipotence*প্রবন্ধে ঈশ্বর ও অশুভের উপস্থিতিকে অযৌক্তিক ও অসংগতি হিসেবে দেখেছেন।[৪৯] সমকালে এসে রিচার্ড ডকিন্স তাঁর *The God Delusion*গ্রন্থে ঈশ্বরকে বিভ্রম বলে প্রমাণ করতে চেয়েছেন। কিন্তু এরিক রেইটানতাঁর *Is God a Delusion: A Reply to Religion's Cultured Despisers*গ্রন্থে ডকিন্সের যুক্তি খণ্ডন করে দেখিয়েছেন যে, ঈশ্বর সর্বশক্তিমান হলেও মানুষকে স্বকীয় মূল্যে স্বাধীন করে সৃষ্টি করে তার উপরে কিছু দায়-দায়িত্ব দিয়েছেন।[৫০] ফলে ব্যক্তির যেহেতু কর্মের স্বাধীনতা রয়েছে, সেহেতু সকল অপরাধের (নৈতিক অশুভ) দায় ঈশ্বরের উপর বর্তায় না। আর *প্রাকৃতিক অশুভকে* অশুভ মনে করলেও এর মধ্যে রয়েছে শুভের উপায়। আপাতদৃষ্টিতে মানুষ যেটাকে অশুভ মনে করে হয়তো তার মধ্যেই রয়েছে তার জন্য মঙ্গল। কেননা ঈশ্বরের মধ্যে অমঙ্গল থাকতে পারে না। সকল প্রাকৃতিক দুর্ঘটনার মধ্যে যে শুভ থাকে তা আজকের বিজ্ঞানের যুগে দিনকে দিন পরিষ্কার হচ্ছে। আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কারের ফলে মানুষ জানতে পেরেছে যে, বন্যা মানুষের সাময়িক ক্ষতি করলেও ভূমিতে যে পলি রেখে যায় তার দরুন পরবর্তিতে তার দ্বিগুণ ফসল উৎপন্ন হয়। বজ্রপাত-অগ্ন্যুৎপাতের ফলে ভূ-গর্ভস্থ তাপমাত্রার সাথে ভূ-পৃষ্ঠের তাপমাত্রার ভারসাম্য রক্ষিত হয়। তাছাড়া অনেক দার্শনিক আবার প্রাকৃতিক অশুভকে ঈশ্বর কর্তৃক মানুষের অপরাধের শাস্তি হিসেবে দেখতে চান। কাজী নজরুল ইসলামও জগতের দুঃখ-বেদনা, মারামারি, হানাহানি, নিরাপরাধের শাস্তি আর অপরাধীর পুরস্কার দেখে বিস্মিত হন। তিনি ঈশ্বরকে মানেন ন্যায়ের কর্তা ও মঙ্গলময় সত্তা হিসেবে। তাই তাঁর জিজ্ঞাসা মহাপ্রভুর নিকট এই জগতের দুঃখ ও অশান্তি নিয়ে। যুদ্ধে বোমার আঘাতে দারা অন্ধ ও বধির হয়ে গেলে সয়ফুল্-মুল্কের জিজ্ঞাসা-

> আচ্ছা করুণাময়, তোমার লীলা আমরা বুঝতে পারিনে বটে, কি এই যে নিরপরাধ যুবকের চোখ দুটো বোমার আগুনে অন্ধ আর কান দুটো বধির করে দিলে, আর আমার মত পাপী শয়তানের গায়ে এতটুকু আঁচড় লাগল না, এতেও কি বলব যে, তোমার মঙ্গল–ইচ্ছা লুকানো রয়েছে ? ... ওগো ন্যায়ের কর্তা ! এই কি আমার দন্ড,– এই বিশ্বব্যাপী অশান্তি ?[৫১]

কিন্তু সয়ফুল্-মুল্কের জিজ্ঞাসার শেষ অংশেই নজরুল তাঁর বক্তব্যের উত্তর দিয়ে দিলেন। সয়ফুল্-মুল্কের মনে যে পাপবোধ তুষের আগুনের ন্যায় দহন করছে তাই তার শাস্তি। কাজেই ন্যায়ের কর্তা হিসেবে ঈশ্বর প্রত্যেকের কর্মফল প্রদান করেন। 'দারার কথা' গল্পে নজরুল ঈশ্বরের এই মঙ্গলেচ্ছা নিয়ে আলোচনা করেছেন। সেখানে তিনি দেখিয়েছেন যে গল্পের নায়ক দারা তার

---

[৪৮] আমিনুল ইসলাম, জগৎ জীবন দর্শন, পৃ. ৩২০।

[49] John Mackie, "Evil and Ommpotence", in Basil Mitchell, ed., *The Philosophy of Religion*(London:Oxford University Press, 1971), p. 92.

[50] Eric Reitan, *Is God Delusion: A Reply to Religion's Cultured Despisers* (West Susex: Wiley-Black well, 2009), p. 190.

[৫১] "ব্যথার দান," নর **১**ম, পৃ. **১৯৮**।

প্রেমিকা কর্তৃক আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে যুদ্ধে যায়। প্রাণপণে যুদ্ধ করা অবস্থায় বোমার আঘাতে অন্ধ ও বধির হয়ে যায়। খলনায়ক চরিত্রে থাকা সয়ফুল্ মুলক্ তাঁর ভুল বুঝতে পেরে সেও যুদ্ধে যায়। কিন্তু সে সুস্থ থাকে। সয়ফুল্–মুলক্রে মনে ন্যায়ের কর্তা হিসেবে ঈশ্বরের ন্যায়বিচার নিয়ে প্রশ্ন উঠলে পরক্ষণেই সে বুঝতে পারে তার মনে অপরাধের যে অনুশোচনা, সেটাই তার অপরাধের শাস্তি। অন্যদিকে দারা অন্ধ হলেও কবি তার ভেতরেও দেখছেন মঙ্গল। তাঁর মতে অশুভের মাঝেও শুভের অবস্থান। তা কেবল অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিগণই বোঝেন। দারাকে উদ্দেশ্য করে সয়ফুল্-মুল্কের প্রশ্ন ও দারার উত্তরের মাধ্যমে নজরুল সেই দিকটিকেই ফুটিয়ে তুলেছেন। কবির ভাষায়-

> হাঁ ভাই, এই যে তুমি অন্ধ আর বধির হয়ে গেলে, এতে মঙ্গলময়ের কোন মঙ্গলের আভাস পাচ্ছ কি?
>
> সে বললে, – ওরে বোকা, এই যে তোদের আজ ক্ষমা করতে পেরেছি– এই যে আমার মনের সব ক্লেদ–মুছে সাফ হয়ে গিয়েছে, সে এই অন্ধ হয়েছি বলেই তো, – এই বাইরের চোখ দুটোকে কানা করে আর শ্রবণ দুটোকে বধির করেই তো ! অন্ধেরও একটা দৃষ্টি আছে, সে হচ্ছে অন্তর্দৃষ্টি যা অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি ![৫২]

আবার তিনি বলেন- "সংসারের যেটুকু কাজ মহামায়া করিয়ে নিচ্ছেন, তা সে ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা আর আমার পাপের ভোগ ও প্রায়শ্চিত্ত।"[৫৩]অশুভকে ঈশ্বর প্রদত্ত শাস্তি হিসেবে দেখানো নজরুলের এই চিন্তার সাথে সেন্ট অগাস্টিনের মতের মিল লক্ষ করা যায়। সেন্ট অগাস্টিন জান্নাত হতে আদম ও হাওয়ার পতনের উদাহরণ টেনে বলেন যে, ঈশ্বর কর্তৃক ন্যায়সঙ্গতভাবে অপরাধের শাস্তিস্বরূপ অশুভের অস্তিত্ব রয়েছে।[৫৪] উদ্দেশ্য দুষ্টের দমন আর সৃষ্টের পালন। নজরুল মনে করেন ন্যায়ের প্রতীক ঈশ্বর ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে কোনো পক্ষপাত করেন না। জগতে যারাই অশুভ বা অনাসৃষ্টি করে ঈশ্বর তাকেই শাস্তি দেন। নজরুল বলেন-

> হউক হিন্দু, হোক ক্রিশ্চান, হোক সে মুসলমান,
> ক্ষমা নাই তার, যে আনে তাহার ধরায় অকল্যাণ!"।

অশুভের সমস্যার মাধ্যমে নাস্তিকরা বলেন যে, ঈশ্বর যদি মঙ্গলময় সত্তা হবেন তাহলে তিনি কোন্ কারণে অশুভকে অনুমোদন দিলেন? বনের ভয়ঙ্কর আগুনে হরিণশিশুর পুড়ে যাওয়া, নববর্ষের দিনে পাঁচ বছর বয়সের শিশু অপহৃত, ধর্ষিত ও শ্বাসরোধে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়ার মতো ভয়ঙ্কর কিছু অশুভের উদাহরণ টেনে উইলিয়াম এল. র প্রমাণ করতে চান যে, কেন সর্বশক্তিমান ঈশ্বর এ ধরনের অশুভকে অনুমোদন দিলেন? এর পেছনে তার কি মহৎ উদ্দেশ্য রয়েছে? আসলে

---

[৫২] তদেব, পৃ. ১৯৯।

[৫৩] "পত্রাবলী," নর ৯ম, পৃ. ২৫৬।

[54] Brian Davies, *An Introduction to the Philosophy of Religion*(Oxford: Oxford University Press,1993),p. 33.

সর্বশক্তিমান ঈশ্বর বলতে কিছুই নেই।[৫৫] এর উত্তরে আস্তিকরা বলেন যে, সম্ভবত ঈশ্বরের নিকট এর উপযুক্ত কারণ রয়েছে, কিন্তু সেই কারণ আমাদের বোঝার জন্য খুবই জটিল; অথবা তিনি অন্য কোনো বিশেষ কারণে তা প্রকাশ করেননি।[৫৬] নজরুলও মনে করেন আপাতদৃষ্টিতে যেটাকে আমরা অশুভ বলে মনে করি আসলে তার ভেতরেও রয়েছে ঈশ্বরের মঙ্গলেচ্ছা। তিনি পূর্ণতম সত্তা, ঘটনার পূর্বাপর সম্পর্কে তিনি অবগত। বেদৌরা কর্তৃক আঘাত প্রাপ্ত হয়ে দারার স্বগোতোক্তি-

> এই যে প্রাণ–প্রিয়তমের কাছ থেকে পাওয়া নিদারুণ আঘাত, এতেও নিশ্চয়ই খোদার মঙ্গলেচ্ছা নিহিত আছে! আমি কখনই ভুলব না খোদা, তুমি নিশ্চয় মহান আর তোমার দেওয়া সুখ–দুঃখ সব সমান ও মঙ্গলময়! তোমার কাছে অমঙ্গল থাকতে পারে না, আর তুমি ছাড়া ভবিষ্যতের খবর কেউ জানে না![৫৭]

গ্রিক দার্শনিক প্লেটো ঈশ্বরের মধ্যে অশুভ বা অমঙ্গল থাকতে পারে না বলে বিশ্বাস করতেন। 'রিপাবলিক' গ্রন্থে তিনি বলেছেন যে, দেবতারা অন্যায় ও অশুভের স্রষ্টা নন। অন্যায় ও অশুভের কারণ অন্যত্র খোঁজা দরকার।[৫৮] এমনকি তিনি ঈশ্বরকে মঙ্গলের ধারণার সাথে অভিন্ন মনে করতেন।[৫৯]টমাস একুইনাসও অশুভের অস্তিত্বকে স্বীকার করতে নারাজ। তিনি তথাকথিত অশুভকে মানব মনের ভ্রম বা মায়া হিসেবে দেখেছেন। তিনি বলেন- "পাপ, রোগ যাই হোক না কেন বস্তুগত দিক থেকে তাদেরকে বাস্তব বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তারা অবাস্তব।... এর সবকিছুই হলো নশ্বর মন ও শরীরের ভ্রম।"[৬০]নজরুল মনে করেন, অশুভ বা পাপ সব সময় খারাপ নয়। অনেক সময় পাপী দিয়েও মঙ্গল সংঘটিত হতে পারে। এজন্য মঙ্গলময় সত্তা হিসেবে ঈশ্বর পাপীকেও ঘৃণা করেন না। কবির ভাষায়- "খোদা, আজ আমি বুঝতে পারলুম, পাপীকেও তুমি ঘৃণা কর না, দয়া কর। তার জন্যেও সব পথই খোলা রেখে দিয়েছে। পাপীর জীবনেও দরকার আছে। তা দিয়েও মঙ্গলের সলতে জ্বালানো যায়। সে ঘৃণ্য অস্পৃশ্য নয় !"[৬১]

ঈশ্বরের করুণাময়তা ও মঙ্গলময়তা প্রমাণ করতে গিয়ে নজরুল মনে করেন স্রষ্টা বান্দার কোনো অমঙ্গল করেন না এবং তাঁর মধ্যে কোনো অমঙ্গল থাকতে পারে না। 'ঘুমের ঘোরে' আজহারের উক্তির মাধ্যমে তিনি তাঁর প্রমাণ দেন। তিনি বলেন-"–ভালই করেছ খোদা, তুমি

---

[৫৫]William L. Row, "Evil Is Evidence against Theistic Belief", *in*Michael L.Peterson and Raymond J. VanArragon eds., *Contemporary Debates in Philosophy of Religion*(Oxford: Blackwell Publishing Ltd, 2004), p. 5-6.

[56] Alvin Plantinga, *God, Freedom, and Evil,* 10.

[৫৭] "ব্যথার দান," নর **১**ম, পৃ. **১৯৫**।

[৫৮] আমিনুল ইসলাম, পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস, পৃ. ১৩০।

[৫৯] মোঃ আনিসুজ্জামান, "রবীন্দ্রনাথের সর্বেশ্বরবাদ," দর্শন ও প্রগতি, বর্ষ-৩৩, **১**ম ও ২য় সংখ্যা, ২০১৬, পৃ. ৭৫।

[60] "Sin, disease, whatever seems real to material sense, is unreal ... All inharmony of mortal mind or body is illusion, possessing neither reality nor identity though seeming to be real and identical."cited. Brian Davies, An Introduction to the Philosophy of Religion,p. 33.

[৬১]"ব্যথার দান," নর **১**ম, পৃ. **১৯৭**।

ভালই করেছ! প্রতি দিনের মতো আজ তাই বড় প্রাণ হতেই বলছি, –তুমি চির-মঙ্গলময়! আবার বলছি, –'তোমারই ইচ্ছা হউক পূর্ণ করুণাময় স্বামী!"[৬২] ঈশ্বরের মঙ্গলময়তা আরো প্রমাণিত হয় তিনি যখন ব্রিটিশ সরকারের আদালতে বিচারাধীন ছিলেন। তখন ঈশ্বর সাহস জোগাতে তাঁর পশ্চাতে এসে দাঁড়ান বলে তিনি উপলব্ধি করেন। নজরুল বলেন-"আমি জানি এবং দেখছি– আজ এই আদালতে আসামির কাঠগড়ায় একা আমি দাঁড়িয়ে নেই, আমার পশ্চাতে স্বয়ং সত্যসুন্দর ভগবানও দাঁড়িয়ে। যুগে যুগে তিনি এমনি নীরবে তাঁর রাজবন্দী সত্য-সৈনিকের পশ্চাতে এসে দণ্ডয়মান হন।"[৬৩]

'শূদ্রের মাঝে জাগিছে রুদ্র' কবিতাতেও নজরুল ঈশ্বরের মহানুভবতার চিত্র তুলে ধরেছেন। সেখানে তিনি দেখিয়েছেন যে, ঈশ্বর মানুষকে সেবিতে কখনো অত্যন্ত দীনবেশে সবারে অন্ন বিলায়, কখনো কৃষক সেজে হাল বয়, শ্রমিক হয়ে হীরক মানিক আহরণের জন্য মাটি খুঁড়ে, আবার কখনো বা মুটে কুলি সেজে সকলের বোঝা বয়ে দেয়, কখনো বা রাজমিস্ত্রি সেজে ইমারত নির্মাণ করে, কখনো বা মেথর সেজে, হাড়ি ডোম হয়ে পৃথিবীর সকল ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার করে, কখনো বা দ্বাররক্ষক হয়ে দ্বার রক্ষা করছে। কখনো মা হয়ে কোলে তোলে, পিতা হয়ে বুকে ধরে। কিন্তু মানুষ তাঁর এই করুণাময়তার দিকটি দেখতে পায় না। বাহিরের দুর্যোগ, মহামারী, বন্যা, খরা বা নিজেদের কষ্টটা শুধু দেখে কিন্তু এতে ঈশ্বর যে কতটা কষ্ট পান তা তারা দেখতে পায় না বলে নজরুল মনে করেন। অন্যত্র নজরুল বলেন-

তোমার আঘাত শুধু দেখল ওরা
দেখলনাকো তোমাকে।
দেখলনা হে করুণাময় তোমার
অশেষ ক্ষমাকে ॥[৬৪]

অবশ্য অসুরকে নজরুল শুধু অশুভ হিসেবে দেখতে নারাজ। তাঁর মতে অসুর যদি সুরের নিদ্রা ভেঙ্গে জাগাতে পারে তাহলে তাঁর দৃষ্টিতে অসুরই ভালো। যেমন তিনি বলেন- "সে অসুরের পায়ের ধুলো আমি মাথায় নিই, যে অসুর ভীরু দেবতাকে পদাঘাত ক'রে পৌরুষ শেখায়, তার লুপ্ত দেবত্বকে সিংহ বিক্রমে জাগিয়ে তোলে।"[৬৫] এখানে দেবতাকে নজরুল ব্যবহার করেছেন রূপক অর্থে। কিভাবে অসুর বা অশুভ শুভের কারণ হতে পারে তার বর্ণনা পাওয়া যায় 'ডায়ারের স্মৃতিস্তম্ভ' প্রবন্ধে। সেখানে কবি জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের মূল হোতা জেনারেল ডায়ারকে সাধুবাদ জানিয়েছেন এবং তার স্মৃতির স্মরণে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। কেননা জেনারেল ডায়ারের কারণেই ভারতের নিদ্রিত জাতি সকল প্রকার ছোঁয়াছুঁয়ির রাজনীতি ছেড়ে একটি প্লাটফর্মে এসে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছিলো এবং দেশমাতৃকার মুক্তি সংগ্রামের প্রশ্নে ঐক্যমতে

[৬২] "ঘুমের ঘোরে," 'ব্যথার দান,' নর ১ম, পৃ. ২৩২।
[৬৩] "রাজবন্দীর জবানবন্দী," নর ১ম, পৃ. ৪৩২।
[৬৪] "অগ্রন্থিত গান," নর ১১তম, পৃ. ২৫৯।
[৬৫] "মোরা সবাই স্বাধীন মোরা সবাই রাজা," 'দুর্দিনের যাত্রী,' নর ২য়, পৃ. ৪০৬।

পৌঁছতে পেরেছিলো। নজরুল মনে করেন, যখন মানুষের, জাতির, দেশের চরম অবনতি হয়, মানুষ তাঁর নিজের প্রকৃতিদত্ত অধিকারের কথা ভুলে যায়, শত বন্ধনের মাঝে তার জীবনের গতি-চাঞ্চল্য হারিয়ে ফেলে, মান-অপমান জ্ঞান থাকে না, প্রভুর দেওয়া দয়াকে গোলামের মতো মহাদান বলে গ্রহণ করে তখনই এরূপ নরপিশাচ জালিমের আবির্ভাব ঘটে। নজরুল এ জালিমরূপী ডায়ারকে আহ্বান করেন এজন্য যে, তিনি মনে করেন বাঙালির মতো মুমূর্ষু জাতিকে চিরসজাগ রাখতে যুগে যুগে এমন জল্লাদ-কশাই এর আবির্ভাব মস্ত বড় মঙ্গলের কথা। জেনারেল ডায়ার কুকুরের মতো করে সেদিন যদি না মারত তবে বাঙালি অভিমান-ক্ষোভে গুমরে উঠতে পারতো না এবং দলিত সর্পের মতো গর্জে উঠতে পারতো না। তাই নজরুল ডায়ারকে দেখেছেন শুভের উপায় হিসেবে। ঈশ্বরের মঙ্গলেচ্ছা এভাবেই অশুভের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয় অনেক সময়। ঈশ্বর ইচ্ছা করলে ভারত এমনিতেই স্বাধীন হতো। তাহলে ভারতীয়দের গর্ব করার মতো কিছু থাকত না। ঈশ্বর চান তাঁর সৃষ্টি স্বমহিমায় মহিমান্বিত হোক। ভিখারির মতো হাত পেতে নয় নিজের অধিকার নিজে আদায় করে নিক।

তাছাড়া ঈশ্বরের যে সকল গুণাবলি বিদ্যমান তাঁর মধ্যে অন্যতম একটি হলো তিনি ধ্বংসকর্তা বা বিনাশকর্তা। তিনি সকল অপশক্তির বিনাশ ঘটাতে সক্ষম। জগতে যখনই কোন অকল্যাণ, অশুভ, দুর্যোগ প্রভৃতির আগমন ঘটে তখনই তিনি তা দূর করেন এবং জগতে স্থিতিশীলতা আনয়ন করেন।নজরুলও ঈশ্বরকে মনে করতেন অশুভ শক্তির বিনাশকারক হিসেবে। তিনি মনে করেন অত্যাচারীর অত্যাচারের ফলে উৎপীড়িতের আর্তনাদ ও মজলুমের ফরিয়াদে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হলেও এর প্রতিবাদ করার জন্য যখন কোনো মানুষ এগিয়ে আসে না; অত্যাচারীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরে না; তখন আগমন ঘটে সেই সুরের বৈতালিকরূপ ধ্বংসকর্তার যিনি অসুরের বিনাশ করতে সক্ষম। কুৎসিত ও অসুন্দরকে নাশ করে সুন্দরের প্রতিষ্ঠার জন্য ঈশ্বরের নিকট নজরুলের প্রার্থনা-

> হে আমার ধ্বংসের দেবতা, একবার এই মহাপ্রলয়ের বুকে তোমার ফুলের হাসি দেখাও!স্তুপীকৃত শবের মাঝে শিবের জটার কচি শশী হেসে উঠুক! এই কুৎসিত অসুন্দর সৃষ্টিকে নাশ কর, নাশ কর হে সুন্দর রুদ্র-দেবতা!এই গলিত আর্ত সৃষ্টির প্রলয়-ভস্মটিকা পরে নবীন বেশে এসে দেখা দাও![৬৬]

অগ্নি-বীণা কাব্যের 'প্রলয়োল্লাস' কবিতায় ধ্বংস, প্রলয় দেখে নিরাশ তথা হতাশ না হওয়ার জন্য নজরুল আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি মনে করেন জগতের যাবতীয় অন্যায়, দুর্যোগ, ধ্বংস, প্রলয় এর অন্তরালে রয়েছে সৃষ্টির ইঙ্গিত। যা কিছু পুরাতন, অসুন্দর সে সকল কিছুকে ধ্বংস করা হয় নতুন করে সৃষ্টির জন্য। ভেঙ্গে নতুন করে গড়াই স্রষ্টার খেলা। অসুন্দরকে ভেঙ্গে নতুনভাবে

---

[৬৬] "রুদ্র-মঙ্গল", নর ২য়, পৃ. ৪১৯।

সৃষ্টি করার জন্যই প্রলয় সংঘঠিত করা হয়। কাজেই কাল ভয়ঙ্কররূপী সুন্দরের আগমনে তরুণদেরকে তিনি উল্লাস করার জন্য আহ্বান করেন।

এভাবে নজরুল তাঁর সাহিত্যের অসংখ্য জায়গায় অশুভের অস্তিত্বকে স্বীকার করেও অশুভকে শুভের উপায় হিসেবে চিত্রিত করেছেন। শুভের উপায় হিসেবে যে অশুভের অস্তিত্ব বিদ্যমান এই হলো নজরুলের মূল কথা। এদিক থেকে নজরুলের চিন্তার অনুরূপ চিন্তার প্রতিফলন রয়েছে জন হিক এর দর্শনে। তিনি মনে করেন যে, মানুষের পূর্ণাজ্ঞ বিকাশলাভের জন্য অশুভের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তাঁর মতে, ঈশ্বর মানুষকে অপরাধপ্রবণ করে তৈরি করেছেন, তবে অশুভকে দমন করার মতো সক্ষমতাও তাকে দেওয়া হয়েছে।[৬৭] কারণ মানুষকে স্বাধীন করে তৈরি করা হয়েছে। নজরুল অন্যান্য দার্শনিকদের ন্যায় অশুভের অস্তিত্বকে অস্বীকার না করে বরং এর অস্তিকে স্বীকার করেই স্রষ্টার অস্তিত্বকে শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড় করেছেন। সেন্ট অগাস্টিন, একুইনাস, প্রমুখ দার্শনিকগণের সাথে নজরুলও মনে করেন যে, অশুভকে পরম শুভ ঈশ্বর শুভের উপায় হিসেবে রেখেছেন।

নিরীশ্বরবাদের প্রতিক্রিয়ায় নজরুলের একেশ্বরবাদ

দর্শনের ইতিহাসে অধিবিদ্যার বিরোধিতায় ১৯২৮ সালে ভিয়েনায় 'ভিয়েনা সার্কেল' নামে একটি গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটে। তাঁরা সকল প্রত্যয়কে যুক্তির নিরিখে বিচার করতে চান। *সত্যপ্রতিপাদন নীতি*, *অসত্যকরণ*, *ছদ্মউক্তি* প্রভৃতির মাধ্যমে তারা দেখান যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণযোগ্য নয়।[৬৮] কিন্তু রুশো মনে করেন যে, যুক্তি দিয়ে নয়, বরং হৃদয় দিয়েই ঈশ্বরকে জানতে হবে, তার উপাসনা করতে হবে।।[৬৯] রুশোরও অনেক পূর্বে আল গাজালি মনে করতেন যে, যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে কখনই ঈশ্বরের অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব প্রকাশ করা সম্ভব নয়। আধ্যাত্মিকতার মাধ্যমেই কেবল তাঁর অনুমান করা সম্ভব।[৭০]ঈশ্বর অবিশ্বাসীদের উদ্দেশ্যে নজরুল বলেন ঈশ্বর এক, আর এই এক ঈশ্বরের বিশ্বাসেই কেবল মুক্তি। যারা তর্কের বা যুক্তির মাধ্যমে ধর্মের সকল বিধানকে ভুল প্রমাণিত করতে চায় তাদের উদ্দেশ্যে নজরুল বলেন যে, এতে করে তারা শুধুই দুঃখ পাবে। কেননা মহাবিশ্বের সৃষ্টি জটিলতায় নিজের অসহায়ত্ব প্রকাশিত হবে। ক্লান্ত হয়ে যাবে, কিন্তু সৃষ্টির কোনো ত্রুটি খুঁজে পাবে না। হতাশ হয়ে ফিরে আসবে, অথবা অন্তর্দাহে ছটফট করবে। ঈশ্বর তর্কাতীতভাবেই অস্তিত্বশীল। নজরুল বলেন-

তর্ক করে দুঃখ ছাড়া কী পেয়েছিস্ অবিশ্বাসী,
কী পাওয়া যায় দেখ্না বারেক হজরতে মোর ভালবাসি?[৭১]

---

[৬৭] Brian Davies, An Introduction to the Philosophy of Religion, p. 34.

[68] ibid, p. 2-5.

[৬৯] আমিনুল ইসলাম, *জগৎ জীবন দর্শন*, পৃ. ২৪৯।

[৭০] ক্যারেন আর্মস্ট্রং, *স্রষ্টার ইতিবৃত্তঃ ইহুদি, ক্রিশ্চান ও ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের স্রষ্টা সন্ধানের ৪,০০০ বছরের ইতিহাস*, অনু. শওকত হোসেন (ঢাকা: রোদেলা প্রকাশনী, সন অজ্ঞাত), পৃ. ২৫৩।

[৭১] "অগ্রন্থিত গান," নর ১০ম, পৃ. ২৩৭।

এটা ভাবা সঙ্গত না হলেও অস্বাভাবিক নয় যে, নজরুল ভিয়েনা সার্কেল সম্পর্কে জ্ঞাত হয়েছিলেন। কেননা অধিবিদ্যার বিরুদ্ধে যে একত্রিত প্রয়াস তার ধাক্কা নজরুলের নাস্তিক কমিউনিস্ট বন্ধুদের উপরে পড়ে নাই তা বলা যায় না। তাদের সম্মিলিত ধাক্কায় বিশ্বাসীদের তরণী কেঁপে উঠে। নজরুল বলেন-"আসে বিরুদ্ধশক্তি ভীষণ প্রলয়-তুফান লয়ে,/ কাঁপে তরণীর যাত্রীরা কেহ নিরাশায় কেহ ভয়ে।"তবে নজরুল মনে করেন আল্লাহর সৈনিক হিসেবে তাদের কোনো ভয় নেই। তিনি আরো বলেন-

> তাঁরি নাম লয়ে বলি, বিশ্বের অবিশ্বাসীরা শোনো,
> তাঁর সাথে ভাব হয় যার, তার অভাব থাকে না কোনো।
> তাঁহারি কৃপায় তাঁরে ভালোবেসে, বলে আমি চলে যাই,
> তাঁরে যে পেয়েছে, দুনিয়ায় তার কোনো চাওয়া-পাওয়া নাই।[৭২]

ঈশ্বরের গুণাবলি সম্পর্কে নজরুলের ভাবনা

ঈশ্বরের স্বরূপ আলোচনায় তাঁর গুণাবলি কেমন হবে তা নিয়ে দার্শনিকদের মধ্যে রয়েছে বিস্তর মতপার্থক্য। কেউ তাঁকে দেখেছেন চেতন সত্তা হিসেবে আবার কেউবা দেখেছেন অচেতন সত্তা হিসেবে। এরিস্টটল পরম উপাস্যকে দেখেছেন কালহীন এবং নিরাসক্ত হিসেবে; যিনি জাগতিক বিষয়ের প্রতি লক্ষ করেন না, ইতিহাসে নিজেকে প্রকাশ করেন না, বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেন নি এবং সময়ের শেষে বিচার করবেন না।[৭৩] আর প্রখ্যাত মুসলিম দার্শনিক ইবনে সিনা মনে করেন, কোরআন ও দার্শনিকদের দৃষ্টিতে ঈশ্বর একজন সরল সত্তা হওয়ায় তাঁকে বিভিন্ন অংশ বা গুণাবলি দ্বারা বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। ঈশ্বর সরল হওয়ায় তাঁর কোনো কারণ নেই, গুণাবলি নেই, সময়গত মাত্রা নেই, মানুষের চিন্তার অতীত, এবং অদ্বিতীয় সত্তা হওয়ায় পৃথিবীর কোনো কিছুর সাথেই তিনি তুলনীয় নন।[৭৪] বার্কলি ও হিউম থেকে শুরু করে বস্তুবাদী অধিকাংশ দার্শনিকরা ঈশ্বরের অস্তিত্বক স্বীকার করেন না। তারা মনে করেন ঈশ্বর থাকলেও আমরা তাঁকে জানতে পারি না। শেষোক্ত মতটির সমার্থক টমাস হবস। তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করলেও মনে করতেন যুক্তির মাধ্যমে ঈশ্বরের স্বরূপ জানা সম্ভব নয়। স্পিনোজা মনে করেন ঈশ্বর নির্বিশেষ ও নির্গুণ; কোনো গুণের সাহায্যেই ঈশ্বরের স্বরূপকে বোঝা যায় না। কিন্তু ভারতীয় দার্শনিক শঙ্কর মনে করেন ব্রহ্ম নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত, তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান; তিনি অবিনশ্বর, দোষমুক্ত।[৭৫] শঙ্করের এই উক্তির সমর্থন রয়েছে *আয়ুর্বেদের* একটি শ্লোকে। সেখানে বলা হয়েছে-"তিনি অদৃশ্য; প্রাজ্ঞ, পরিবেষ্ঠনকারী; তিনি স্বয়ম্ভু। তিনি যখন যা ইচ্ছা তাই করেন। তিনি চিরঞ্জীব।"[৭৬]আর আল-

---

[৭২] "ডুবিবে না আশা-তরী," 'শেষ সওগাত,' নর ৬ষ্ঠ, পৃ. ৯৩।

[৭৩] ক্যারেন আর্মস্ট্রং, *স্রষ্টার ইতিবৃত্ত:*,পৃ. ২৩০।

[৭৪] ক্যারেন আর্মস্ট্রং, *স্রষ্টার ইতিবৃত্ত:*,পৃ. ২৪৪।

[৭৫] সন্ধ্যা মল্লিক, "পরমসত্তা সম্পর্কে শঙ্কর ও ব্রাডলির দর্শনের তুলনামূলক বিশ্লেষণ" (পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, দর্শন বিভাগ, রাজশাজী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৭), পৃ. ৯০।

[৭৬] আয়ুর্বেদ, ৪০:৮।

মাতুরিদি মনে করেন যে, আল্লাহর স্বরূপ ও গুণাবলি যথার্থরূপে প্রকাশ করার মতো শব্দ ও ভাষা মানুষের নাই।[৭৭] স্পিনোজা ও হেগেলের মতে, ব্রহ্ম ও ঈশ্বর অভিন্ন।[৭৮]

বিভিন্ন ধর্মেও ঈশ্বরের গুণাবলি নিয়ে ভিন্নতারয়েছে। ইসলাম ধর্মে আল্লাহর গুণবাচক ৯৯টি নাম পাওয়া যায়। হিন্দু ধর্মে ৩৩টি দেবতার কথা বলা হয়েছে। আবার ওল্ড টেস্টামেন্টের ঈশ্বর পরাক্রমশালী, আর নিউ টেস্টামেন্টের ঈশ্বর প্রেমময়। ইসলাম ধর্মে ঈশ্বরের আকার ও আকারহীনতা নিয়ে তাফসিরকারকদের মধ্যে মতানৈক্য বিদ্যমান। হযরত মুসা (আ.) যখন 'তূর পর্বতে' আল্লাকে দেখতে চান তখন আল্লাহ বলেন যে, 'তুমি আমাকে দেখতে পারবে না'। তাফসিরকারকদের একটি অংশ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন যে, এর দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে আল্লাহ আকারবিহীন; বরং আল্লাহর আকার আছে কিন্তু মানুষের চর্মচক্ষু দ্বারা দেখা সম্ভব নয়।হযরত মোহাম্মদ (সা.) মেরাজে গমন করে খোদার দর্শন লাভ করেছিলেন বলে বর্ণিত রয়েছে। এর অর্থ এই যে, খোদার আকার রয়েছে কিন্তু তা মানুষের পক্ষে দেখা সম্ভব নয়। তিনি নিজেকে আড়াল করে রেখেছেন। ঈশ্বরের *ঐশ্বরিক গোপনীয়তা* দেখে জে. এল. সেলেনবার্গ ঈশ্বরের অনস্তিত্বতার প্রমাণ তুলে ধরেন।[৭৯] কিন্তু নজরুল মনে করেন ঈশ্বরের বিশালতা ও তাঁর গুণের ব্যাপকতার কারনে ঈশ্বরকে পূর্ণাঙ্গভাবে জানা না গেলেও তাঁর অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। তাছাড়া মানুষ সসীম হয়ে অসীমকে জানাও তার একটি বড় সীমাবদ্ধতা। এজন্য তিনি বলেন- "আল্লাহ যে এত বড় স্রষ্টা, তিনিও তাই মানুষের দেখার অতীত, কল্পনার অতীত। তিনি শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা, তাই তিনি সবচেয়ে গোপন।"[৮০]তাঁর মতে, স্রষ্টা নিরাকার; কিন্তু কিছু পুণ্যাত্মা বান্দা তাঁর অস্তিত্ব অনুভব করতে পারেন। যেমন নজরুল বলেন-

> আল্লাহ এক। তিনি লা-শরিক অর্থাৎ তাঁহার কোনো শরিক নাই। তাঁহাকে কেহ পয়দা অর্থাৎ সৃষ্টি করে নাই। এই বিশ্বের যাহা কিছু–আকাশ, বাতাস, গ্রহ, তারা, রবি, শশী, জীব-জন্তু, তরু-লতা, ফুল-ফল সমস্ত তিনিই সৃজন করিয়াছেন। জীবন, মৃত্যু, সুখ, দুঃখ সকলেরই নিয়ন্তা তিনি। তিনি নিরাকার। তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না। যাঁহারা পুণ্যাত্মা পরহেজগার কেবল তাঁহারাই কিছু স্বরূপ অনুভব করেন মাত্র। পৃথিবীর সমস্ত আওলিয়া, আম্বিয়া, ফকির, দরবেশ তাঁহারই মহিমা গান করেন। তাঁহারই ধ্যান করেন। তিনি ছাড়া দিন দুনিয়ায় আর কেহ উপাস্য নাই। ... আমরা যেন তাঁহারই কাছে শক্তি ভিক্ষা করি, একমাত্র তাঁহারই এবাদত করি।[৮১]

---

[৭৭] আমিনুল ইসলাম, মুসলিম ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন, পৃ. ১০৯।

[৭৮] রমেন্দ্রনাথ ঘোষ, "শংকরের অদ্বৈতদর্শনে ব্রহ্ম এবং ঈশ্বর" অন্ত. *রমেন্দ্রনাথ ঘোষ দার্শনিক প্রবন্ধাবলি*, পৃ. ১৪২।

[79] J. L. Schellenberg, "Divine Hiddenness Justifies Atheism", *in Contemporary Debates in Philosophy of Religion*, p. 31.

[৮০] "অভিভাষণ,"নর ৮ম, পৃ. ৩২।

[৮১] "মক্তব সাহিত্য,"নর ৬ষ্ঠ, পৃ. ৩৭৬।

নজরুলের এই উক্তিটি পবিত্র কোরআনে আল্লাহর গুণাবলিসম্পর্কিত আয়াতের সাথে মিলে যায়।সুরা বাকারায় আল্লাহ সম্পর্কে বলা হয়েছে-

> "আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নাই, তিনি চিরঞ্জীবী ও চিরস্থায়ী। তাঁকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করে না। যা কিছু আছে আসমান ও জমিনে সব কিছুই তাঁর। কে আছে তাঁর আদেশ ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করতে পারে?- তিনি জানেন যা কিছু মানুষের অন্তরে বাইরে লুকায়িত আছে। তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। তাঁর জ্ঞানের কোনো কিছু মানুষ জানতে পারে না। তাঁর আসন আরশ আসমান ও জমিনব্যাপী বিস্তৃত। আর এসব রক্ষণাবেক্ষণে তিনি কোনো বেগ পাননা। তিনি অতি উচ্চ ও মহিমাময়।'[৮২]

সুফিগণ মানুষকে দেখেছেন স্রষ্টার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে। তাদের মতে, মানুষ আল্লাহ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে ততোক্ষণ, যতোক্ষণ তার দৃষ্টি অজ্ঞতা ও অমঙ্গল দ্বারা আচ্ছন্ন থাকে। অজ্ঞতার আবরণ ভেদ করে মানুষ যখনই প্রবেশ করে জ্ঞানের আলোকে, তখনই স্রষ্টা ও মানুষের মধ্যকার সকল ভেদাভেদ বিলীন হয়ে যায়। তখনই সসীম মানুষ নিজেকে ঐশী সত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে শনাক্ত করতে পারে।[৮৩] নজরুলও মনে করেন চোখের যে ত্রুটির কারণে ঈশ্বরকে দেখা যায় না, তা দূর হলেই সম্ভবপর হবে পরম স্রষ্টার আলিঙ্গন। যেমন তিনি বলেন-

রূপ আছে কিনা জানি না, কেবল মধুর পরশ পাই,
এই দুই আঁখি দিয়া সে অরূপে কেমনে দেখিতে চাই !
অন্ধ বধূ কি বুঝিতে পারে না পতির সোহাগ তার?
দেখিব তাঁহার স্বরূপ, কাটিলে আঁখির অন্ধকার![৮৪]

নজরুল মনে করেন ঈশ্বরকে জানা দুষ্কর হলেও তাঁর মঙ্গলময়তা দেখে তাঁর অস্তিত্ব অনুমান করা যায়। একবার তাকে চিনতে পারলে এবং তাঁর সাথে বন্ধুত্ব হলে তার আর কোনো ভয় নাই।নজরুল মনে করেন ঈশ্বর সুন্দর, নবরূপ ধরে আরো সুন্দর হয়ে বান্দার সামনে উপস্থিত হন; মানুষের সাথে হাসেন কাঁদেন, রাখালিয়া সেজে সেবিতে আসেন। এজন্য তিনি নজরুলের কাছে চির মধুময় বা মধুরম। 'ঘুমের ঘোরে' আজহারের উক্তির মাধ্যমে ঈশ্বরকে দেখেছেন দুর্জ্ঞেয় মঙ্গলময় প্রভু বলে। যেমন তিনি বলেছেন-'ওগো আমার দুর্জ্ঞেয় মঙ্গলময় প্রভু, এখন তুমিই আমার সব!'[৮৫]ঈশ্বরের সরাসরি রূপ না জানলেও তিনি ঈশ্বরকে দেখেছেন আদি অনন্তকাল থেকে বিদ্যমান একজন চেতন সত্তা রূপে। 'রাজবন্দীর জবানবন্দী'তে বিচারকের উদ্দেশ্যে লিখিত পত্রে তিনি এর আভাস দেন। সেখানে তিনি বলেন-"আমার পক্ষে সকল রাজার রাজা, সকল বিচারকের বিচারক,

[৮২] আল কোরআন, ২:২৫৫।
[৮৩] আমিনুল ইসলাম, *জগৎ জীবন দর্শন*, পৃ. ৩০৪।
[৮৪] "অগ্রন্থিত কবিতা,"নর ৯ম, পৃ. ১০৮।
[৮৫] "ঘুমের ঘোরে," 'ব্যথার দান,' নর ১ম, পৃ. ২২৫।

আদি অনন্তকাল ধরে সত্য–জাগ্রত ভগবান।"[৮৬]আবার ঈশ্বরকে তিনি অখণ্ড সত্তা হিসেবে দেখেছেন। যেমন তিনিবলেন- "রাজার পক্ষে–পরমাণু পরিমাণ খণ্ড–সৃষ্টি; আমার পক্ষে–আদিঅন্তহীন অখণ্ড স্রষ্টা।"[৮৭] নজরুলের ঈশ্বর বিষয়ক এই মতের দৃষ্টান্ত লক্ষ করা যায় প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক এরিস্টটলের দর্শনে। এরিস্টটলের মতে, 'ঈশ্বর স্বয়ংপূর্ণ, তিনি পূর্ণতাসাপেক্ষ নন।'[৮৮] নজরুলের মতে ঈশ্বর অক্ষয় ও অবিনাশী। তাঁর কোনো ধ্বংস নাই। মনু'র শাস্ত্র, রাজার অস্ত্র আজ আছে কাল না থাকলেও পরম প্রভু চির অবিনাশী। নজরুল বলেন-

মনুর শাস্ত্র রাজার অস্ত্র
আজ আছে কাল নাইকো আশ,
কা'ল তারে কাল করবে গ্রাস।
হাতের খেলা সৃষ্টি যাঁর
তাঁর শুধু ভাই নাই বিনাশ
স্রষ্টার সেই নাই বিনাশ![৮৯]

ঈশ্বর যে অবিভাজ্য এই দিকটি বর্ণিত হয়েছে নব-পিথাগোরীয় দার্শনিক প্লুটার্কের মতে। প্লুটার্কের মতে, "একমাত্র ঈশ্বরই যথার্থ অস্তিত্বের অধিকারী। ঈশ্বর স্বয়ংসৃষ্ট, স্বচালিত, স্বয়ংসম্পূর্ণ, বিশুদ্ধ ও অবিভাজ্য একত্ব। ঈশ্বর মঙ্গলময় এবং তাঁর মধ্যে ঈর্ষার কোনো স্থান নেই। তিনি প্রজ্ঞাময় এবং সব জিনিসের পরিচালক ও নিয়ন্ত্রক।"[৯০] প্লুটার্কের মতো নজরুল ঈশ্বরকে দেখেছেন জগতের পরম পতি, পরম গতি, ও পরম প্রভু হিসেবে। 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সমিতির' জুবিলি উৎসবে সভাপতির ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন- "আপনারা এই ভিখারিকে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সমিতির' জুবিলি উৎসবে সভাপতি কেন যে মনোনীত করলেন, যিনিবিশ্বভুবনের পরম পতি, পরমগতি, পরম প্রভু, তিনিই জানেন"[৯১]সবকিছুর ধ্বংস হলেও ঈশ্বর অবিনশ্বর তাঁর কোনো ধ্বংস নেই। বরং তিনি ছাড়া অন্য সবকিছুর লয় তাঁর হাতেই বিদ্যমান। তিনি সর্বশক্তিমান।

নজরুল মনে করেন ঈশ্বর অমর; তাঁর মরণ নেই। ঈশ্বরের অমরতার কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন- "একথা ধ্রুব সত্য যে, সত্য আছে, ভগবান আছেন-চিরকাল ধরে আছে এবং চিরকাল ধরে থাকবে।"[৯২] তাঁর মতে ঈশ্বর অমর, আদি, অন্তহীন, ও অখন্ড বা অবিভাজ্য মঙ্গলময় সত্তা। তিনি জগতের সবকিছু সৃষ্টি করেছেন।

---

[৮৬] "রাজবন্দীর জবানবন্দী," নর ১ম, পৃ. ৪৩১।

[৮৭] তদেব।

[৮৮] আমিনুল ইসলাম, পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস: থেলিস থেকে হিউম (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৯) পৃ. ১৪২

[৮৯] "সত্য-মন্ত্র,"'বিষের বাঁশি,' নর ১ম, পৃ. ১৩৬।

[৯০] আমিনুল ইসলাম, পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস:,পৃ. ২০৯

[৯১]"অভিভাষণ", নর ৮ম, পৃ. ৪৫।

[৯২]"রাজবন্দীর জবানবন্দী," নর ১ম, পৃ. ৪৩১।

ঈশ্বরের সৃষ্টিশীলতার কথা বলতে গিয়ে অন্যত্র নজরুল বলেন-"আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ স্রষ্টা। প্রকাণ্ড তাঁর সৃষ্টি। সে সৃষ্টির পশ্চাৎভূমিতেই জন্ম নিয়েছে চন্দ্র-সূর্য-তারকার সৃষ্টির ঐশ্বর্য। এই বৃহৎকে বুঝবার সাধনাই জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনা।"[৯৩] অবশ্য নজরুল মনে করেন ঈশ্বরই সৃষ্টিকর্তা আবার তিনিই বিনাশকর্তা। সৃষ্টি এবং ধ্বংসই তাঁর খেলা। তিনি শিশুর মতো আনমনে এই বিশ্ব সৃষ্টি করছেন আবার খেলা শেষে ভেঙে ফেলছেন। ঈশ্বর শূন্যে মহা-আকাশে বসে সৃষ্টি-ধ্বংসের এই খেলাতেই মগ্ন।

ঈশ্বরের বিদ্যমানতা, অমরতা, অখণ্ডতা ও জাগ্রত গুণাবলি স্বীকার করার পর নজরুল ঈশ্বরের মহানুভবতার কথা বর্ণনা করেন। তিনি মনে করেন ঈশ্বর মহান, সকল বিপদের শেষ আশ্রয়স্থল। তিনি বলেন-'খোদা, তুমি মহান! "যার কেউ নেই তুমি তার আছ।"[৯৪]দার্শনিকদের ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, পরম করুণাময় ও সর্বশক্তিমান। নজরুলের উক্তির মধ্যেও এর প্রতিধ্বনি শোনা যায়। তিনি বলেন-

> তিনিই সর্বকল্যাণদাতা, সর্ব বিপদত্রাতা,
> তিনি দিশা দেন সহজ পথের, তিনিই সর্বজ্ঞতা ![৯৫]

নজরুল ঈশ্বরকে দেখেছেন 'সুন্দর' হিসেবে। সেই 'সুন্দর কখনো আনন্দ-সুন্দর, কখনো বেদনা-সুন্দর, আবার কখনো বা ধ্যান-সুন্দর হয়ে তাঁর নিকট আগমন করেছেন । নজরুল মনে করেন ঈশ্বর প্রথমে তার নিকট আগমন করেছেন ছোট গল্প হয়ে, তারপর পর্যায়ক্রমে কবিতা, গান, সুর, ছন্দ, ভাব, উপন্যাস, নাটক হয়ে। তিনি 'ধূমকেতু', 'লাঙল', 'গণবাণী', এবং 'নবযুগে' এসেছেন 'শক্তি-সুন্দর' হিসেবে। নজরুল মনে করেন রবীন্দ্রনাথ যখন তার উদ্দেশ্যে 'বসন্ত' নাটক উৎসর্গ করেছিলো তখন ঈশ্বর তাঁর নিকট ধরা দিয়েছিলো 'আশির্বাদ-সুন্দর' হয়ে। বাঙালিদের আমন্ত্রনে যখন তিনি সারা বাংলাদেশ চষে বেড়িয়েছেন তখন ঈশ্বর বাংলার অপরূপ সোন্দর্য 'প্রকাশ-সুন্দর' হয়ে আগমন করেছেন। যৌবনে ঈশ্বর তাঁর নিকট আগমন করেছেন 'যৌবন-সুন্দর' এবং 'প্রেম-সুন্দর' হিসেবে। শিশুপুত্র বুলবুল যখন মারা যায় তখন ঈশ্বর এসেছিলেন 'শোক-সুন্দর' হিসেবে। পুত্রের বেদনায় যখন তিনি কাতর হয়ে পুত্রকে আর একবার দেখার জন্য ধ্যান করতে লাগলেন তখন তিনি ঈশ্বরকে দেখতে পান 'ধ্যান-সুন্দর' হিসেবে। এছাড়াও তিনি ঈশ্বরকে দেখেছেন 'প্রলয়-সুন্দর', 'ধরিত্রী-সুন্দর' রূপে। তিনি বিভিন্ন রূপে মানুষের সামনে উপস্থিত হন। যেমন তিনি আগমন করেন মৃত্যুরূপে।

> মোরই ভগবান মৃত্যুর রূপে
> মুখোস পরিয়া আসে চুপে চুপে,

---

[৯৩] "অভিভাষণ,"নর ৮ম, পৃ. ৩৫।
[৯৪] "ব্যথার দান,", নর ১ম, পৃ. ২০০
[৯৫] "একি আল্লার কৃপা নয়?," 'শেষ সওগাত,'নর ৬ষ্ঠ, পৃ. ১০৩।

আমি ধরিয়া ফেলেছি এই লীলা মোর সুন্দর বিধাতার ॥[৯৬]

নজরুল ঈশ্বরের রূপ ধরতে পারলেও আল গাজালি মনে করেন ঈশ্বর উপলব্ধির অতীত, সুতরাং তাকে বুঝতে পারার দাবি অযৌক্তিক। তবে এর অর্থ এই নয় যে, ঈশ্বরে বিশ্বাস অযৌক্তিক।[৯৭]

অথর্ববেদে বলা হয়েছে-"ঈশ্বর অত্যন্ত মহান। যথার্থই তুমি আলোময়, তোমার প্রকাশ মহান: তুমিই সত্য, অদ্বিতীয়, তোমার প্রকাশ মহান, যেহেতু তোমার প্রকাশ মহান, তাই তোমার মহানত্ব সর্ব স্বীকৃত, সত্যিই মহান তোমার প্রকাশ, হে ঈশ্বর!"।[৯৮] নজরুল মনে করেন, ঈশ্বর এতই করুণাময় যে, মানুষকে সেবিতে ঈশ্বর বিভিন্ন রূপে আগমন করেন। তিনি মানুষসৃষ্ট সর্বনিম্ন স্তর শূদ্রের মধ্যে বিরাজ করেন। তিনি ঈশ্বরকে দেখেছেন গোরস্তানের পথে, যুদ্ধভূমিতে, কারাগারের অন্ধকূপে, ফাঁসির মঞ্চে। সবখানেই তিনি অত্যাচারিতের পক্ষে অবস্থান নেন। নজরুল বলেন-

আমি শুধু সুন্দরের হাতে বীণা, পায়ে পদ্মফুলই দেখিনি, তার চোখে চোখ ভরা জলও দেখেছি।
শ্মশানের পথে, গোরস্থানের পথে, তাঁকে ক্ষুধা-দীর্ণ মূর্তিতে ব্যথিত পায়ে চলে যেতে দেখেছি।
যুদ্ধভূমিতে তাঁকে দেখেছি, কারাগারের অন্ধকূপে তাঁকে দেখেছি, ফাঁসির মঞ্চে তাঁকে দেখেছি।
আমার গান সেই সুন্দরকে রূপে রূপে অপরূপ করে দেখার স্তব-স্তুতি।[৯৯]

উপনিষদে বলা হয়েছে- "তিনিই সত্য, নতুবা এ জগৎ সংসার কিছুই সত্যহইত না। তিনিই জ্ঞান, এই যাহা-কিছু তাহা তাঁহারই জ্ঞান, তিনি যাহা জানিতেছেন,তাহাই আছে, তাহাই সত্য। তিনি অনন্ত। তিনি অনন্ত সত্য, তিনি অনন্ত জ্ঞান।"[১০০] পবিত্র কোরআনের অসংখ্যা জায়গায় স্রষ্টার সর্বজ্ঞতার কথা বিধৃত হয়েছে। নজরুলও মনে করেন ঈশ্বর হলেন অন্তর্যামী। তিনি মনের সকল বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত আছেন। 'রাজবন্দীর চিঠি'তে লেখক বলেন- "সে সুখ সে ব্যথা শুধু আমি জানলুম আর আমার অন্তর্যামী জানলেন।"[১০১] নজরুল মনে করেন পৃথিবীর সকল কিছু ঈশ্বরের সৃষ্টি। সুখ-দুখ, হাসি-কান্না, ধর্ম-অধর্ম এবং মানুষ স্রষ্টার সৃষ্টি। পৃথিবীর কোনো ঘটনাই ঈশ্বরের অজ্ঞাতসারে সংঘটিত হয় না। তিনি সর্ব বিষয়ে জ্ঞাত থাকেন। ফলে পাপ-তাপ যাই ঘটুক না কেন তিনি তা অবগত থাকেন। ঈশ্বর অন্তর্যামী। মানুষের অন্তরেঈশ্বরের দেউল। তাই তাঁকে বাহিরে খুঁজলে পাওয়া যাবে না। মানুষের মধ্যেই তাঁর অবস্থান। *যজুর্বেদীয় ঈশোপনিষদের* প্রথমেই বলা হয়েছে যে, 'এই ব্রহ্মাণ্ডে যা আছে তা সমস্তই পরমেশ্বর দ্বারা আবরণীয়'। জগতের কোনো বস্তুই

---

[৯৬] "অগ্রন্থিত গান,"নর ১০ম, পৃ. ৩৬২।

[৯৭] ক্যারেন আর্মস্ট্রং, *স্রষ্টার ইতিবৃত্ত*, পৃ. ২৫৪।

[৯৮] মোঃ আককাছ আলী, "ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ: একটি ঐতিহাসিক ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ"(পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, আরবি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১২), পৃ. ৩৮।

[৯৯] "প্রতিভাষণ," 'অভিভাষণ,' নর ৮ম, পৃ. ৫।

[১০০] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "ধর্মের সরল আদর্শ", *বাঙালির ধর্মচিন্তা*, পৃ. ২৩৮।

[১০১] "রাজবন্দীর চিঠি," 'ব্যথার দান,' নর ১ম, পৃ. ২৪৯।

যদি ঈশ্বরহীন না হয় তবে মানুষও নিশ্চয়ই ঈশ্বরহীন নয়।[১০২]নজরুল মনে করেন যে মানুষের অন্তরে প্রভুর বসবাস সেই অন্তরে তাঁকে না খুঁজে বাহিরে মন্দির নির্মাণ করে পূজা করলে ঈশ্বর দেখেন আর হাসেন। নজরুল বলেন-

অন্তরে তুমি আছ চিরদিন
ওগো অন্তর্যামী,
বাহিরে বৃথাই যত খুঁজি তাই
পাই না তোমারে আমি ॥[১০৩]

ঈশ্বরের নিকট কোনো ধর্ম-বর্ণ-জাতিভেদ নাই। তিনি সকলের। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের প্রতি তিনি করুণা করেন। ঈশ্বর কোনো বিষয়ে পক্ষপাতিত্ব না করলেও ধর্মমাতালরা ঈশ্বরকে তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত করে ফেলেছে। ঈশ্বরের পক্ষপাতহীনতা সম্পর্কে অবগত হলেও ধর্মমাতালরা যখন তাদের মাতলামি শুরু করে তখন অনেক জ্ঞানী-গুণীরাও তা দ্বারা মায়াচ্ছন্ন হয়ে পড়েন।

খোদার বা ভগবানের তো কোনোরূপ পক্ষপাতিত্ব দেখিতে পাই না। যখন মড়ক আসে, হিন্দু-মুসলমান সমানে মরিতে থাকে, আবার যখন তাঁহার আশীষধারা বৃষ্টিরূপে ঝরিতে থাকে, তখন হিন্দু-মুসলমান সকলের ঘরে সকলের মাঠে সমান ধারে বর্ষিত হয়। আমরা কেন তবে খোদার উপর খোদকারি করিতে যাই ? খোদার রাজ্য খোদা চালাইবেন, তিনি যদি ইচ্ছা না করিবেন তাহা হইলে অমুসলমান কেহ একদিনও বাঁচিতে পারিত না। সব বুঝি, সব জানি, তবু ধর্মের মুখোস পরিয়া স্বার্থের দৈত্য যখন মাতলামি আরম্ভ করে–তখন আমরাও সেই দলে ভিড়িয়া যাই। আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, নির্মল-বুদ্ধি মহাপুরুষদের মস্তিষ্কও তখন মায়াচ্ছন্ন হইয়া যায় দেখিয়াছি।[১০৪]

জগতের সাথে ঈশ্বরের সম্পর্ক বিষয়ে নজরুল

ঈশ্বরের সাথে এই জগতের সম্পর্ক কেমন হবে এ নিয়ে দর্শনের ইতিহাসে রয়েছে বিস্তর মতপার্থক্য। জগতের সাথে ঈশ্বরের সম্পর্ক বিষয়ক অতিবর্তী ঈশ্বরবাদ অনুসারে ঈশ্বর একটি বিশেষ মুহূর্তে জগত সৃষ্টি করেন এবং সৃষ্টিক্রিয়া সম্পর্ণ করে তিনি এ সৃষ্টিজগৎ ত্যাগ করেন। ঈশ্বর জগতের বাহিরে অবস্থান করলেও জগত তার পূর্বপ্রতিষ্ঠিত শৃঙ্খলানুসারে বা প্রাকৃতিক নিয়মে পরিচালিত হয়। এই মতবাদের সমর্থকদের মধ্যে টোলান্ড (১৬৭০-১৭২২), কলিন্স (১৬৭৬-১৭২৯), বাটলার (১৬৯২-১৭৫২), রুশোও (১৭১২-১৭৭৮) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। অতিবর্তী ঈশ্বরবাদের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ সর্বেশ্বরবাদের উৎপত্তি। এ মতবাদ অনুসারে ঈশ্বর জগতের বাহিরে

---

১০২ নিখিল ভট্টাচার্য্য, "হিন্দুধর্মীয় শিক্ষা এবং মানবতা", *বাঙালির ধর্মচিন্তা*, পৃ. ৩১১।

১০৩ "সন্ধ্যা মালতী,"নর ৭ম, পৃ. ১৮২।

১০৪ "তরুণের সাধনা," 'অভিভাষণ,' নর ৮ম, পৃ. ১৫।

অবস্থান করেন না বরং পুরোপুরি জগতের অন্তর্বর্তী। এ মতের সমর্থক হিসেবে ভারতীয় ব্রহ্মবাদ, এলিয়াটিক সত্তাবাদ, স্টোয়িক দর্শন, ব্রুনোর দর্শন, স্পিনোজার দর্শন, এবং মরমীবাদীদের নাম উল্লেখ করা যায়।

ঈশ্বরের অতিবর্তীতা ও অনুবর্তীতার প্রতিক্রিয়ায় ঈশ্বরবাদ বা সর্বধরেশ্বরবাদ একটি সমন্বয়ী মতবাদ। প্লেটো, এরিস্টটল, হেনরি বার্গসো, হোয়াইটহেড প্রমূখ দার্শনিকরা এ মতবাদের সমর্থক হলেও যে দার্শনিক এই মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করতে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রেখেছেন তিনি হলেন মার্টিনো। এ মতানুসারে ঈশ্বর একদিকে যেমন জগতের অতিবর্তী আবার অন্যদিকে অনুবর্তী। অর্থাৎ ঈশ্বর একই সঙ্গে জগতে অনুস্যৃত এবং জগতের বাইরে পরিব্যাপ্ত।[১০৫]

নজরুলের সাহিত্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, তিনি জগতের সাথে ঈশ্বরের সম্পর্ক বিষয়ক সর্বধরেশ্বরবাদের সমর্থক। কেননা তিনি একই সাথে মনে করতেন যে, ঈশ্বর অতিবর্তী আবার অনুবর্তী; অর্থাৎ ঈশ্বর বিশ্বানুগ হয়েও বিশ্বাতীত। ঈশ্বর আরশে আজিমে তাঁর সিংহাসনে অবস্থান করছেন এই ধারণার মধ্যে রয়েছে বিশ্বাতীত এর প্রমাণ। নজরুলের মতে, খোদার আসন এ জগতে নয় বরং উর্ধ্বে তাঁর সিংহাসন। ঈশ্বর জগত সৃষ্টির পর তাঁর আসন আরশে কুদশিতে অবস্থান করেন। নজরুল বলেন- “আমি শুনিতেছি মসজিদের আজান আর মন্দিরের শঙ্খধ্বনি। তাহা এক সাথে উত্থিত হইতেছে উর্ধ্বে–স্রষ্টার সিংহাসনের পানে। আমি দেখিতেছি, সারা আকাশ যেন খুশি হইয়া উঠিতেছে।”[১০৬] উর্ধ্বাকাশে যে খোদার আরশ অবস্থিত এবং সেখানে তিনি অবস্থান করছেন তার সমর্থন ইসলাম ধর্মে পাওয়া যায়।আল্লাহ বলেন-“নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হয়েছেন।”[১০৭]তবেনজরুল মনে করেন, ঈশ্বর আরশে অবস্থান করলেও জগতের শুভাশুভ প্রত্যক্ষ করছেন। জগতের যাবতীয় ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে তিনি অবগত থাকেন। তাঁর মতে, ঈশ্বর মহাশূন্যে বসে জগৎ সৃষ্টি-প্রলয় খেলায় মগ্ন আছেন।[১০৮]জগতে যখন অশুভের মাত্রা বেড়ে যায় তখন তিনি তা দমন করতে বিভিন্নভাবে আগমন করেন। কারবালার ময়দানে এজিদ সৈন্যদের বিভৎসতা প্রতীকি ব্যঞ্জনার মাধ্যমে উল্লেখ করে নজরুল দেখিয়েছেন যে, জগতের ঘটনাবলী ঈশ্বর প্রত্যক্ষ করেন। এমনকি কোনো কোনো ঘটনা তাঁকে বিচলিত পর্যন্ত করে তোলে। যেমন নজরুল বলেন-“মা ফাতেমা আরশের পায়া ধরে কাঁদছেন, স্কন্ধে তাঁর হাসানের বিষ-মাখা নীল পিরান আর হোসেনের খুন-মাখা রক্ত-উত্তরীয়। পুত্র-হারার আকুল ক্রন্দনে খোদার আরশ কেঁপে উঠছে।”[১০৯]তিনি খোদার করুণা লাভের আশায় আকাশের দিকে দুহাত তুলে মোনাজাত করেন।

---

[১০৫] আমিনুল ইসলাম, জগৎ জীবন দর্শন, পৃ. ৮১।

[১০৬] “মন্দির ও মসজিদ,”‘রুদ্র-মঙ্গল,’ নর ২য়, পৃ. ৪৩৬।

[১০৭] আল কোরআন, ৭:৫৪।

[১০৮] “অগ্রন্থিত গান,”নর ১০ম, পৃ. ৩৫৫।

[১০৯] “মোহররম,” ‘রুদ্র-মঙ্গল,’ নর ২য়, পৃ. ৪২৩।

ঈশ্বরের অতিবর্তীতার দিকটির পাশাপাশি অনুবর্তীতার দিকটিও বিদ্যমান। ঈশ্বরকে তিনি যেমন মনে করেন আরশে অবস্থান করছে তেমনি মনে করেন ঈশ্বর আবার মানুষের মধ্যেও অবস্থান করেন। তিনি বলেন- "তুই চেয়ে দেখ ভাই আপনার মাঝে,/ সেথা জাগ্রত ভগবান বাজে।"[১১০] পবিত্র আল কোরআনেও রয়েছে এর ইঙ্গিত। সেখানে বলা হয়েছে-"আর আমি মানুষের এত নিকটবর্তী যে, তার ঘাড়ের রগের চেয়েও অধিক নিকট।"[১১১]ঈশ্বর যেহেতু মানুষের মধ্যেই বিরাজ করেন সেহেতু নিজকে চিনতে পারলেই ঈশ্বরকে চেনা যাবে বলে তিনি মনে করেন। যেমন তিনি বলেন-

তুই খোদকে যদি চিনতে পারিস
চিনবি খোদাকে,
তোর রুহানি আয়নাতে দেখ রে
সেই নূরি রওশন ॥[১১২]

নজরুল আরো বলেন- "জাগেন সত্য ভগবান যে রে আমাদেরি এই বক্ষ-মাঝ"। মানুষের দেহই ঈশ্বরের রঙমহল, এখানেই তাঁর বসবাস। এর মধ্যেই তাঁর প্রকাশ। মানুষের কায়ার মধ্যেই তিনি বিরাজ করেন। নজরুল বলেন-

তার খেলা-ঘর তোর এ দেহ
সে ত নহে অন্য কেহ,
সে যে রে তুই,—তবু মোহ
ঘুচল না তোর হায় পূজারী ॥[১১৩]

নজরুল মানুষের প্রতিটি অবয়বে ঈশ্বরের অবস্থান প্রত্যক্ষণ করেন। তিনি মনে করেন মানুষ এমন জীব যার মাঝে স্বয়ং স্রষ্টার বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু মানুষ যখন আপন স্রষ্টাকে আপনার মাঝে না খুঁজে, ঋষি-যোগী-দরবেশ সেজে পাহাড়ে, বনে-জঙ্গলে, আকাশে-পাতালে খোজে, তখন স্বয়ং স্রষ্টা বিব্রতবোধ করেন।নিজ কায়ায় ঈশ্বরে ছায়া। কেবল অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমেই তাঁকে নিজের মধ্যে আবিষ্কার করা যাবে। নজরুলের উক্তি-

ইচ্ছা অন্ধ ! আঁখি খোলো, দেখো দর্পনে নিজ কায়া,
দেখিবে, তোমারি সব অবয়বে পড়েছে তাঁহার ছায়া।[১১৪]

---

১১০ "অভয়-মন্ত্র," 'বিষের বাঁশী,' নর ১ম, পৃ.১২০।

১১১ আল- কোরআন, ৫০:১৬।

১১২ "জুলফিকার,"নর ৪র্থ, পৃ. ৩০০।

১১৩ "গুল্-বাগিচা,"নর ৫ম, পৃ. ২৬২।

১১৪ "ঈশ্বর," 'সাম্যবাদী,' নর ২য়, পৃ.৮০।

এই দেহই সকল দেবতার মন্দির। মানুষের দেহই মন্দির, মসজিদ, কাশী ও বিন্দাবন। মক্কা ও মদিনা, কাবা ভবন এই হৃদয়। যারা বিশ্ব সংসার তন্ন তন্ন করে বিশ্বপ্রভুকে পেতে চায় তাদের সে আশা নিরাশা।

কোথায় তুই খুঁজিস ভগবান
সে যে রে তোরি মাঝারে রয়।
চেয়ে দেখ সে তোরি মাঝারে রয়।[১১৫]

নজরুলের এই চিন্তার প্রতিফলন দেখা যায় 'ঈশ্বর' কবিতাতেও। রত্নের বনিকরা রত্ন বেঁচা-কেনা করলেও যেমন রত্নকারকে চিনতে পারে না তেমনি ঋষি-দরবেশ, ধর্মব্যবসায়ীরাও ঈশ্বরকে চিনতে পারে না। সুতরাং খোদার স্বঘোষিত প্রাইভেট সেক্রেটারিদের নিকট ঈশ্বর না খুঁজে বরং নিজ অন্তরে ঈশ্বরের অনুসন্ধান করলেই ঈশ্বরের সন্ধান পাওয়া যাবে বলে তিনি মনে করেন। নজরুল মনে করেন তাঁর প্রাণের ঠাকুর, তাঁর আরাধ্য আর কোথাও নয় বরং তাঁর অন্তরেই অবস্থান করছেন। ফলে তাঁর মন্দিরও এই দেহ। তিনি বলেন-

আমার এ প্রাণের ঠাকুর নহে সুদূর
অন্তরে মন্দির-গেহ ॥"[১১৬]

নজরুল আরো বলেন-

হেথা স্রষ্টার ভজনা-আলয় এই দেহ এই মন,
হেথা মানুষের বেদনায় তাঁর দুখের সিংহাসন ![১১৭]

নজরুল ঈশ্বরের জ্যোতি দেখতে পান রবি, শশী, তারকার মধ্যে। অর্থ্যাৎ চন্দ্র সূর্যের কিরণের মধ্যে রয়েছে ঈশ্বরের জ্যোতি। তাদের মধ্যেই ঈশ্বরের রূপ বিদ্যমান। ঈশ্বরকে দেখতে পান মায়ের চুমায়। জননীরূপে তিনি আমাদেরকে চুমো দেন। তাঁর হাসি দেখতে পান শিশুর হাসিতে।[১১৮]

সুফি সাধক মনসুর হল্লাজ আল্লাহকে নিজের মধ্যে আবিষ্কার করেন। তিনি দেখেন যে, তিনি আল্লাহর সাথে একাকার হয়ে গেছে। এতে তিনি বলে উঠেন 'আনাল হক'। নজরুল মনসুর হল্লাজের উদাহরণ টেনে বলেন ব্যক্তি তখনই খোদাকে চিনতে পারবে যখন সে নিজেকে চিনতে পারবে। কেননা নিজেকে চিনতে পারলে খোদাকে চেনা যায়। নজরুল বলেন-

তুই খোদকে যদি চিনতে পারিস
চিনবি খোদাকে।[১১৯]

---

[১১৫] "বন-গীতি," নর ৫ম, পৃ. ১৯৬-৭।
[১১৬] "চন্দ্রবিন্দু," নর ৪র্থ, পৃ. ১৬৫।
[১১৭] "সাম্য," 'সাম্যবাদী,' নর ২য়, পৃ. ৯৩।
[১১৮] "গুল্-বাগিচা,"নর ৫ম, পৃ. ২৬৩।
[১১৯] "জুলফিকার," নর ৪র্থ, পৃ. ৩০০।

আর ঈশ্বর মানুষের অন্তরে অবস্থান করে বিধায় মানুষ মানুষকে এতো শ্রদ্ধা করে, পূজা দেয়। ঈশ্বর চলে গেলে এই শরীরের আর কোনো দাম থাকবে না। নজরুল বলেন-"আমার এই দেহ-মন্দিরে জাগ্রত দেবতার আসন বলেই তো লোকে এ-মন্দিরে পূজা করে, শ্রদ্ধা দেখায়, কিন্তু দেবতা বিদায় নিলে এ শূণ্য মন্দিরের আর থাকবে কী? একে শুধাবে কে?[১২০]

উপসংহারঃ

একেশ্বরে বিশ্বাসী নজরুল ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে জোরালো দার্শনিক যুক্তি উপস্থাপন করেছেন। তবে এখানে একটা বিষয় স্পষ্ট যে, নজরুল প্রথাগতভাবে কোনো দার্শনিক তত্ত্ব বা সুত্র তৈরি করেননি। তিনি তাঁর জিজ্ঞাসু মনে ঈশ্বরের স্বরূপ বিষয়ে যে ধারণা লাভ করেছেন সে সবই তিনি লিখেছেন। এটি করতে গিয়ে তাঁর ঐ সকল যুক্তিগুলো কোনো কোনো দার্শনিকদের যুক্তির সাথে মিলে গেছে। এভাবেই আনসেলম, ডেকার্ট, লাইবনিজ, মার্টিনিও, পেলি প্রমূখ দার্শনিকবৃন্দের মতের সাথে নজরুলের মতের সাদৃশ্য লক্ষণীয়। অনেক ক্ষেত্রে নজরুলের মতকে অপেক্ষাকৃত যুক্তিযুক্ত হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। যারা অশুভের সমস্যা বিষয়ক আলোচনার মাধ্যমে ঈশ্বরের দ্বৈততার প্রমাণ দিয়েছেন, নজরুল তাদের যুক্তি বুদ্ধিদীপ্তভাবে খন্ডন করেছেন । অশুভকে তিনি দেখেছেন শুভের উপায় হিসেবে। এক্ষেত্রে স্টোয়িক দার্শনিকদের মতের চেয়ে নজরুলের মতকে অনেক পরিণত বলেই মনে হয়েছে। তাছাড়া ঈশ্বরকে তিনি দেখেছেন সর্বনাম হিসেবে, যেখানে সব নাম গিয়ে মিশেছে তাঁর সাথে। এনাক্সোগোরাসের 'নওস' যেমন একদিকে বিশ্বাতিগ (transecndent), অন্যদিকে আবার বিশ্বানুগ (immanent)নজরুলের ঈশ্বরও তেমনি অতিবর্তি হয়েও অন্তর্বর্তি। একদিকে তিনি যেমন তাঁর সিংহাসন 'আরশে কুদসি'তে অবস্থান করেন, আবার তিনিই বান্দার অন্তরে অবস্থান করেন।

---

[১২০] "রাজবন্দীর জবানবন্দী," নর **১**ম, পৃ. ৪৩৪।

চতুর্থ অধ্যায়

নৈতিকতা প্রসঙ্গে কাজী নজরুল ইসলাম

ভূমিকা

নৈতিকভাবে অধঃপতিত সমাজে কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম। অন্যায়, অবিচার, নির্যাতন, নাগরিক অধিকার হরণ প্রভৃতি কর্মকাণ্ড নৈতিকতার পরিপন্থী, যা তৎকালীন সমাজে বর্তমান ছিলো। সে সময় স্বাধীনতা ছিলো সুদূর পরাহত। অথচ স্বাধীনতার জন্য যে নৈতিক মনোবল তথা দেশপ্রেম দরকার তা ছিলো অনুপস্থিত। উল্টো মানুষ যেনো শাসক শ্রেণির বিরুদ্ধে না যায়, সেজন্য তাদেরকে এমন শিক্ষা দেওয়া হচ্ছিল যাতে করে একটি দাসব্রত সমাজ প্রতিষ্ঠা করা যায়। সামাজিক ও রাজনৈতিক অসাম্য ছিলো চোখে পড়ার মতো। নারী-পুরুষ, ধনী-গরিব, রাজা-প্রজা প্রভৃতির মধ্যে আকাশ-জমিন পার্থক্য ছিলো। নজরুল এই সকল অসাম্য ও অসামঞ্জস্যতার বিরুদ্ধে কলমযুদ্ধ শুরু করেন। একটি দাসব্রত জাতিকে স্বমহিমায় উদ্ভাসিত আত্মমর্যাদাশীল জাতিতে রূপান্তরের জন্য শিক্ষাব্যবস্থা থেকে শুরু করে সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বত্রই তিনি আঘাত করেন। তাঁর এ আঘাত শুধু ভাঙার জন্য নয়; বরং ভেঙে নতুনভাবে গড়ার জন্য। তিনি মনে করেন মানুষের মধ্যে নৈতিকবোধ সৃষ্টি করতে পারলে শত শত বছরের জঞ্জাল এমনিতেই পরিষ্কার হয়ে যাবে। কারণ নৈতিকতার মূল কথাই হলো জগত থেকে দুঃখের অবলোপন এবং সুখের বিস্তার ঘটানো। ধর্মের মূল কথাও তাই। পৃথিবীর প্রতিটি ধর্মই মানবকল্যাণে প্রবর্তিত হয়েছে। ফলে সব ধর্মের নৈতিক শিক্ষা মূলত এক। এজন্য নজরুল নৈতিকতার ক্ষেত্রে ধর্মীয় নৈতিকতার উপর জোর দেন। তাঁর বিশ্বাস ধর্মের নৈতিক বিধানের অনুসরণের মধ্যেই রয়েছে প্রকৃত মানবকল্যাণ।

নৈতিকতা কী?

নৈতিকতা সমাজে বসবাসকারী মানুষের ঐচ্ছিক আচরণের সাথে সম্পর্কিত। মানুষের আচরণের ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, উচিত-অনুচিত প্রভৃতি বিষয়ের মূল্যায়ন করা নৈতিকতার কাজ। আর মানুষের আচরণ আইনের সাথে সম্পর্কিত। সুতরাং কোনো আচরণ আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলে তাকে নৈতিক বলা হয়।[১] নৈতিক নিয়ম-কানুনগুলো মানুষের আচরণের ভালো-মন্দ মূল্যায়নের পাশাপাশি কর্তব্যকেও নির্দেশ করে।[২] সুতরাং বলা যায়, যে চেতনা মানুষকে সামাজিক সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে এবং সামাজিক জীবন কল্যাণপ্রসু করতে সাহায্য করে সে চেতনাই হলো নৈতিকতা বা নীতিবোধ।[৩] ভারতীয় দর্শনে নৈতিকতা বা নীতিবোধের ধারণা সর্বপ্রথম গৌতম বুদ্ধের চিন্তায়

---

[১] আনোয়ারুল্লাহ ভুঁইয়া, *শিক্ষাদর্শন: তত্ত্ব ও ইতিহাস* (ঢাকা: অন্বেষা প্রকাশন, ২০১০), পৃ. ৮২।

[২] রাশিদা আখতার খানম, *পরিবেশ নীতিবিদ্যা* (ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৯), পৃ. ১১৩।

[৩] রশীদুল আলম, *নৈতিকতা ও আমাদের সমাজ: বাঙালীর দর্শনের উৎস সন্ধানে* (বগুড়া: সাহিত্য সোপান, ১৯৯৬), পৃ. ১০৫।

পাওয়া যায়।[৪] সমতা, বিশ্বভ্রাতৃত্ব, মানবপ্রেম এবং অহিংসা তাঁর নৈতিকতার প্রাণকেন্দ্র। বুদ্ধের সমকালীন গ্রিক নীতিবিদ ইশপ প্রথম পাশ্চাত্য নীতিতত্ত্বের আদিম কথাকার।[৫] তাঁর চিন্তার এক প্রধান বিষয় হলো মানুষের মধ্যে নৈতিকতার বিস্তার ঘটানো। সুতরাং বলা যায়, মানবজীবনের কল্যাণের স্বরূপ, পরমাদর্শ, আচার-আচরণের ভালো-মন্দ, এবং উচিত-অনুচিত নিয়ে পর্যালোচনা করাই নীতিদর্শনের প্রধান ও মৌলিক কাজ।[৬]এদিক থেকে নীতিবিদ্যাকে সর্বোচ্চ মঙ্গল লাভের সহায়ক কোনো কিছুর বিদ্যা হিসেবেও বলা যায়।[৭]নৈতিকতাকে প্রধানত দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়; যার একটি ধর্মীয় নৈতিকতা ও অন্যটি ধর্ম নিরপেক্ষ নৈতিকতা।

ধর্মীয় নৈতিকতা

ধর্মীয় নৈতিকতা ধর্ম ও নৈতিকতার সমন্বয়ে গঠিত একটি পরিভাষা। দু'টি আলাদা প্রত্যয় হলেও উভয়ই একে অপরের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।[৮] সামাজিক সংহতি, সহনশীলতা, সম্প্রীতি অর্জন এবং সত্য-শিব-সুন্দরের প্রতিষ্ঠা করা এর মূল লক্ষ্য। কাল্ডারউড এবং উইলিয়াম পেলি[৯] ধর্মের সাথে নৈতিকতার সম্পর্ককে স্বীকার করে বলেন যে, ঈশ্বরের ইচ্ছা মানুষের সেইসব কর্মকে তাড়িত করে যেসব কর্ম সর্বদা নৈতিকভাবে বাধ্যতামূলক। এ সংক্রান্ত *ঐশ্বরিক আজ্ঞা* মতবাদ অনুসারে, কোনো কাজ বা ক্রিয়া কেবল তখনই সঠিক বা ভুল হবে যখন স্বয়ং ঈশ্বর কোনো ক্রিয়াকে আজ্ঞাপিত বা নিষিদ্ধ করবে।[১০]তাই অতীব কঠোর নীতিপরায়ণ জন প্রেস্টন মনে করেন কোনো কিছু ভালো এজন্য যে, ঈশ্বর তাকে ভালো বলেছেন।[১১]এদিক থেকে বলা যায় যে, ধর্ম থেকেই নৈতিকতার উদ্ভব। মহাত্মা গান্ধীও মনে করতেন যে, ধর্ম ও নৈতিকতা সত্য; এবং একে অপরের উপর নির্ভরশীল।[১২] সুতরাং বলা হয়, ধর্মের নৈতিক আদর্শগুলো আলোচনা করা ধর্মীয় নৈতিকতার কাজ। ধর্ম মানুষকে তার পরম প্রভুর আনুগত্য ও সহজ-সরল তথা মঙ্গলের পথে চলতে; সকল ধরনের অমঙ্গল কাজ থেকে বিরত থাকতে বলে। এদিক থেকে ধর্ম ও নৈতিকতার লক্ষ্য অভিন্ন।

ধর্ম নিরপেক্ষ নৈতিকতা

পৃথিবীতে যতো নৈতিক নীতি রয়েছে তার মোটা একটা অংশ ধর্ম থেকে উৎসারিত হলেও এমন কিছু বিধান রয়েছে যেগুলো সরাসরি ধর্মের কোনো বিধান নয়। সমাজ তার নিজের প্রয়োজনে এবং

---

[৪] মোহাম্মদ আবদুল হাই (সম্পাদিত), *বাঙালির ধর্মচিন্তা* (ঢাকা: সূচীপত্র, ২০১৪), পৃ. ৩৩।

[৫] তদেব।

[৬] এম. মতিউর রহমান, *ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃতি* (ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৮), পৃ. ৭২।

[৭] আনোয়ারুল্লাহ ভুঁইয়া, *শিক্ষাদর্শন:*, পৃ. ৮২।

[৮] নীরুকুমার চাকমা, *বুদ্ধ: ধর্ম ও দর্শন* (ঢাকা: অবসর, ২০০৭), পৃ. ৬৪।

[9] R.N Sharma, *Introduction to Ethics* (Delhi: Surject Publications, 1993), p. 23.

[10] W. K. Frankena, *Ethics*, 2nd ed. (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1973), p. 28.

[11] Janine Marie Idziak, "Divine Commands Are the Foundation of Morality", *in Contemporary Debates in Philosophy of Religion*,ibid, 291.

[১২] D.M. Datta, *The Philosophy of Mahatma Gandhi* (Calcutta: Calcutta University Press, 1968), 83.

সংস্কৃতির সমন্বয়ের ফলে এগুলো তৈরি করে। এদিক থেকে বলা যায়, সমাজে প্রচলিত প্রথা রীতি-নীতি অনুসরণ করার ফলে যে অভ্যাস তৈরি হয় এবং চরিত্র বা আচরণ গঠিত হয় সেই আচরণের ভালো-মন্দ, উচিত-অনুচিত প্রভৃতির মূল্যায়ন করাই ধর্ম নিরপেক্ষ নৈতিকতা। ধর্ম ইহলোক এবং পরলোক উভয়কে কেন্দ্র করে নৈতিক নীতি প্রণয়ন করলেও ধর্ম নিরপেক্ষ নৈতিকতার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ইহলোকের মঙ্গল দিকটির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। ধর্মীয় নৈতিকতার বিপরীতে একদল দার্শনিক[১৩] প্রাকৃতিক বিধানকে নৈতিকতার ভিত্তি হিসেবে যুক্তি দেন। ধর্ম সর্বজনীন নৈতিকতার কথা বললেও রাসেল মনে করেন নৈতিক মূল্যবোধ শাশ্বত কোনো কিছু নয় বরং দেশ-কাল-সময়ের প্রেক্ষিতে তা ভিন্নরূপ হয়।[১৪] আর প্রয়োগবাদী দার্শনিকগণ উইলিয়াম জেমস, জন ডিউই, এবং এফ. সি. এস শিলার নৈতিকতাকে প্রায়োগিক উৎকর্ষ দ্বারা বিচার করেছেন। তাঁদের মতে কোনো আচরণ তখনই ভালো হবে যখন এটি ব্যবহারিকভাবে ভালো ফল প্রদান করবে। অভিজ্ঞতামূলক প্রমাণে যেটি ভালো সেটিই নৈতিক আচরণ।[১৫] এ সংক্রান্ত *অলৌকিক বিধি তত্ত্ব* অনুসারে যে কর্ম মানুষের স্বভাবসিদ্ধ তাই সঠিক আর যা মানুষের স্বভাব বিরুদ্ধ তাই ভ্রান্ত।[১৬]কার্ল মার্কস মনে করেন, যতোদিনপর্যন্ত সমাজে শ্রেণি-বৈষম্য দূর না হবে ততোদিন পর্যন্ত নৈতিকতা ফলপ্রসু হবে না। কেননা পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার নৈতিকতা ও প্রলেতারিয়েট বা সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণির নৈতিকতা এবং চিন্তা-ভাবনা ভিন্ন রকম।[১৭] ফ্রেডরিক নীটশে মানুষের নৈতিকতার ক্ষেত্রে শ্রেণিবিভাগের পক্ষপাতি। তাঁর মতে সমাজের প্রভুদের জন্য প্রভু নৈতিকতা এবং দাস শ্রেণির জন্য দাস নৈতিকতা প্রণয়ন করতে হবে।[১৮] সুতরাং বলা যায় যে, ধর্ম নিরপেক্ষ নৈতিকতা স্থান-কাল, শ্রেণি-বর্ণ-লিঙ্গভেদে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। এর কোনো সার্বজনিন স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম নেই।

নৈতিকতা প্রসঙ্গে নজরুলের অবস্থান

নজরুল মানুষের মধ্যে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণি-পেশা-লিঙ্গভেদে পার্থক্য করেন নি। তিনি সকল মানুষকে দেখেছেন স্রষ্টার সৃষ্টি মহামানব হিসেবে; যেখানে কেউ কারো প্রভু নয়, সবাই সমান। ধনী-গরিব, রাজা-প্রজা, মালিক-শ্রমিক, নারী-পুরুষ সবাই তাঁর নিকট সমান। নজরুলের এই দৃষ্টিভঙ্গির সাথে ধর্মের দৃষ্টিভঙ্গি অভিন্ন। যেমন ইসলাম ধর্ম মানুষের মধ্যকার ভেদজ্ঞানকে অস্বীকার

[১৩] এই দার্শনিকগণ প্রকৃতিবাদী তথা বস্তুবাদী দার্শনিক হিসেবে খ্যাত।

[14] Bertrand Russell, *An Outline of Philosophy* (London: George and Allen and Unwin Ltd, 1961), p. 263.

[15] William James, *Pragmatism: A New Name for some old Wage of Thinking* (New York: Longman's Green & Co., 1959), p. 119.

[16] D. J. O'Connor, *Aquinas and Natural Law*(London: Macmillan, 1967), p. 68-73.

[১৭] মোঃ মোজাহার আলী, "বাংলাদেশ দর্শনে ধর্ম, নৈতিকতা ও মানবতাবাদ: একটি দার্শনিক বিশ্লেষণ"(এমফিল থিসিস, দর্শন বিভাগ, রাজশাহীবিশ্ববিদ্যালয়), পৃ. ৭০।

[১৮] মোঃ শওকত হোসেন, *সমকালীন পাশ্চাত্য দর্শনের রূপরেখা* (ঢাকা: তিথী পাবলিকেশন, ১৯৮৮), পৃ. ৬১-৬৩।

করেছে। যোগ্যতাসম্পন্ন হাবশীকে শাসক হওয়ার সুযোগ রেখে তার অনুগত হতে সবাইকে নির্দেশ দিয়েছে। তাছাড়া ইসলামের নবি (সা.) এবং ইসলামের খলিফাদের সততা ও আড়ম্বরপূর্ণ নৈতিক জীবন নজরুলকে আকৃষ্ট করেছে। যেমন 'উমর ফারুক' কবিতায় তিনি খলিফা উমর (রা.) কর্তৃক ভৃত্যকে উটের পিঠে নিয়ে এর উটের রশি ধরে টানা, অন্য ধর্মীয় উপাসনালয়কে সংরক্ষণ করা, বিলাসহীন জীবনযাপন, ন্যায়পরতা প্রভৃতি দিক ফুটিয়ে তুলেছেন। খলিফার মাহাত্ম বর্ণনাই নজরুলের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়; বরং এর মাধ্যমে ব্যক্তিমানুষ ও রাষ্ট্রপ্রধানদেরকে নৈতিক জীবনের প্রতি আগ্রহী করা তার অন্যতম লক্ষ্য।

ফলে ধর্মনিরপেক্ষ নৈতিক মতবাদীদের শ্রেণিবৈষম্যমূলক মতবাদকে গ্রহণ করা নজরুলের পক্ষে সম্ভব হয় নি। এজন্য মার্কসবাদী সাম্যবাদের দ্বারা জীবনের এক পর্যায়ে প্রভাবিত হলেও তৎকালীন সময়ে সাম্যবাদের সাথে নাস্তিক্যবাদের সম্পর্ক থাকায় নজরুল শেষ পর্যন্ত মার্কসবাদী সাম্যবাদের সাথে না থেকে ইসলামি সাম্যবাদীতে আশ্রয় নেন। আর এর পেছনে ইসলামের মানবপ্রেমের বিধানসমূহ নজরুলকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। এ প্রসঙ্গে আহমদ শরীফ মনে করেন, ইসলামের প্রতি আস্থা স্থাপনে ও বিশ্ব মুসলিম ভ্রাতৃত্বের প্রতি বিশ্বাসের পেছনে রয়েছে ইসলামের মানবপ্রেমের বিধানসমূহ। কবি জীবনের যা ব্রত ইসলামের মতো আর কোনো ধর্ম এত দৃঢ়তার সঙ্গে এমন স্পষ্ট করে বলেনি।[১৯] তাই নজরুলসব কিছুকে ধর্মীয় দৃষ্টিতে দেখার পক্ষপাতি। ফলে তিনি যখনই কোনো নৈতিক আদেশ দিয়েছেন তা কোনো না কোনোভাবে ধর্মীয় নৈতিকতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়েছে। ধর্মের প্রতি আনুগত্যশীল নজরুল মনে করেন কুসংস্কারমুক্ত ধর্মের বিধানের মধ্যেই রয়েছে প্রকৃত মানবকল্যাণ। তাই মানুষের আলোচনায় তিনি বারবার ফিরে গেছেন স্রষ্টার কাছে; স্রষ্টার উদারতা, করুণা, পক্ষপাতহীনতার উদাহরণ দিয়ে মানুষকে আহ্বান করেছেন উদারতার, পক্ষপাতহীনতার। স্বাধীনতার আলোচনাতেও মুসলিম শাসকদের বীরত্বের পাশাপাশি অর্জুনের, হযরত আলী (রা.) ও খালেদ (রা.) এর বীরত্বকে তিনি সামনে এনেছেন। শিক্ষা ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদেরকে ধর্মীয় নৈতিক শিক্ষা প্রদানের প্রতি তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর সাম্য ও রাজনৈতিক আলোচনাতেও ধর্মীয় নৈতিকতার দিকটি স্পষ্ট।

শিক্ষা ও নৈতিকতা

একটি আদর্শ রাষ্ট্রব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত কোনো বিষয়ই নজরুলের দৃষ্টির বাহিরে যায়নি। শিক্ষা বিষয়ক নৈতিক আলোচনা তাঁর সাহিত্যে বর্তমান রয়েছে। শিশুশিক্ষা ও নারীশিক্ষার প্রতিও তাঁর ছিলো স্বতন্ত্র দর্শন। এ অংশে শিক্ষা ও নৈতিকতা বিষয়ক নজরুলের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা হলো।

---

[১৯] আহমদ শরীফ, *আহমদ শরীফ রচনাবলী*, ১ম খণ্ড, সম্পা. আহমদ কবির (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২০১০), পৃ. ২২৮।

শিক্ষার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও নৈতিকতা

শিক্ষা মানুষকে মানবসম্পদে রূপান্তরের একটি উত্তম হাতিয়ার। আদর্শ শিক্ষা হলো এমন একটি ব্যবস্থা, যা শিক্ষার্থীর শরীর ও মন উভয়েরই যুগপৎ উৎকর্ষ সাধন করে। ভবিষ্যৎ জাতিগঠন ও সমৃদ্ধি অর্জনে এর থেকে উৎকৃষ্ট বিকল্প নেই। দেশের মর্যাদা, সমৃদ্ধি এবং উন্নতি নির্ভর করে তার শিক্ষাব্যবস্থার উপর। তবে শিক্ষাব্যবস্থায় নৈতিকতার দিকটি উপেক্ষিত হলে শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য ব্যাহত হতে বাধ্য। এজন্য পৃথিবীর সর্বত্রই শিক্ষার ক্ষেত্রে নৈতিকতার দিকটির উপর গুরুত্ব দিতে দেখা যায়। সক্রেটিস থেকে শুরু করে আধুনিককালের হার্বার্ট স্পেন্সার, রাসেল, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ শিক্ষাদার্শনিকদের চিন্তাতে নৈতিকতার দিকটি প্রাধান্য পেয়েছে। সোফিস্ট সম্প্রদায়ের দার্শনিকরা যখন অর্থের বিনিময়ে মানুষকে কূটতর্ক শিক্ষা দিতেন এবং নৈতিক বাছ-বিচারের তোয়াক্কা করতেন না তখন সক্রেটিস মনে করতেন মানুষের নৈতিক জ্ঞান হলো জীবনের অমূল্য সম্পদ। জ্ঞান বা পাণ্ডিত্যকে তিনি 'পরম পুণ্য' হিসেবে দেখেছেন। তিনি মনে করতেন পদার্থবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা এবং গণিতসহ অন্যসব জ্ঞানও নৈতিক জ্ঞানের অধীন।[২০] বঙ্কিমের 'ধর্মতত্ত্ব' প্রবন্ধের 'জ্ঞানিক উন্নতি ভিন্ন নৈতিক উন্নতি সম্ভব নয়' উক্তির মধ্যে রয়েছে এই দর্শনের মূলকথা। নজরুল মানুষের মুক্তির জন্য নৈতিক শিক্ষাকে দেখেছেন সর্বোৎকৃষ্ট উপায় হিসেবে। তিনি মনে করতেন মানুষকে যদি মনের দিক থেকে স্বাধীন করা যায়, চেতনাকে জাগ্রত করা যায়, নৈতিক মানুষে রূপান্তরিত করা যায় তাহলে মানবতার মুক্তি সম্ভব হবে এবং মানুষের ধর্ম 'মনুষ্যত্ব' প্রতিষ্ঠিত হবে।শিক্ষা মানুষকে মানবিক করে তোলে। এটি পশুবৃত্তির অবদমন করে বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ সাধন করে। কোনো কোনো পাশ্চাত্য দার্শনিককে এ বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করতে দেখা যায়। যেমন জন স্টুয়ার্ট মিল তাঁর উপযোগবাদী দর্শনের ব্যাখ্যায় এ সম্পর্কে বলেন- "সুখী শূকরের চেয়ে অসুখী সক্রেটিস হওয়া অনেক ভালো"[২১]।

যুগে যুগে শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হিসেবে দার্শনিকগণ নৈতিক শিক্ষাকে প্রাধান্য দিয়ে আসছেন। প্রাচীন ভারতের আশ্রমকেন্দ্রিক শিক্ষার অন্যতম একটি লক্ষ্য ছিলো শিক্ষার্থীদেরকে নৈতিক জীবনে অভ্যস্ত করে গড়ে তোলা। প্রাচীন বৈদিক শিক্ষাধারারও অন্যতম লক্ষ্য ছিলো শিক্ষার্থীদেরকে আচার-আচরণ, কৃষ্টি-সংস্কৃতি শিক্ষার পাশাপাশি তাদের ন্যায়বোধ, মানুষের প্রতি মানুষের মমত্ববোধ উজ্জীবিত করা।[২২] বৈদিক ও আশ্রমের শিক্ষাধারা বাংলায় আবহমানকাল ধরে চলে আসলেও ব্রিটিশ আমলে এসে এ ধারা বিঘ্নিত হয়। তারা এ অঞ্চলের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে ধীরে ধীরে ধ্বংস করতে থাকে। কোম্পানি আমলে এডওয়ার্ড এ্যাডাম বাংলার হিন্দু ও মুসলিম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ জরিপ করে যে ফলাফল পান তাতে সারা দেশব্যাপি অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

---

[২০] মোঃ আবদুল হামিদ, *দার্শনিক প্রবন্ধাবলি: তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ*(ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৩), পৃ. ৪৬।

[২১] মমতাজউদ্দীন আহমদ "শিক্ষা-সমস্যা", অন্ত. *শিখা সমগ্র (১৯২৭-১৯৩১)*, সম্পা. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০৩), পৃ. ৯১।

[২২] আনোয়ারুল্লাহ ভূঁইয়া, *শিক্ষাদর্শন:*, পৃ. ৮২।

ছিলো। কিন্তু উনিশ শতকের ত্রিশের দশকে এ্যাডাম যে জরিপ করেন তাতে দেখা যায়, অনেক মুসলিম মাদ্রাসা ও মকতব ধ্বংসের পথে।[২৩] দেশের এই ক্রান্তিকালেও এ দেশীয় কিছু সুবিধাবাদী গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটে। এই সুবিধাবাদী গোষ্ঠীর আবির্ভাব এবং রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার সুযোগে ব্রিটিশরা বাঙালির নিজস্ব সমাজ-সংস্কৃতির শিক্ষা থেকে দূরে রেখে আত্মহননের দিকে ধাবিত করে। মুসলমান-হিন্দুর মধ্যে ইংরেজরা সাম্প্রদায়িক বীজ বোনার অংশ হিসেবে যে শিক্ষাপদ্ধতি চালু করে তাতে কেউ ভাবল 'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ'। ফলে মোল্লা-পুরোহিতদের ব্যাখ্যায় মানুষের ধর্মবোধ আরো জটিল হয়ে উঠে। নজরুল সেই আত্মহননগামী বাঙালিকে তার প্রাচীন ঐতিহ্য সমুন্নত রাখতে স্বকীয়তায় উদ্ভাসিত হওয়ার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। অবশ্য প্রাচীন ঐতিহ্য বলতে কুসংস্কারকে তিনি বুঝান নি। নজরুল মনে করেন একটি জাতিরাষ্ট্রের উন্নতি, তার মর্যাদা অনেকাংশে নির্ভর করে বিদ্যমান শিক্ষাব্যবস্থার উপর। তবে সে শিক্ষাব্যবস্থাকে হতে হয় তার নিজস্ব সমাজ-সংস্কৃতি-ধর্ম প্রভৃতির উপর নির্ভর করে। কেননা শিক্ষা সংক্রান্ত একটি কথা প্রচলিত রয়েছে, সেটি হলো 'শিক্ষা ব্যতীত সংস্কৃতি, সাংস্কৃতিক প্রভাব ব্যতীত শিক্ষা অন্তসারশূন্য'।[২৪] আর স্বকীয়তাই এর মূলমন্ত্র। স্বকীয়তা ত্যাগ করে ভিনদেশী সংস্কৃতির উপর নির্ভর করে কোনো শিক্ষাব্যবস্থা হওয়া উচিত নয় বলে নজরুল মনে করেন। তিনি মনে করেন শিক্ষা, সাহিত্য বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ক্ষেত্রে অন্যের অন্ধ অনুকরণ নৈতিকতার পরিপন্থী। তাই নজরুল বলেন, 'পরকে ভক্তি ক'রে বিশ্বাস করে শিক্ষা হয় পরাবলম্বন, আর পরাবলম্বন মানেই দাসত্ব'[২৫]। তাঁর এই মতটি শিন্তো ধর্মের নৈতিক বিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সেখানে বলা হয়েছে 'বিদেশী শিক্ষার দ্বারা স্বকীয়তাকে হারিও না'[২৬]। এজন্য নজরুল মনে করেন নিজস্ব সংস্কৃতিকে জাতিসত্তাবিরোধী আগ্রাসন থেকে মুক্ত করার জন্য শিক্ষাব্যবস্থাকে যথোপযুক্ত মাত্রায় উন্নীতকরণ ও পুনর্বিন্যাস করা প্রয়োজন; নতুবা পরের দাসত্ববরণ করতে হয়। এ প্রসঙ্গে "সত্য-শিক্ষা" প্রবন্ধে তিনি বলেন-

> বিজাতীয় অনুকরণে আমরা ক্রমেই আমাদের জাতীয় বিশেষত্ব হারাইয়া ফেলিতেছি। অধিকাংশ স্থলেই আমাদের এই অন্ধ অনুকরণ হাস্যাস্পদ 'হনুকরণে' পরিণত হইয়া পড়িয়াছে। পরের সমস্ত ভালো-মন্দকে ভালো বলিয়া মানিয়া লওয়ায়, আত্মা, নিজের শক্তি ও জাতীয় সত্যকে

---

[২৩] আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস: মুসলিম বিজয় থেকে সিপাহী বিপ্লব পর্যন্ত [১২০০-১৮৫৭]* (ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০১২), পৃ. ৩১৫।

[২৪] আনোয়ারুল্লাহ ভূঁইয়া,*শিক্ষাদর্শন:*, পৃ. ১১৯।

[২৫] কাজী নজরুল ইসলাম, "মোরা সবাই স্বাধীন মোরা সবাই রাজা", 'দুর্দিনের যাত্রি' *নজরুল-রচনাবলী*, ২য় খণ্ড, রফিকুল ইসলাম সম্পা: জন্মশতবর্ষ সংস্করণ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ৪০৬। অতপর খণ্ডসংখ্যাসহ 'নর' লিখিত হবে।

[২৬] Selwyn Gurney Champion and Dorothy Short, *Readings from World Religions*(New York: Fawcett Publications, 1950), p. 51.

নেহায়েৎ খর্ব করা হয়। নিজের শক্তি, স্বজাতির বিশেষত্ব হারানো মনুষ্যত্বের মস্ত অবমাননা। স্বদেশের মাঝেই বিশ্বকে পাইতে হবে, সীমার মাঝেই অসীমের সুর বাজাইতে হইবে।[২৭]

জৈন দার্শনিকদের শিক্ষার মূল লক্ষ্য ছিলো মানুষকে 'আত্মসচেতন' করে গড়ে তোলা। আত্মনির্ভরশীল ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব বৌদ্ধিক ও নৈতিক জ্ঞান অর্জন করা।[২৮] নজরুলও চাইতেন মানুষের মধ্যকার আত্মজ্ঞানকে তথা জীবনীশক্তিকে জাগিয়ে তুলতে। আত্মনির্ভরতার কথা নজরুল তাঁর *ধূমকেতু* এর তৃতীয় পৃষ্ঠায় 'সারথির পথের খবর'-এ বলেন এভাবে- "পরাবলম্বনই আমাদের নিষ্ক্রিয় করে ফেললে। একেই বলে সবচেয়ে বড় দাসত্ব। অন্তরে যাদের এত গোলামীর ভাব, তারা বাইরের গোলামী থেকে রেহাই পাবে কি করে ?"[২৯] 'জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়' প্রবন্ধে শিক্ষার লক্ষ্য কি হওয়া উচিত সে সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন-

> আমাদের শিক্ষা পদ্ধতি এমন হউক, যাহা আমাদের জীবনীশক্তিকে ক্রমেই সজাগ, জীবন্ত করিয়া তুলিবে। যে-শিক্ষা ছেলেদের দেহ-মন দুইটিকেই পুষ্ট করে তাহাই হইবে আমাদের শিক্ষা।... এই দুই শক্তিকে–প্রাণ-শক্তি আর কর্মশক্তিকে একত্রীভূত করাই যেন আমাদের শিক্ষার বা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হয়, ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।[৩০]

নজরুল মনে করেন আত্মনির্ভরশীলতার পথে সবচেয়ে বড় বাধা হলো আত্মপ্রবঞ্চনা। আর ফাঁকি দিয়ে বাহবা নেওয়া এক প্রকার আত্মপ্রবঞ্চনা। নজরুল মনে করেন যে তার অন্তরের সত্যকে মেনে নেয় সে দিন দিন আত্মপ্রত্যয়ী হয়, তার উন্নতি হয় কিন্তু যে ফাঁকির মাধ্যমে খ্যাতি পেতে চায় সে মনের অনুশোচনা বা অনুতাপ দ্বারা বিদ্ধ হয়। দিন দিন সে ক্রমেই ভীরু, কাপুরুষ হয়ে উঠে। তাই নজরুল বলেন-

> আর বাংলা হয়ে পড়েছে ফাঁকির বৃন্দাবন। কর্ম চাই সত্য, কিন্তু কর্মে নামবার বা নামাবার আগে এই শিক্ষাটুকু ছেলেদেরে, লোকদেরে রীতিমত দিতে হবে যে, তারা যেন নিজেকে ফাঁকি দিতে না শেখে, আত্মপ্রবঞ্চনা করে করে নিজেকেই পীড়িত করে না তোলে।[৩১]

নজরুলের মতে নিজের অপমান তথা আত্মপ্রবঞ্চনার চেয়ে বড় প্রবঞ্চনা আর নেই। আত্মমর্যাদার প্রশ্নে নজরুলের দৃঢ়তা লক্ষণীয়। 'ব্যথার দান' গ্রন্থের স্বত্ব মাত্র একশো টাকায় বিক্রি করে দিয়েছিলেন তবুও আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে নজরুল আপোস করেন নি।[৩২]

নজরুলের মতানুসারে শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত যুগের চাহিদানুযায়ী। দেশের অভ্যন্তরে নৈতিকতার অবক্ষয় চরম পর্যায়ে গেলে তরুণদের শিখাতে হবে নৈতিকতার শিক্ষা, দেশ

---

[২৭] "সত্য-শিক্ষা,"'যুগবাণী,' নর ১ম, পৃ. ৪২১।
[২৮] আনোয়ারুল্লাহ ভুঁইয়া, *শিক্ষাদর্শন:*, পৃ. ১৮৯।
[২৯] গোলাম মুরশিদ, *বিদ্রোহী রণক্লান্ত: নজরুল জীবনী* (ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন, ২০১৮), পৃ. ১৫১।
[৩০] "জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়," 'যুগবাণী,'নর ১ম, পৃ. ৪২৬।
[৩১] "ধূমকেতু'র পথ," 'রুদ্র.মঙ্গল,' নর ২য়, পৃ. ৪২৯।
[৩২] গোলাম মুরশিদ, *বিদ্রোহী রণক্লান্ত:*, পৃ. ১১১।

পরাধীনতার কবলে শেখাতে হবে দেশপ্রেমের শিক্ষা। যেমনটি ঘটেছিলো হবসের সময়। তাঁর সময়ে শিক্ষা ফ্যাসিবাদী মানসিকতা তৈরিতে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করেছিলো।[৩৩] রুশ বিপ্লবের পূর্বাপর শিক্ষাকৌশলের ভিন্নতার মধ্যেও সেটি লক্ষণীয়। পেলোনেসিয়ার যুদ্ধে এথেন্সের পরাজয় দেখে সক্রেটিস বুঝতে পেরেছিলেন এর জন্য দায়ী শাসক শ্রেণির অদক্ষতা, অযোগ্যতা ও অসততা। তাই তিনি তরুণদের মধ্যে দেশপ্রেমের ও সততার শিক্ষা প্রচার শুরু করেন। আর প্লেটো সকলকে বাধ্যতামূলকভাবে সামরিক প্রশিক্ষণের কথা বলেন। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের শিক্ষাদর্শন ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শিক্ষাদর্শন এক নয়। ফলে একটি ভূখণ্ডের সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, ও সাংস্কৃতিক প্রভৃতি বিষয়ের উপর নির্ভর করে সে ভূখণ্ডের শিক্ষানীতি বা শিক্ষাদর্শন প্রণীত হওয়ার কথা। অথচ ভারতের পরাধীনতার সময় যুবকদের বীরত্বের শিক্ষা না দিয়ে সংযমের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছিল। নজরুল এর তীব্র সমালোচনা করেন। তাঁর মতে শাসকরা তরুণদের এই শিক্ষা দেয় যাতে করে গোলামির সিংহাসনে বসে ‘গুড়ুক’ টানতে পারে। নজরুল বলেন-

ওরে অশান্ত দুর্বার যৌবন
পরাল কে তোরে জ্ঞানের মুখোশ সংযম-আবরণ।
ভিতরের ভীতি ঢাকিতে রে যত নীতি-বিলাসীরা ছলে
উদ্ধত যৌবন-শক্তিরে সংযত হতে বলে।
ভাবে, ভাঙনের গদা লয়ে যদি যৌবন মাতে রণে,
গুড়ুক টানিতে পারিবে না বসে সোনার সিংহাসনে ![৩৪]

নজরুল নাগরিকদেরকে দেশপ্রেমেরশিক্ষা দেওয়াকে শিক্ষার অন্যতম একটি লক্ষ্য হিসেবে দেখেছেন। তাঁর কাছে দেশপ্রেম আর মানবপ্রেম ছিলো সমার্থক। দেশপ্রেম সকলের মধ্যে উজ্জীবিত না হলে যে ব্রিটিশদের নিকট থেকে স্বাধীনতা অর্জন করা সম্ভব নয় তা নজরুল স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলেন। এজন্য দেশপ্রেমের শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন-“তাহারা শিখিবে দেশের কাহিনী, জাতির বীরত্ব, ভ্রাতার পৌরুষ, স্বধর্মের সত্য-দেশের ভাইয়ের কাছ হইতে, তাহারা শিখিবে বীরের আত্মোৎসর্গ, কর্মীর ত্যাগ ও কর্ম, নির্ভীকের সাহস, দেশের উদাহরণে উদ্বুদ্ধ হইয়া,- ইহা কি কম আনন্দের কথা।”[৩৫]

মানুষকে মানবিক করে গড়ে তোলা শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হওয়া উচিত বলে নজরুল মনে করেন। ‘মানুষ-ধর্ম’ তাঁর নিকট সবচেয়ে বড় ধর্ম। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন-“প্রথমে আমাদিগকে মানুষ হইতে হইবে, স্বার্থের মায়া ত্যাগ করিয়া সত্যকে বড় করিয়া দেখিতে শিখিতে হইবে, তাহার পর যেন বড় কাজে হাত দিই।”[৩৬]অক্ষয়কুমার দত্তের চিন্তাতেও নজরুলের এই চিন্তার প্রতিফলন রয়েছে। দার্শনিক প্লেটো, এরিস্টটল প্রমুখের ন্যায় নজরুলও মনে করেন শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া

[৩৩] আনোয়ারুল্লাহ ভূঁইয়া, *শিক্ষাদর্শন:*, পৃ. ২৯।
[৩৪] “দুর্বার যৌবন,” ‘নতুন চাঁদ,’ নর ৬ষ্ঠ, পৃ. ৩০।
[৩৫] “সত্য-শিক্ষা,”‘যুগবাণী,’ নর **১**ম, পৃ. ৪২২।
[৩৬] “জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়,”নর **১**ম, পৃ. ৪২৬।

উচিত নৈতিকভাবে নাগরিকের সকল গুণের উৎকর্ষ সাধন। যেখানে কোনো লোভ, ঈর্ষা, হিংসা থাকবে না।[৩৭] শিক্ষার্থীকে নৈতিকতা ও মানবিকতার শিক্ষা দেওয়া না হলে তারা যে কতো ভয়ঙ্কর হতে পারে তা সাম্প্রতিক কালের বিশ্বজিৎ, রিফাত, আবরার হত্যাকাণ্ডসহ দিবালোকে মানুষ হত্যার অসংখ্য ঘটনা প্রমাণ করে।

নারীশিক্ষা ও নৈতিকতা

নারীশিক্ষার ব্যাপারে নজরুল ছিলেন সোচ্চার। সমাজের অর্ধেক জনসংখ্যাকে অজ্ঞতার অন্ধকারে রেখে দেশের ও জাতির উন্নতি যে সম্ভব নয় তা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। শিক্ষার চরম লক্ষ্য হলো মানবতার সুষ্ঠ বিকাশ।[৩৮] কিন্তু ভারতবর্ষে মানুষের শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্ম নিয়ন্ত্রিত হতো তাদের কুলগত বৃত্তি দিয়ে।[৩৯] সেখানে নারীশিক্ষা ছিলো কল্পনার অতীত। উনিশ শতকের প্রথম দিকে নারীশিক্ষা প্রায় নিষিদ্ধ বলেই বিবেচিত হতো।[৪০]তৎকালীন সমাজে নারী ছিলো গৃহকোণে বন্দী; তাদের মতপ্রকাশ ও শিক্ষা গ্রহণের স্বাধীনতা ছিলো না। শতাব্দীর পর শতাব্দী জুড়ে শিক্ষার অভাব নারীকে পরাধীন, শৃঙ্খলিত ও বৈষম্যপীড়িত করেছে।[৪১] নারী শিক্ষার ফলে তাদের ক্ষমতায়ন হোক, আপন মৃত্তিকার উপর দাঁড়াক, পুরুষের চোখে নয় নিজের চোখে বিশ্ব দেখুক, সামাজিক গুরুত্ব বৃদ্ধি পাক তা পুরুষতান্ত্রিক ও গোঁড়া ধার্মিকদের নিকট উপেক্ষিত ছিলো। মেয়েরা পড়ালেখা করলে বিধবা হবে এবং জাতকুল নষ্ট হবে এ ধরনের কুসংস্কার চালু ছিলো এবং এমন ধারণাও করা হতো যে নারীদের বুদ্ধি পুরুষদের তুলনায় কম।[৪২]

'স্ত্রীশিক্ষা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাকে বিশুদ্ধ জ্ঞান ও ব্যবহারিক জ্ঞান এই দু'টি শ্রেণিতে বিভক্ত করেন।[৪৩] স্বতন্ত্র জীবনচেতনার কথা বিবেচনা করে নারীদের ক্ষেত্রে তিনি বিশুদ্ধ জ্ঞানের পাশাপাশি ব্যবহারিক সেইসব জ্ঞানের উপর জোর দেওয়ার কথা বলেন যেগুলো আদর্শ গৃহিণী ও জননী হবার ক্ষেত্রে উপযোগী।[৪৪] আর রুশো নারীকে দেখেছেন সৌন্দর্যের প্রতীক, বিনয়ী, ভদ্র ও অনুগত সতী-সাধ্বী নারী হিসেবে। তাঁর মতে নারীর সমস্ত শিক্ষা হবে পুরুষের জন্য; নারীরা পুরুষকে খুশী করবে, তাদের কাছে প্রয়োজনীয় হয়ে উঠবে, বালক শিশুদের শিক্ষা প্রদান করবে, বড় হয়ে উঠলে দেখাশোনা করবে, পুরুষকে সান্ত্বনা দিবে, তাদের জীবনকে সহজ ও সুন্দর করে

---

[৩৭] মোঃ মোজাহার আলী, বাংলাদেশ দর্শনে ধর্ম, নৈতিকতা ও মানবতাবাদ:,পৃ. ৮৭।

[৩৮] অনীক মাহমুদ, *চিরায়ত বাংলা: ভাষা সংস্কৃতি রাজনীতি সাহিত্য* (ঢাকা: আফসার ব্রাদার্স, ২০০০), ১৭০।

[৩৯] গোলাম মুরশিদ, *নারীপ্রগতির একশো বছর: রাসসুন্দরী থেকে রোকেয়া* (ঢাকা: অবসর, ২০১৩), পৃ. ৩।

[৪০] মোবারা সিদ্দিকা, *আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মহিলাদের অবদান: হানা ক্যাথরিন ম্যালেন্স থেকে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০৭), পৃ. ৮।

[৪১] শিপ্রা সরকার "শিক্ষা ও উন্নয়ন: পারস্পরিক সম্পর্ক,"*দর্শন ও প্রগতি*,বর্ষ-৩৩, ১ম ও ২য় সংখ্যা ২০১৬, পৃ. ১৩৪।

[৪২] মোবারা সিদ্দিকা, আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মহিলাদের অবদান:,পৃ. ৮।

[৪৩] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'স্ত্রীশিক্ষা', অন্ত.*শিক্ষা*, দ্বিতীয় সং, (ঢাকা: বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ২০১৬), পৃ. ১৩০।

[৪৪] শিপ্রা সরকার, *রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শনে উন্নয়ন-ভাবনা*, পৃ. ৫৪।

গড়ে তুলবে।[৪৫] কিন্তু নজরুল মনে করেন নারীরা পুরুষের মতোই শিক্ষা নিবে। নারী-পুরুষে তিনি প্রভেদ করেন নি। পুরুষের মতো শিক্ষা গ্রহণকে তিনি ধর্মের নির্দেশ হিসেবে দেখেছেন। কেননা পবিত্র কোরআনের কোথাও নারী-পুরুষে কোনো প্রভেদ করা হয় নি। ইসলামে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্য জ্ঞান অর্জন করা ফরজ করা হয়েছে। কিন্তু পর্দাপ্রথার অপব্যাখ্যার মাধ্যমে নারীদের গৃহকোণে আবদ্ধ রেখে শিক্ষা গ্রহণ থেকে দূরে রাখা হচ্ছিলো। নজরুল এর সমালোচনা করে নারীদেরকে শিক্ষাক্ষেত্রে অংশগ্রহণের জন্য পরামর্শ দেন। তিনি বলেন–

> কন্যাকে পুত্রের মতোই শিক্ষা দেওয়া যে আমাদের ধর্মের আদেশ, তাহা মনেও করিতে পারি না। আমাদের কন্যা-জায়া-জননীদের শুধু অবরোধের অন্ধকারে রাখিয়াই ক্ষান্ত হই নাই, অশিক্ষার গভীরতর কূপে ফেলিয়া হতভাগিনীদের চিরবন্দিনী করিয়া রাখিয়াছি। আমাদের শত শত বর্ষের এই অত্যাচারে ইহাদের দেহ-মন এমনি পঙ্গু হইয়া গিয়াছে যে, ছাড়িয়া দিলে ইহারাই সর্বপ্রথম বাহিরে আসিতে আপত্তি করিবে। ইহাদের কি দুঃখ, কিসের যে অভাব, তাহা চিন্তা করিবার শক্তি পর্যন্ত ইহাদের উঠিয়া গিয়াছে। আমরা মুসলমান বলিয়া ফখর করি, অথচ জানি না–সর্বপ্রথম মুসলমান নর নহে–নারী।[৪৬]

শিশুশিক্ষা ও নৈতিকতা

শিশুশিক্ষা নিয়েও নজরুলের রয়েছে স্পষ্ট অভিমত। তিনি মনে করেন মানুষের মধ্যে শ্রেয়োবোধ জাগিয়ে দেওয়া উচিত শিশুকাল থেকেই। তাঁর মতানুসারে, শিশুর পাঠযোগ্য পরিবেশ তৈরি করতে না পারলে শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য ব্যাহত হতে বাধ্য। কেননা শিশু তার চারদিকের পরিবেশ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। শিক্ষক, পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন তার অনুকরণীয় ব্যক্তি। কাজেই যাদেরকে সে অনুসরণ করবে তাদেরকে সদগুণসম্পন্ন হতে হবে। তাদেরকে নৈতিকতার শিক্ষা দিতে হবে। এরিস্টটলও মনে করতেন নৈতিকতার ক্ষেত্রে নৈতিক উৎকর্ষতা যা অভ্যাসের দ্বারা গঠিত হয় এবং শিশুর চারপাশের পরিবেশ নৈতিক শিক্ষার জন্য অপরিহার্য।[৪৭] শিশুশিক্ষার ধরণ এবং তাদের শিক্ষাকৌশল কেমন হবে তার ইঙ্গিত পাওয়া যায় নজরুলের 'মক্তব সাহিত্যে'।

জন লক মনে করেন পানিকে যেমন যেদিকে ইচ্ছা পরিচালিত করা যায়, তেমনি কোমলমতি শিক্ষার্থীদের মনকেও ইচ্ছামতো গড়ে তোলা যায়। এজন্য তিনি এমন শিক্ষার উপর জোর দিতে বলেন যে শিক্ষা শিক্ষার্থীদের মনন, সংযম, এবং উপযুক্ত নাগরিক করে গড়ে তুলতে পারে।[৪৮] নজরুলও শিশুদেরকে শুধু ছেলে ভুলানো ছড়া বা শুধু পুঁথিগত বিদ্যায় পারদর্শী করতে চান নি বরং মনন বিকাশের মাধ্যমে আদর্শ ও মনুষ্যত্বসম্পর্ণ পরিণত মানুষ তৈরি করতে চেয়েছিলেন। শিশুদের

---

[৪৫] আনোয়ারুল্লাহ ভূঁইয়া, শিক্ষাদর্শন:, পৃ. ৩১৯।

[৪৬]"অবরোধ ও স্ত্রী-শিক্ষা," 'অভিভাষণ,' নর ৮ম, পৃ. ১২।

[৪৭] মোঃ আব্দুল মুহিত, "নীতিদর্শনে এরিস্টটলের সদগুণ: নীতিবিদ্যার প্রাসঙ্গিকতা,"*দর্শন ও প্রগতি*, পৃ. ৪৪।

[৪৮] আমিনুল ইসলাম, আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শন, ৪র্থ সং (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০০), পৃ. ১৪৪।

উদ্দেশ্যে নজরুলের যে সকল রচনা রয়েছে তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, তিনি শিশুদেরকে বহুমুখী শিক্ষা প্রদানের প্রতি গুরুত্ব দেন। একটি শিশুকে মানসিকভাবে পরিপুষ্ট করার জন্য তাকে কৌতুক ও হাস্যরসের পাশাপাশি নৈতিক ও বিজ্ঞান শিক্ষা প্রদানের কথা বলেছেন। যেমন কৌতুক ও হাস্যরসের জন্য 'খুকি ও কাঠ বেড়ালী'; শিক্ষামূলক উপদেশ দিতে গিয়ে 'লিচু চোর'; দেশপ্রেম জাগিয়ে তোলার জন্য 'হোঁদল কুঁৎকুতের বিজ্ঞাপন'; আদর্শবাদের শিক্ষা দিতে গিয়ে 'সাত ভাই চম্পা; নীতিশিক্ষার জন্য 'মা'; জাগরণের জন্য 'প্রভাতী'; প্রেরণাতে উদ্বুদ্ধ করার জন্য 'সংকল্প', 'ছোট হিটলার'; সৌন্দর্যের ধারণা তৈরিতে 'সারস পাখি', 'ঝিঙে ফুল', ও 'আগুনের ফুল্‌কী ছোটে'; বাৎসল্য রসের জন্য 'শিশু জাদুকর', 'আবাহন', 'কোথায় ছিলাম আমি'; মানব সেবার কাহিনী শিক্ষায় 'ঈদের দিনে'; এবং কল্যাণধর্মী চেতনা জাগাতে নাটিকা 'পুতুলের বিয়ে' ইত্যাদি রচনা করেছেন।[৪৯]

নজরুল শিক্ষার্থীদের ধর্মীয় শিক্ষার উপর জোর দেন। বাংলার মৌলবীদের উদ্দেশ্যে লিখিত চিঠিতে দেখা যায় শিশুশিক্ষার সবক। সেখানে তিনি বলেন- "জ্ঞানের প্রথম উন্মেষকালে যদি তাহারা ইসলাম ধর্মের, মুসলিম জাতির শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে প্রথম সবক পায়, তাহা হইলেই আমাদের ভবিষ্যত জাতি-গঠনের ইমারতের ভিত্তি পাকা হয়।"[৫০]মুহাম্মদ শহীদুল্লাহও ইসলামের প্রাথমিক যুগের শিক্ষাব্যবস্থাকে পুনরায় চালু করার আহ্বান করেন। তিনি বলেন-"প্রত্যেক মসজিদই আমাদের শিক্ষাগৃহ এবং প্রত্যেক খতিবই আমাদের শিক্ষক। আমরা যদি এঁদের উপযুক্ত ব্যবহার করতে পারি, তবে আমাদের আর কিসের অভাব? রসুল (সা:) এর সময় এরূপই ছিল।"[৫১]

সাহিত্যচর্চা ও নৈতিকতা

ব্রিটিশ ভারতের শ্রেণিখণ্ডিত, ধর্মবিচ্ছিন্ন এবং সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্পে সমাচ্ছন্ন বহুধাবিভক্ত সমাজে জন্মগ্রহণ করেও নজরুল ছিলেন বাংলা সাহিত্যের অবিসাংবাদিত অসাম্প্রদায়িক লেখক।[৫২] সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর অসাম্প্রদায়িক মৈত্রীকামী চেতনা জীবনের প্রারম্ভ থেকেই সক্রিয় ছিলো। আর এজন্য সাহিত্যকে তিনি গ্রহণ করেছেন অশুভের বিরুদ্ধে প্রতিবাদক এবং শুভ ও সুন্দরের পক্ষের হাতিয়ার হিসেবে। তাঁর সাহিত্য রচনার উদ্দেশ্য ছিলো সত্যের প্রতিষ্ঠা। নজরুল সাহিত্যকে দেখেছেন আর্ট হিসেবে। আর আর্টের সংজ্ঞায় তিনি বলেন-"আর্ট-এর অর্থ সত্যের প্রকাশ (execution of truth), সত্য মাত্রই সুন্দর, সত্য চিরমঙ্গলময়। আর্টকে সৃষ্টি; আনন্দ, বা মানুষ

[৪৯] সৈয়দ মোতাহেরা বানু, *নজরুলের শিশু সাহিত্য* (ঢাকা: নজরুল ইন্সটিটিউট, ২০০০), পৃ. ২১-২।

[৫০]"পত্রাবলী," নর ৯ম, পৃ. ২৬২।

[৫১] মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, "বাংলায় মুসলিম পুনর্জাগরণে আলিম ও বুদ্ধিজীবীগণের ভূমিকা (১৭০০-১৯৪৭)"(পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, ইসলামিক স্টাডিস বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়), পৃ. ৪৫০।

[৫২] মোহাম্মদ আবদুল হাই, বাঙালির ধর্মচিন্তা, পৃ. ৬৯।

এবং প্রকৃতি (man plus nature) ইত্যাদি অনেক কিছু বলা যাইতে পারে; তবে সত্যের প্রকাশই হইতেছে ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য।"[৫৩] সুতরাং সাহিত্যের তথা সাহিত্যিকদের উচিত হলো সত্যের প্রকাশ করা।

এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ মনে করেন সাহিত্য বলতে ভাবে-ভাবে, ভাষায়-ভাষায়, গ্রন্থে-গ্রন্থে, মানুষে-মানুষে, অতীত-বর্তমানের, দূরের-নিকটের অন্তরঙ্গ যোগসাধন বোঝায়।[৫৪] বঙ্কিম সাহিত্য ও ধর্মের উদ্দেশ্যকে এক করে দেখেছেন। উভয়ই সত্য সন্ধানী; যা সত্য তাই ধর্ম, আর যা ধর্ম তাই সাহিত্য।[৫৫]মহাকবি আলাওল সেসব কবিকে 'ঈশ্বরের শিষ্য' বলেছেন যাঁরা মানুষের কল্যাণের জন্য, সত্য ও সুন্দরের প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁদের সাহিত্যকর্ম নিবেদন করেন। আলাওল বলেন-

কদাচিত কবি নহে সামান্য মনুষ্য
শাস্ত্রে কহে কবিগণ ঈশ্বরের শিষ্য ॥[৫৬]

ভালো সাহিত্য যেমন একদিকে মানুষকে মানবিক ও নৈতিক হিসেবে গড়ে তুলতে পারে মন্দ সাহিত্য তেমনি মানুষকে উচ্ছৃঙ্খলতা, নির্লজ্জতা, অমানবিকতা এবং উগ্রতা শিখায়। প্রাবন্ধিক আবদুল হকের (১৯১৮-১৯৯৭) মতে, সাহিত্যের ভূমিকা জাতির জন্য মানবদেহের হৃৎপিণ্ডের মতো। এ হৃৎপিণ্ডের চলন দেখে বোঝা যায় জাতি জীবিত কিনা।[৫৭] অন্যত্র তিনি সাহিত্যকে জীবনের দীপশিখার সঙ্গে তুলনা করেছেন। তাঁর মতে এ হচ্ছে সমাজের চেতনার দীপশিখা। এই দীপশিখা সমাজের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এবং সবদিকে আলোক বিকিরণ করে, সমাজকে আত্মঅবলোকনে ও বিশ্ব-অবলোকনে, সংহত আত্মচেতনায় ও আত্মপ্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে।[৫৮] কিন্তু সেই সাহিত্য যদি অপসাহিত্য হয় তাহলে তা বাংলার যুবসমাজকে অধঃপতনের অতলে নিক্ষিপ্ত করবে বলে মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ মনে করেন।[৫৯] একাবিংশ শতাব্দীর এই লগ্নে এসে এটা দিনকে দিন স্পষ্টতর হচ্ছে যে শুধুমাত্র সাহিত্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে যুবসমাজের একটা বড় অংশ ধর্মের নামে অধার্মিক কার্যাবলী ও উগ্রতার দিকে ধাবিত হচ্ছে। আবার ঠিক সাহিত্যের দ্বারাই মানুষের মধ্যে ধর্মীয় সহনশীলতা, পরমতসহিষ্ণুতার দীক্ষা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। ফলে সাহিত্যের

---

[৫৩] "বাংলা সাহিত্যে মুসলমান," 'যুগবাণী,' নর ১ম, পৃ. ৩৯০।

[৫৪] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, " বাংলা জাতীয় সাহিত্য",'সাহিত্য', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, ৪র্থ খণ্ড (কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৯৮৭),পৃ.৬৬৫।

[৫৫] বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *বঙ্কিম রচনাবলী*, ২য় খণ্ড (কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ১৯৬৯), পৃ. ২৫৮।

[৫৬] আলাওল, সতীময়না, উদ্ধৃতি:মোহাম্মদ আবদুল কাইউম, *নানা প্রসঙ্গে নজরুল*, ২য় সং (ঢাকা: নজরুল ইন্সটিটিউট, ২০১৪), পৃ. ২২।

[৫৭] আবদুল হক,*সাহিত্য ও স্বাধীনতা*(ঢাকা: বাংলা একাডেমি,১৯৭৪), পৃ.২৫।

[৫৮] তদেব, পৃ. ২৯।

[৫৯] মোশারফ হোসেন খান (সম্পা.), *বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মুসলিম অবদান* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৮), পৃ. ২০৬।

ধরণ কেমন হবে, কোন্ ধরনের সাহিত্য রচনা করতে হবে এ প্রসঙ্গে নজরুলের রয়েছে স্পষ্ট দিক নির্দেশনা।

সাহিত্য বলতে নজরুল ব্যক্তিত্বের প্রকাশকে বুঝিয়েছেন।[৬০] প্রতিটি লেখক, কবি, সাহিত্যিক তাঁদের সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে নিজের বিশ্বাস, অনুভূতি, চিন্তা-চেতনা প্রকাশ করে থাকেন। যেহেতু সাহিত্য ব্যক্তির দর্শনের প্রতিচ্ছবি, তাই নজরুল লেখকদের স্থায়ী সাহিত্য রচনা করতে বলেন। নজরুল বলেন-"যে সাহিত্য জড়, যাহার প্রাণ নাই, সে নির্জীব-সাহিত্য দিয়া আমাদের কোনো উপকার হইবে না, আর তাহা স্থায়ী সাহিত্যও হইতে পারে না।"[৬১] নজরুল স্থায়ী সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে সকলকে 'জন-সাহিত্য' থেকে শুরু করতে বলেন। কেননা এ সাহিত্যই মানুষের অন্তরকে স্পর্শ করতে পারে। তাদের তাজা অনুভূতিকে সতেজ ও জীবন্ত করে রাখে। এক্ষেত্রে যারা জন-সাহিত্য রচনা করবেন তাদেরকে মানুষের কাছাকাছি যেতে বলেন। কেননা তাদের একজন হতে না পারলে তা স্থায়ী হবে না। তিনি মনে করেন কেরোসিনের ডিবে যারা অভ্যস্ত তাদের কাছে টর্চলাইট নিয়ে গেলে হবে না; কেরোসিনের ডিবে নিয়েই যেতে হবে। নজরুল বলেন-

> জন সাহিত্যের উদ্দেশ্য হল জনগনের মতবাদ সৃষ্টি করা এবং তাদের জন্য রসের পরিবেশন করা। আজকাল সাম্প্রদায়িক ব্যাপারটা জনগণের একটা মস্ত বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে; এর সমাধানও জনসাহিত্যের একটি দিক। সাময়িক পত্রিকাগুলোর দ্বারা আর তাদের সম্পাদকীয় প্রবন্ধ দ্বারা কিছুই হবে না। সম্পাদকীয় মত উপর থেকে উপদেশের শিলাবৃষ্টির মতো শোনায়। তাতে জনগণের মনের উপর কোনো ছাপ পড়ে না–জনমতও সৃষ্টি হয় না।[৬২]

নজরুল মনে করেন বিশ্বসাহিত্য তাই; যা পড়ে স্থান-কাল-পাত্রভেদে সবাই যেনো বলতে পারে এ যেনো তারই অন্তরের অন্তরতম কথা, যা তার বুকে গুমরে মরছিলো কিন্তু প্রকাশের ভাষা পাচ্ছিলো না। নজরুল এই বিশ্বসাহিত্যই রচনা করার আহ্বান করেন। তবে তিনি নিজের স্বাতন্ত্র্যতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল। কোনো ক্রমেই তিনি তার ব্যত্যয় ঘটাতে নিষেধ করেন। তিনি বলেন- "আমাদিগকেও তাই এখন করিতে হইবে সাহিত্যে সার্বজনীনতার সৃষ্টি। অবশ্য, নিজের জাতীয় ও দেশীয় বিশেষত্বকে না এড়াইয়া, না হারাইয়া।"[৬৩]আবুল ফজলও বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার নামে অনুকরণপ্রিয়তার বিষয়ে সতর্ক করেন। কেননা ব্যক্তি মন আধুনিক হলে এবং আধুনিকতা সম্পর্কে সচেতন হলে সাহিত্যের নিজস্ব চেহারা এমনিতেই ফুটে ওঠবে; লেখক ও পাঠক তাতে নিজের চেহারা দেখতে পাবে।[৬৪] কাজী আবদুল ওদুদও মনে করেন, বাংলা সাহিত্যে ইউরোপীয়

---

[৬০] "যদি আর বাঁশি না বাজে," 'অভিভাষণ,' নর ৮ম, পৃ. ৪৮।

[৬১] "বাংলা সাহিত্যে মুসলমান," 'যুগবাণী,' নর ১ম, পৃ. ৩৮৮।

[৬২] "অভিভাষণ," নর ৮ম, পৃ. ২৮।

[৬৩] "বাংলা সাহিত্যে মুসলমান," 'যুগবাণী,' নর ১ম, পৃ. ৩৯০।

[৬৪] আবুল ফজল, *সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধাবলী* (ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ১৯৮০), পৃ. ১৪।

প্রভাব থাকলেও তাদের অন্ধ অনুকরণ করা যাবে না। কেননা অনুকরণ করে যেমন কবি হওয়া যায় না, তেমনি অনুকরণ করে কাব্যজিজ্ঞাসুও হওয়া যায় না।[৬৫]

নজরুলের মতে, লেখক বা সাহিত্যিকরা নির্দিষ্ট কোনো স্থান বা গোষ্ঠীর জন্য নন; তিনি সকলের। তিনি বিশ্বমানবের স্বজাতি।[৬৬]প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁ বাংলা সাহিত্যে মুসলমান সাহিত্যিকদের অভাব ও দুর্দশার চিত্র অঙ্কন করে নজরুলের কাছে যে পত্র লেখেন সেখানে তিনি তাঁকে মুসলমানদের জন্য সাহিত্য রচনা করা ও বাংলার মুসলমান সাহিত্যরাজ্যের যে সিংহাসন খালি পড়ে রয়েছে, সেটি গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করেন। মুসলমানদের জন্য 'মুসলিম-সাহিত্য' রচনা করতে বলেন।[৬৭] কিন্তু নজরুল মনে করেন সাহিত্যিক যদি প্রকৃত সাহিত্য রচনা করতে পারেন তাহলে তা জাতি-ধর্ম-বর্ণ সকলের উপকারে আসবে। তিনি লিখেছেন-

> আমি মুসলমান–কিন্তু আমার কবিতা সকল দেশের সকল কালের এবং সকল জাতির। ...ধর্মের বা শাস্ত্রের মাপকাঠি দিয়ে কবিতাকে মাপতে গেলে ভীষণ হট্টগোলের সৃষ্টি হয়। ধর্মের কড়াকড়ির মধ্যে কবি বা কবিতা বাঁচেও না জন্মাও লাভ করে না।[৬৮]

এজন্য অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খাঁ কর্তৃক 'মুসলমান সাহিত্যরাজ্যের খালি সিংহাসন' দখল করার আহ্বান পেয়েও তিনি সেদিকে উৎসাহ দেখাননি। নজরুল 'ঘোড়ায় চড়িয়া মর্দ হাঁটিয়া চলিল' বা "লাখে লাখে ফৌজ মরে কাতারে কাতার/ শুমার করিয়া দেখি পঞ্চাশ হাজার" অথবা "আল্লা আল্লা বল রে ভাই নবী কর সার/ মাজা দুলিয়ে পারিয়ে যাবে ভবনদীর পার" মার্কা ছড়া বা গান তিনি লিখতে চান না এবং না লেখার জন্য উপদেশও দেন। কেননা তা না উদ্দেশ্যকে বড় করে তোলে আর না সত্যিকারের কাব্য হয়। আর্ট যেহেতু সত্যের প্রকাশ তাই তাকে কতকগুলো বাঁধা নিয়মের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা উচিত নয়, বরং এক মুক্ত বিহঙ্গের মতো বাধাহীন ভাবে চলতে দেওয়া উচিত। এ ক্ষেত্রে 'ক্লাসিকের কেশো রোগীরা' সমালোচনা করলেও নবীন লেখকদের কান না দেওয়ার আহ্বান করেন প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খাঁর চিঠির উত্তরে। তিনি বলেন-

> এই সৃষ্টি করলে আর্টের মহিমা অক্ষুন্ন থাকে, এই সৃষ্টি করলে আর্ট ঠুঁটো হয়ে পড়ে'–এমনতর কতকগুলো বাঁধা নিয়মের বলগা কষে কষে আর্টের উচ্চৈঃশ্রবার গতি পদে পদে ব্যাহত ও আহত করলেই আর্টের পরম সুন্দর নিয়ন্ত্রিত প্রকাশ হল–এ কথা মানতে আর্টিস্টের হয়তো কষ্টই হয়, প্রাণ তার হাঁপিয়ে ওঠে। ...তবু আজ এ–কথা জোর গলায় বলতে হবে নবীনপন্থীদের।[৬৯]

---

[৬৫]কাজী আবদুল ওদুদ, "বাংলা সাহিত্যের চর্চা", *শিখা সমগ্র (১৯২৭-১৯৩১)*, তদেব, পৃ. ৪৪১।

[৬৬] মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ্,"সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতা," অন্তর্গত আনিসুজ্জামান সম্পা.,*শহীদুল্লাহ্-রচনাবলী* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি,১৯৯৪), পৃ. ২০১।

[৬৭] মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন, *সওগাত-যুগে নজরুল ইসলাম* (ঢাকা: নজরুল ইন্সটিটিউট, ১৯৮৮), পৃ. ১৩৫-৮।

[৬৮]"পত্রাবলী," নর ৯ম, পৃ. ১৭৯।

৬৯ তদেব, পৃ. ১৮৫।

নজরুল মনে করেন লেখকরা হবেন সত্য ও সুন্দরের পূজারী। সকল ধরনের নীচতা, ক্ষুদ্রতা থেকে তিনি নিজেকে মুক্ত রাখবেন। নজরুলের মতে-"সাহিত্যিকের, কবির, লেখকের প্রাণ হইবে আকাশের মতো উদার, তাহাতে কোনো ধর্মবিদ্বেষ, জাতিবিদ্বেষ, বড়-ছোট জ্ঞান থাকিবে না।"[৭০]সাহিত্যের মাধ্যমে সত্যকে প্রকাশ করাই লেখকের কর্তব্য। এখানে এসে তাঁর উদ্দেশ্য ও দার্শনিকের উদ্দেশ্য অভিন্ন। এজন্যই হয়তো পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণণ বলেছেন-"একজন সত্যিকারের কবি একজন দার্শনিক এবং একজন সত্যিকারের দার্শনিক একজন কবি"।[৭১] নজরুল 'রাজবন্দীর জবানবন্দী'তে বলেছেন-"আমি কবি, অপ্রকাশ-সত্যকে প্রকাশ করার জন্য, অমূর্ত সৃষ্টিকে মূর্তিদান করার জন্য ভগবান কর্তৃক প্রেরিত...আমি সত্য প্রকাশের যন্ত্র"। নজরুলের আড়াই হাজার বছর আগে দার্শনিক সক্রেটিস বন্দী অবস্থায় এমনি জবানবন্দী দিয়েছিলেন, "আমি সত্যকে প্রকাশ করেছি। সত্য বই অপর কিছুকে আমি উপস্থিত করিনি।"ফনিমনসা কাব্যের 'সত্য-কবি' নামক কবিতায় নজরুল বলেন- কবির কণ্ঠে প্রকাশ সত্য-সুন্দর ভগবান। আর 'ধূমকেতুর পথ' এ বলেন- আমি যা ভাল বুঝি, যা সত্য বুঝি–শুধু সেইটুকুই প্রকাশ করব। সাহিত্য সুন্দরের বাণী প্রকাশক। নজরুল মনে করেন কবিতা ও দেবতা উভয়েরই উদ্দেশ্য এক।[৭২] কেননা উভয়েরই উদ্দেশ্য পৃথিবীতে সত্য-সুন্দরের প্রতিষ্ঠা।

সাহিত্যিকরা কেমন হবেন? তাদের রচনার উদ্দেশ্য কী হবে?তারা কী সাহিত্যে দেশসেবায় নারীর করুণার উপর বেশি প্রাধান্য দিবেন নাকি বীর যোদ্ধা তৈরির প্রতি গুরুত্ব দিবেন? নজরুল মনে করেন যারা নারীর করুণা নিয়ে দেশের সেবা করে তারা রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ ও প্রফুল্লচন্দ্রের ন্যায় বাংলার দেবতা বা মহাপুরুষ হলেও দেশে এই মহুর্তে মহাপুরুষের চেয়ে সেই সকল সৈনিকের বেশি প্রয়োজন যারা দেশের জন্য নিজের জীবন বিলিয়ে দিতে দ্বিতীয়বার ভাবে না। যার এক আঁখি ইশারায় শত সহস্র বছরের জঞ্জালকে পরিষ্কারের অভিযানে লিপ্ত হবে। যে বিবেকানন্দের মতো পৌরুষ নিয়ে আবিভূত হবে।তাই সত্য ও বীরত্বের পরিবর্তে যে সকল সাহিত্যিক শুধুমাত্র সুরের মুর্ছনায় তরুণদের নরম মনকে আন্দোলিত করে এবং কান্না-কাতর আত্মাকে আরো কাঁদিয়ে তোলে, তাদের উদ্দেশ্যে নজরুলের বাণী-

> এই অলস জাতিকে তোমাদের সুরের অশ্রুতে আরো অলস-উতল করে তুলো না। তোমাদের সুরের কান্নায় কান্নায় এদের অলস আর্ত আত্মা আরো কাতর, আরো ঘুম-আর্দ্র হয়ে উঠল যে, এ সুর তোমাদের থামাও। আঘাত আনো, হিংসা আনো, যুদ্ধ আনো, এদের এবার জাগাও, কান্না-কাতর আত্মাকে আর কাঁদিয়ো না।[৭৩]

---

[৭০] "বাংলা সাহিত্যে মুসলমান," 'যুগবাণী,' নর ১ম, পৃ. ৩৮৯।

[৭১] সোমেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, *বাঙলার বাউল: কাব্য ও দর্শন* (কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৯৬৪), পৃ. ৬৫।

[৭২] "পত্রাবলী," নর ৯ম, পৃ. ১৯৭।

[৭৩] "আমি সৈনিক," 'দুর্দিনের যাত্রি,' নর ২য়, পৃ. ৪১৪।

সাম্য সম্পর্কে নজরুলের ভাবনার নৈতিক তাৎপর্য

নজরুল মানবতার অপমান সহ্য করতে পারতেন না। তিনি সমাজের ধনী-গরিব, রাজা-প্রজা, নারী-পুরুষে কোনো ভেদ করেন নি। এদের সমতা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে একটি নৈতিক দায়িত্ব হিসেবে দেখেছেন। তবে তাঁর এ আন্দোলনে মার্কসবাদের প্রভাব রয়েছে কি না এ নিয়ে রয়েছে বিস্তর আলোচনা। এর মূল কারণ হলো, রুশ বিপ্লবের অব্যবহিত পরেই নজরুল ১৯২০ সালের মার্চ মাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকে ফিরে এসে সাম্যবাদী রাজনৈতিক মতাদর্শী বন্ধু মুজাফ্‌ফর আহমদের 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'র অফিসে বসবাস শুরু করেন। তাছাড়া সাহিত্য আড্ডার সূত্র ধরে যাদের সাথে সময় কাটাতেন তাদের অনেকেই ছিলেন সাম্যবাদী। কার্ল মার্কস সাম্যবাদী ধারণার প্রবক্তা। এ মতবাদের মূল উদ্দেশ্য হলো শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। এদিক থেকে মার্কসবাদের উদ্দেশ্য ও নজরুলের উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন। উভয়ই সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে অসাম্য দূর করে সাম্যভিত্তিক নৈতিক সমাজ প্রতিষ্ঠার কথা বলেন, শ্রেণিসংগ্রামকে উৎসাহিত করেন। মার্কস, এঙ্গেলস, লেলিনের প্রভাবের কারণেই হয়তো তিনি 'কুহেলিকা', 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসে বিপ্লববাদের পক্ষে লিখেন। মার্কসীয় সাম্যবাদের ইঙ্গিতও তিনি দিয়েছেন। তবে মার্কসবাদী মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত হলেও শেষ পর্যন্ত তাঁর এই মতবাদের সাথে লেগে থাকা সম্ভব হয় নি। এ প্রসঙ্গে আহমদ শরীফ দেখিয়েছেন, সাম্যবাদী, সর্বহারা, ফনিমনসা, জিঞ্জির, সন্ধ্যা ও প্রলয়শিখার মধ্যে রাশিয়ার সাম্য ও সমাজবাদের তথা মার্কসীয় সমাজতত্ত্ব ও লেলিনের সমাজ ব্যবস্থায় বিশ্বাস রাখতে পারেন নি। কেননা তাঁর যুগে সমাজতন্ত্রে দীক্ষার পূর্বশর্ত ছিলো নাস্তিক্য। কিন্তু নজরুল নাস্তিক না হয়ে বরং ইসলামি মতাদর্শে আস্থাবান থাকতে চেয়েছেন। এ জন্য তিনি ধর্মের মধ্যে থেকে সম্পদের সুষ্ঠ বন্টনের পক্ষে ছিলেন।[৭৪]নজরুল মনে করেন সকল ধর্মের মূল কথা হলো শোষণ-বঞ্চনাহীন সাম্যভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণ। ইসলামের যাকাত প্রথাই সেই বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য যথেষ্ট। এ জন্য তিনি অসাম্য দূর করার জন্য ইসলামের যাকাত-ব্যবস্থার মধ্যে সমাধান খুঁজেছেন।[৭৫] নজরুল মনে করেন সমাজতন্ত্রই হোক আর সাম্যবাদই হোক, তার উৎপত্তি ঘটেছে ইসলাম ধর্মের বিধান থেকে। কার্লমার্কস যখন শোষণ-বঞ্চনাহীন সমাজ বিনির্মাণের জন্য সমাজতন্ত্রের ধারণা নিয়ে আসেন তার থেকে হাজার বছর আগেই ইসলাম ধর্ম সে বিধান চালু করেছে বলে নজরুলের অভিমত। ইসলামের এই সাম্যবাদী দিকটি তুলে ধরে তিনি বলেন-

> সকল ঐশ্বর্য সকল বিভূতি আল্লার রাহে বিলিয়ে দিতে হবে। ধনীর দৌলতে, জ্ঞানীর জ্ঞানভাণ্ডারে সকল মানুষের সমান অধিকার রয়েছে। এ নীতি স্বীকার করেই ইসলাম জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করতে পেরেছে। আজ জগতের রাজনীতির বিপ্লবী আন্দোলনগুলির যদি ইতিহাস আলোচনা করে দেখা যায় তবে বেশ বোঝা যায় যে, সাম্যবাদ সমাজতন্ত্রবাদের উৎসমূল ইসলামেই নিহিত রয়েছে। আমার ক্ষুধার অন্নে তোমার অধিকার না

---

[৭৪] আহমদ শরীফ, "নজরুল সমীক্ষা: অন্য নিরিখে" অন্ত. আহমদ কবীরসম্পা.,*আহমদ শরীফ রচনাবলী* ১ম খণ্ড (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২০১০), পৃ. ৬০৮-৯।

[৭৫] মোহাম্মদ আবদুল কাইউম, *নানা প্রসঙ্গে নজরুল*, ২য় সং (ঢাকা: নজরুল ইন্সটিটিউট, ২০১৪), পৃ. ২৪।

থাকতে পারে, কিন্তু আমার উদ্বৃত্ত অর্থে তোমার নিশ্চয়ই দাবি আছে–এ শিক্ষাই ইসলামের। জগতের আর কোনো ধর্ম এত বড় শিক্ষা মানুষের জন্য নিয়ে আসেনি।[৭৬]

মার্কসীয় তথা বস্তুবাদী ধারায় ধর্মকে প্রগতিবিরোধী ও অসাম্যের উৎসাহদাতা হিসেবে বলে মনে করা হয়। ফলে তারা ধর্মীয় নৈতিকতার পরিবর্তে বস্তুবাদী নৈতিকতার প্রবর্তন করে। সেখানে শ্রেণিবৈষম্যকে প্রাকৃতিক বিধানের অধীন হিসেবে দেখানো হয়। নজরুল যেহেতু ধর্মকে জীবনের অপরিহার্য উপাদান মনে করেন এবং নৈতিকতার ক্ষেত্রে ধর্মীয় নৈতিকতাকে স্বীকার করেন সেজন্য তিনি মার্কসীয় সাম্যবাদের পরিবর্তে ইসলামি সাম্যবাদের দিকে ঝুকে যান এবং সমাজতন্ত্রের ধারণা যে ইসলাম থেকেই উদ্ভূত তার পক্ষে জোরালো যুক্তি দেন। নজরুলের এই প্রবণতাকে স্বীকার করে আহমদ শরীয় মনে করেন পুরাতনকে ভেঙে, নতুনভাবে গড়ে এবং লড়াই করে বাঁচার উপলব্ধি নজরুল রুশবিপ্লব থেকে পেলেও তা কখনো তাঁর বিশ্বাসের অনুগত হয়ে অন্তরের সত্য হয়ে উঠেনি।[৭৭] আহমদ শরীফ আরো দেখিয়েছেন নজরুল ইসলাম নিছক সাম্যবাদী, সমাজবাদী অথবা নাস্তিক্যবাদীও ছিলেন না বরং তিনি ঈশ্বরবাদী সত্য বা সত্যরূপী স্রষ্টার অনুগত ছিলেন। শাস্ত্রের অন্ধ আনুগত্যের চেয়ে এর নির্যাসের প্রতি আস্থাশীল ছিলেন। সমাজের বিদ্যমান জাতি-ধর্ম-বর্ণভেদ স্বীকার করেও তিনি এদের মধ্যে অর্থনৈতিক, ব্যবহারিক ও আচারিক সাম্যের, সমতার ও সমদৃষ্টির এবং সহিষ্ণুতার সহযোগিতার সহাবস্থান নীতির প্রবক্তা ছিলেন।[৭৮]গোলাম মুরশিদ দেখিয়েছেন নজরুল মানুষে মানুষে সাম্যের কথা বললেও, কৃষক, শ্রমিক, মজুর তথা সর্বহারাদের প্রতি অতিশয় দরদ থাকলেও কমিউনিস্ট হতে পারেন নি। এমনকি তাঁর ঘনিষ্ঠতম বন্ধু কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তুললেও তিনি তাতে যোগ দিতে পারেন নি।[৭৯]সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর মতে, জীবনের সিংহভাগ সময় সাম্যবাদের প্রচার করলেও শেষ পর্যন্ত নজরুল ব্যক্তিগত শোক এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক সমর্থনের অভাবে সেখান থেকে ফিরে আসেন এবং অধ্যাত্মবাদে বিশ্বাসী হয়ে পড়েন।[৮০]

রফিকুল ইসলাম মনে করেন, রুশ দেশের সর্বহারা শ্রেণির বিপ্লব দেখে প্রভাবিত হয়ে নজরুল ‘সাম্যবাদী’ নামে কাব্য রচনা করলেও এর প্রভাব ছিলো পরোক্ষ। ঈশ্বর বা ধর্মকে অস্বীকার করার কোনো প্রয়াস সেখানে ছিলো না। কবিতায় সাম্যের গানে মানুষের যে ব্যবধান দূর করার কথা তিনি বলেছেন সে ব্যবধান মূলতঃ ধর্মীয় ব্যবধান। ঈশ্বর বা স্রষ্টাকে অস্বীকার করার কোনো প্রবণতা এ

---

[৭৬] “স্বাধীনচিত্ততার জাগরণ,” ‘অভিভাষণ,’*নর* ৮ম,পৃ. ৪৮।

[৭৭] আহমদ শরীফ, *একালে নজরুল* (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২০১৫), পৃ. ১৮।

[৭৮] তদেব, পৃ. ৮৮।

[৭৯] গোলাম মুরশিদ, *নারী ধর্ম ইত্যাদি* (ঢাকা: অন্যপ্রকাশ, ২০০৭), পৃ. ১৬১। এবং গোলাম মুরশিদ, *বিদ্রোহী রণক্লান্ত: নজরুল জীবনী* (ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন, ২০১৮), পৃ. ১৪২-৩।

[৮০] সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, *বাঙালীর জাতীয়তাবাদ*, ৪র্থ সং (ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০১৫), পৃ.৩২৫।

কবিতায় অনুপস্থিত। ঈশ্বরকে বুকের মানিকরূপে হৃদয়েই তিনি স্থান দিয়েছেন।[৮১] আর এর পেছনে কাজ করেছে তাঁর পারিবারিক ঐতিহ্য। এজন্য মুজীবর রহমান খাঁ মনে করেন সাম্যবাদী কাব্যে *গীতার* শক্তিবাদ ও রাশিয়ার *কমিউনিজমের* প্রভাব থাকলেও একটা জিনিস সব সময়েই তাঁর কবিতার সুরের ভিতর লক্ষ করা যায় যে তিনি কখনও মুসলিম স্বাজাতিকতার মূলধারা থেকে বিচ্যুত হন নি। প্রকাশভঙ্গিতে যুগের দাবি এবং আবেষ্টনের প্রভাবকে তিনি স্বীকার করেছেন মাত্র।[৮২] তাঁর সাম্যবোধ গড়ে উঠেছে মানবতাবোধ প্রসূত চিন্তাধারা থেকে।[৮৩] যার ভিত্তি ছিলো বাল্যকালের পারিবারিক ধর্মীয় শিক্ষা।

মুসলিম পরিবারে জন্ম ও বেড়ে উঠায় ধর্মীয় বিধানাবলী সম্পর্কে নজরুল অবগত ছিলেন। ইসলাম ধর্মের ভ্রাতৃত্ব, এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই, ধনীর সম্পত্তিতে গরিবের হক প্রভৃতি শিক্ষা তিনি বাল্যকালেই পরিবার থেকে শিখেছিলেন। তিনি আর্ত-মানবতার মুক্তি প্রত্যাশী ছিলেন। সমাজের জাত-পাত, উঁচু-নিচু ব্যবধান দূরে রেখে লাঞ্ছিত শ্রেণির সকলের মধ্যে সাম্যাবস্থা প্রতিষ্ঠা করার মানসে তিনি সাম্যবাদী', 'মানুষ', 'বারাঙ্গনা', 'নারী', 'রাজা-প্রজা', 'সাম্য', 'কুলি-মজুর' প্রভৃতি কবিতা রচনা করেন। এই সকল কবিতাগুলোতে তিনি মানুষের প্রতি সহানুভূতি, করুণা, ও সমতার দিকের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন।

নজরুল ধর্মের নৈতিক নীতির মধ্যেই খুঁজে পেয়েছেন সাম্যের মূল চাবি। কেননা মানুষের সামাজিক জীবনকে ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করা, মানুষকে ন্যায়, সত্য, সুন্দর, ও কল্যাণের পথে পরিচালিত করা এবং পরিণামে পরমসত্তার সন্ধান দেওয়াই ধর্মের কাজ।[৮৪]পৃথিবীর প্রতিটি ধর্মের মূলকথা হলো শোষণমুক্ত সাম্যভিত্তিক সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন। তাই নজরুল সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য মার্কসবাদের দিকে না যেয়ে ধর্মের মধ্যকার নৈতিক বিধানেই আস্থা রেখেছেন। এর মাধ্যমেই তিনি তৈরি করতে চেয়েছেন একটি সাম্যভিত্তিক নৈতিক সমাজ।

নারী-পুরুষের সাম্য

নৈতিক আলোচনায় নারী-পুরুষের সাম্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয়। নারী-পুরুষ স্রষ্টার সৃষ্টি। তিনি মানুষের মধ্যে বিভেদ রেখা সৃষ্টি করেন নি। কিন্তু তাঁর অনুসারীরা বিভিন্ন অজুহাতে নারী-পুরুষের মধ্যে প্রভেদের দেয়াল তৈরি করেছে। কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক, রাজনীতিকসহ সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষ এই বিষয়টি নিয়ে সোচ্চার হলেও সভ্যতার বিকাশের এই পর্যায়ে এসেও নারী-পুরুষের সমতা নিশ্চিত করা সম্ভব হয় নি। নজরুল যে সমাজে বসবাস করতেন সে সমাজে নারী-পুরুষের অসাম্যের রয়েছে এক বিস্তর ইতিহাস। সে ইতিহাসের জ্ঞান ব্যতিরেকে নারী-পুরুষের

---

[৮১] রফিকুল ইসলাম, *কাজী নজরুল ইসলাম জীবন ও সৃষ্টি*, ২য় সং (কলকাতা: কে পি বাগচী অ্যাণ্ড কোং, ১৯৯৭), পৃ. ৩২৯।

[৮২] মুস্তফা নূরউল ইসলাম, *সমকালে নজরুল ইসলাম* (ঢাকা:কথাপ্রকাশ, ২০১৫), পৃ. ১৭৭-৮।

[৮৩] পারভীন আক্তার জেমী, *নজরুল সাহিত্যে বিপ্লবী চেতনা* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১০), পৃ. ১২৪।

[৮৪] আমিনুল ইসলাম, *জগৎ জীবন দর্শন*,১ম সং (ঢাকা: মওলা ব্রাদার্স, ২০১১),পৃ. ৪৬।

সাম্য প্রতিষ্ঠার আন্দোলন সম্পর্কিত নজরুলের ভাবনা বোঝা সম্ভব হবে না। সুতরাং সংক্ষেপে সে ইতিহাস উল্লেখ করে নারী-পুরুষের সাম্য সম্পর্কিত নজরুলের ভাবনা উল্লেখ করছি।

পৃথিবী সৃষ্টির আদিলগ্ন থেকে নারী-পুরুষ পাশাপাশি বসবাস করে আসছে। সভ্যতা নির্মাণে উভয়ই সমান অবদান রেখে এসেছে। কিন্তু যখনই মানুষের অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা তৈরি হলো, সমাজবদ্ধভাবে বসবাস শুরু করলো, সমাজ, রাষ্ট্র প্রভৃতির উদ্ভব হলো তখনই পুরুষরা মহিলাদের সংসারের অভ্যন্তরে বন্দী করে ফেললো। সন্তান জন্মদান ও পুরুষের মনোরঞ্জন করাকে মহিলাদের দায়িত্ব হিসেবে গণ্য করা হলো। নারীকে তারা যৌনসঙ্গি হিসেবে বিবেচনা করতে শুরু করে যার বাস্তব উদাহরণ 'টপলেস মূর্তি'।[৮৫]পুরুষরা কর্তৃত্ব করতে অভ্যস্ত হয়ে গেলো এবং নারীকে সে জোর করে অন্য পুরুষের লোলুপ দৃষ্টি থেকে দূরে রাখার জন্য ঘরের অভ্যন্তরে আবদ্ধ করে ফেললো। তার শরীর মুখ ঘোমটা দিয়ে ঢেকে দিলো। এভাবে নারী বন্দী হয়ে গেলো গৃহের অভ্যন্তরে।[৮৬] সভ্যতার পর সভ্যতার আবিষ্কার হলো, পুরুষ হলো গৃহকর্তা, নারী হলো বন্দী। সভ্যতা এগিয়ে গেলো কিন্তু নারী গেলো পিছিয়ে।

নারীকে অবদমিত করে রাখার পেছনে ধর্মের একটা ভূমিকা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। ইহুদী ধর্মে সামাজিক প্রার্থনার জন্য দশজন পুরুষের উপস্থিতি জরুরী ছিলো। সেখানে নয়জন পুরুষ আর অসংখ্য নারী উপস্থিত থাকলেও প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হতো না। কেননা নারী মানুষরূপে পরিগণিত হতো না। ইহুদীরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলো যে, নারীরা প্রথম থেকেই অন্যায় ও পাপের উস্কানীদাতা। সুতরাং তারা ধর্মীয়, সমাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে।[৮৭] খ্রিস্ট ধর্মে নারীকে আদি পাপের জন্য দায়ী করা হয়েছে। সুতরাং নারীর পাপের দরুনই পুরুষকে তার উপর কর্তৃত্ব করার অধিকার প্রদত্ত হয়েছে।[৮৮] বৌদ্ধ ধর্মে নারীর মর্যাদা অতি নগণ্য। নারীদেরকে এ ধর্মে নিকৃষ্ট পুতুল বলে মনে করা হতো। এমনকি তাদের অপবিত্রা জীব বলে আখ্যা দেওয়া হয় এবং নারী জাতি থেকে পুরুষ জাতিকে সর্বদা দূরে থাকার উপদেশ ও নির্দেশ দেয়।[৮৯] নারীর প্রতি ধর্মের বিধান কতো ভয়ঙ্কর হতে পারে তা 'মনু'র বিধান থেকে সহজেই অনুমেয়। নারী সম্পর্কে সেখানে বলা হয়েছে "পুত্রার্থে ক্রিয়াতে ভার্যা"[৯০] অর্থাৎ পুত্র জন্ম দেওয়ার জন্যে বউ আনা। স্মৃতিশাস্ত্রের প্রধান প্রবক্তা মনু নারীকে মিথ্যার মতোই অপবিত্র বলেছেন এবং তাদের বেদপাঠের অধিকার হরণ করেছেন।[৯১]মধ্যযুগে নারীদের পর্দা প্রথা বা আব্রু প্রথা

---

[৮৫] গোলাম মুরশিদ, *নারী ধর্ম ইত্যাদি*, পৃ. ৮৩।

[৮৬] আগস্ট রেবেল, *নারী অতীত-বর্তমান ভবিষ্যতে*, অনু.কনক মুখোপাধ্যায়, ১ম সং (কলকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৩), পৃ. ৬।

[৮৭] মোসাঃ হাফসা খাতুন, "ইসলামে নারীর মর্যাদা"(এমফিল থিসিস, ইসলামিক স্টাডিস বিভাগ: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়), পৃ. ৩৪।

[৮৮] বাইবেল: জেনেসিসি, ৩:১৬।

[৮৯] শাহ মোহাম্মদ উল্লাহ, *পর্দা ও বিশ্ব সভ্যতায় নারী* (বাগেরহাট: রহমতপুর প্রকাশনী, ১৯৯৬), পৃ. ২০।

[৯০] গোলাম মুরশিদ, *নারী ধর্ম ইত্যাদি*, পৃ. ৮২

[৯১] পূরবী বসু,*প্রাচ্যে পুরাতন নারী*(ঢাকা:অবসর, ২০১৩), পৃ. ৫৬।

সমাজের অভিজাত ও সামাজিক শালীনতা বলে গণ্য করা হতো।[৯২] কিন্তু নিম্নবর্ণের ও নিম্নবৃত্তের ঘরে পর্দা কখনো প্রথা রূপে চালু ছিলো না। দরিদ্র ঘরের নারীদের ঘরে বাইরে, ক্ষেতে খামারে, হাটে ঘাটে জীবিকা অর্জনের জন্যে কিংবা স্বামী সন্তানের সাহায্যকারী হিসেবে বাইরে যেতে হতো।[৯৩]

ইসলাম পূর্বযুগে নারীদেরকে যৌনদাসী হিসেবে ব্যবহার করা হতো এবং কন্যা শিশুদের জীবন্ত কবর দেওয়া হতো। ইসলামের আবির্ভাবের ফলে মুসলিম সমাজে নারী-পুরুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠিত হলেও ধর্মীয় অজ্ঞতা ও গোঁড়ামির কারণে ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানেরা নারীদের গৃহকোণে বন্দী করে রাখতো। ইসলামে নারীর যে মূল্য ও অধিকারের কথা বলা হয়েছে তার প্রতি মুসলমানদের একটা অংশের কোনো শ্রদ্ধাবোধ ছিলো না; বরং নারীর প্রতি ধর্মবিরোধী ও অমানবিক আচরণ করা হতো। তাদের কঠোর অবরোধের মধ্যে রেখে শিক্ষাদীক্ষা থেকে বঞ্চিত করা হতো।

উনিশ শতকে বাঙালি নারীর সামাজিক অবস্থা ছিলো অমানবিক। সে সময় নারীসমাজ বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, পণপ্রথা, সতীদাহ ও তালাকের মতো বহুসমস্যায় ছিলো জর্জরিত। উপরন্তু শিক্ষাহীনতার পাশাপাশি অর্থনৈতিক জীবনেও নারীরা ছিলো পরনির্ভরশীল। স্বামীর নিকট স্ত্রীর কোনো মর্যাদা ছিলো না। ঘরে স্ত্রী রেখে রক্ষিতার সাথে সময় কাটানো ছিলো তৎকালীন সমাজের বাবুশ্রেণির আভিজাত্যের প্রকাশ। এমনকি এগুলো অভিজাতসমাজে অন্যায় বলে বিবেচিত হতো না। এমনকি রক্ষিতাদের পেছনে কে কত টাকা ব্যয় করলো তা নিয়ে চলতো প্রতিযোগিতা।[৯৪] রামমোহন রায়ের সময়েও নারীদের মনন শক্তি অথবা মেধা নাই এটাই ছিলো সকলের জনপ্রিয় বিশ্বাস।[৯৫]

উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে রাজা রামমোহন রায়, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার, বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভবানীচরণ, সৈয়দ আমির আলী, বেগম রোকেয়া, ওয়াজেদ আলী, মিসেস এম রহমান, ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী, করিমুন্নেসা খানম, মনোরোমা মজুমদার প্রমুখ চিন্তাবিদ সমাজ তথা দেশের উন্নয়নের জন্য নারীশিক্ষার প্রসার ও নারীমুক্তির আবশ্যকীয়তা তাঁদের লেখায় তুলে ধরেন। নারীশিক্ষা, নারীর পর্দা, অবরোধ, বিয়ে-তালাক, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, বিধবাবিবাহ প্রভৃতি সমাজ সংস্কারমূলক আন্দোলন ছিলো তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। এর ফলে ১৮২৯ সালে সতীদাহ প্রথা রহিত করা হয়, আর ১৮৮৫ সালে পাস হয় বিধবা বিবাহ আইন। পশ্চিমের আধুনিক শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে নারীরা তাদের শিক্ষায়, সাহিত্যচর্চায়, সমাজসেবায়, রাজনীতিতে, পত্রিকা সম্পাদনায় এবং

---

[৯২] এম. এ রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮৬), পৃ. ২৫৮।

[৯৩] আহমদ শরীফ, *মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৭৭), পৃ. ৪০।

[৯৪] শিবনাথ শাস্ত্রী, *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ* (কলকাতা: নিউ এজ পাবলিশার্স লিমিটেড, ১৯৫৫), পৃ. ৫৫-৬।

[৯৫] গোলাম মুরশিদ, *নারীপ্রগতির একশো বছর:*,পৃ. ৪।

নারীমুক্তি আন্দোলনে অংশগ্রহণ ক্রমে বাড়তে থাকে। শতাব্দীর প্রথমার্ধে এ ক্ষেত্রে পুরুষদের ভূমিকা মুখ্য হলেও এর শেষার্ধে নারীদের অংশগ্রহণ শুরু হয়। এজন্য উনিশ শতককে বাঙালি নারীর জাগরণের যুগ বলা হয়।

বাঙালি নারীকে গৃহকোণ থেকে বের করে নিজ পায়ের উপরে দাঁড় করানোর সংগ্রামে যারা সৈনিক, তাদের মধ্যে নজরুল অন্যতম। সাম্যের কবি নজরুল নারীকে পুরুষের চেয়ে কোনো অংশেই ছোটো ভাবেন নি। নারী-পুরুষ সাম্যের প্রশ্নে তাঁর বাণী হচ্ছে, 'আমার চক্ষে পুরুষ-রমনী কোনো সে প্রভেদ নাই'। শুধু বিবৃতি নয় বরং 'ধূমকেতু' পত্রিকায় তিনি 'সন্ধ্যা প্রদীপ' নামে নারীদের জন্য একটি বিভাগ রাখেন। নারীসমাজ তাদের সার্বিক মুক্তির কথা অকপটে এখানে লিখতে পারতো। এখানে তিনি নারীর শিক্ষা, অধিকার, পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ এবং যুগ সভ্যতায় এগিয়ে আসবার ক্ষেত্রে নারীদের মতামত এমনকি বিতর্কও সন্নিবদ্ধ করেন।[৯৬]

নারী-পুরুষের সাম্য আলোচনায় নজরুল লক্ষ করেন যে নারীদের পিছিয়ে পড়ার পেছনের অন্যতম কারণ হলো ধর্মান্ধদের স্বার্থান্ধতা। তারা নিজেদের স্বার্থে ধর্মের নাম করে অধার্মিক বিধান ধর্মের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেয়। ধর্মে যা নেই তাই ধর্মের নামে চালিয়ে দেয়। ইসলাম ধর্ম নারীকে পুরুষের মতো শিক্ষা গ্রহণ, প্রয়োজনে যুদ্ধে গমন প্রভৃতিতে অনুমতি দিয়েছে। অথচ এই স্বার্থান্ধরা ধর্মের এই মহান দিকটি গোপন রেখে নারীদেরকে বরং গৃহের অভ্যন্তরে বন্দী করে রাখে। তরুণদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত 'অবরোধ ও স্ত্রী-শিক্ষা' নামক অভিভাষণে নজরুল ধর্মীয় অপব্যাখ্যার মাধ্যমে পর্দাপ্রথার নামে নারীদেরকে অন্দরমহলে বন্দী করে রাখাকে অবরোধ না বলে শ্বাসরোধ বলেন। এমতাবস্থায় নজরুল মনে করেন তরুণদের কর্তব্য হলো এই চিরবন্দিনী মাতা-ভগ্নিদের উদ্ধারসাধন; এ সংক্রান্ত পর্বতসম বাধা, বিধি-নিষেধের দুস্তর পাথার লঙ্ঘন করে নিরাশার মরুভূমিতে আশার আলো সঞ্চার করা। আবার শামসুন্নাহার মাহমুদকে লিখিত পত্রেও নজরুল নারীদেরকে এই অবরোধের দেওয়াল ভেঙ্গে বাইরে আসার আহ্বান করেন। তিনি বলেন-

> আমাদের দেশের মেয়েরা বড় হতভাগিনী। কত মেয়েকে দেখলাম কত প্রতিভা নিয়ে জন্মাতে, কিন্তু সব সম্ভাবনা তাদের শুকিয়ে গেল সমাজের প্রয়োজনের দাবিতে। ঘরের প্রয়োজনে তাদের বন্দিনী করে রেখেছে। এত বিপুল বাহির যাদের চায়, তাদের ঘিরে রেখেছে বারো হাত লম্বা আটহাত চওড়া দেওয়াল। ...তাই নারীদের বিদ্রোহিনী হতে বলি। তারা ভেতর হতে দ্বার চেপে ধরে বলছে আমরা বন্দিনী। দ্বার খোলার দুঃসাহসিকা আজ কোথায়? তাকেই চাইছেন যুগদেবতা।[৯৭]

---

[৯৬] মোঃ মাসুমা খানম, "নজরুল সাহিত্যে নারীঃ প্রাসঙ্গিক বিশ্লেষণ"(এমফিল থিসিস, বাংলা বিভাগঃ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়), পৃ. ৩৬।

[৯৭] "পত্রাবলী," নর ৯ম, পৃ. ১৯৮।

নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলে সমান সুযোগ প্রাপ্ত হবে। ইসলামে নর-নারীর সমান অধিকারের কথা বলা হলেও ধর্ম ব্যবসায়ীরা ইসলামের এই মহান দিকটিকে মানুষের সামনে প্রকাশ না করে এর উল্টো নারীদের গৃহকোণে বন্দী রাখার ফতোয়া দিতো। যার ফলে নারীদেরকে পুরুষের দাসী হিসেবে মনে করা হতো, স্বামীর সেবা ও সন্তান জন্ম দেওয়াই ছিলো তাদের প্রধান দায়িত্ব। অথচ ইসলামের কোথাও নারী-পুরুষে প্রভেদ করা হয় নি। জ্ঞানার্জন থেকে শুরু করে ব্যবসা ও যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতি পর্যন্ত তাদের দেওয়া হয়েছে। নারী সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরতে গিয়ে নজরুল বলেন-

বলে না কোরান, বলে না হাদিস, ইসলামি ইতিহাস,
নারী নর-দাসী, বন্দিনী রবে হেরেমেতে বারোমাস !
হাদিস কোরান ফেকা লয়ে যারা করিছে ব্যবসাদারি,
মানে না কো তারা কোরানের বাণী–সমান নর ও নারী ![৯৮]

'বাঁধনহারা' উপন্যাসে নজরুল পুরুষেরা আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ করলেও যে মনটা মধ্যযুগীয় ধ্যান-ধারণা থেকে বের করতে পারেনি তা মাহবুবার মূল্যায়নের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন। 'ঝিলিমিলি' একাঙ্ক নাটকে একজন শিক্ষিত গোঁড়া ও বদ্ধমূল চরিত্র মির্জাসাহেব স্ত্রী-কন্যাকে পর্দার মধ্যে রাখতে বাধ্য করেছেন।

নজরুল মনে করেন নারী বারাঙ্গনা হয়ে জন্মগ্রহণ করে না এবং ইচ্ছাকৃতভাবে কেউ এই পেশায় গমনও করে না। জন্মের পরে সে যে সমাজে বাস করে, সেই সমাজ পারিপার্শ্বিকতা তাকে বারাঙ্গনা হতে বাধ্য করে। আর এর পেছনেও রয়েছে সমাজের অসম রীতি-নীতি ও উচ্চবৃত্তের লাম্পট্য। যে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নারীকে এইরূপ জঘন্য পেশায় যেতে বাধ্য করে, তাকে ভোগ করে, সেই পুরুষই আবার তাকে তার পেশার জন্য ঘৃণা করে, লোকসমাজে ছোটো করে। এজন্য নজরুল সেই ঘুণে ধরা সমাজটাকেই পরিবর্তন করতে চেয়েছেন। নর-নারীকে সমান সামাজিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করবার আকাঙ্খা থেকেই তিনি 'বারাঙ্গনা' কবিতা রচনা করেছেন। বারাঙ্গনাদেরকে সমাজ নিচু চোখে দেখলেও তিনি তাদেরকে দিয়েছেন মাতা ও ভগ্নির মর্যাদা।তিনি মনে করেন যিনি বারাঙ্গনা তাঁকে হয়তো সীতা-সম সতী মা দুধ পান করিয়েছেন, অথবা তারই উদরে জন্ম নিতে পারে মহাবীর দ্রোণের মতো কোনো মহাবীর।

নজরুল সাহিত্যে নারী চরিত্র অঙ্কিত হয়েছে বিভিন্নভাবে। 'জয়তী'কে তিনি অঙ্কিত করেছেন বিপ্লবী করে। তাঁর মতে, নারী শুধুমাত্র ঘরের কোণে আবদ্ধ থাকার জন্য নয়। তাদের শক্তি আছে; তারাও প্রতিবাদী বা বিপ্লবী হতে পারে, দেশের জন্য দশের জন্য আত্যোৎসর্গ করতে পারে, পৃথিবীকে শাসন করতে পারে, এক নারীর বিপ্লবের উদাহরণ সহস্র নারীকে বিপ্লবী তথা অধিকার

---

[৯৮] "মিসেস এম. রহমান," 'জিঞ্জীর,' নর ৩য়, পৃ. ১১৭-৮।

সচেতন করে গড়ে তুলতে পারে। নজরুলের উদ্দেশ্য তাই। যে সমাজ তাকে গৃহকোণে বন্দী করেছে, ন্যায্য হিস্যা থেকে বঞ্চিত করেছে; সময় এসেছে তাদের থেকে অধিকার কোড়ায় গোণ্ডায় বুঝে নেয়ার। 'নারী' কবিতাতে তিনি এ বিষয়টি বলতে গিয়ে বলেন-

চোখে চোখে আজ চাহিতে পারো না; হাতে রুলি, পায়ে মল
মাথার ঘোমটা ছিঁরে ফেলো নারী, ভেঙে ফেলো ও-শিকল!
যে-ঘোমটা তোমা করিয়াছে ভিরু ওড়াও সে আবরন!
দূর করে দাও দাসীর চিহ্ন ঐ যত আভরণ![৯৯]

নজরুলের 'নারী' কবিতায় নারী জাগরণের যে আহ্বান তা নারী জাতিকে মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক দাসত্ব থেকে আধুনিক যুগোপযোগী মর্যাদার জীবনে তথা সঙ্গী, সাথী, বন্ধু হিসেবে উত্তরণ ও প্রতিষ্ঠার জন্য।[১০০] তাদেরকে তিনি অধিকার সচেতন করে তুলতে চেয়েছেন; পুরুষের মতো সংগ্রামী করে তুলতে চেয়েছেন। যার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত নজরুলের উপন্যাস 'মৃতুক্ষুধা'। এ উপন্যাসে নজরুল নারীকে বিপ্লবী করে উপস্থাপন করেছেন। কেননা রুবি জেলা ম্যাজিস্টেটের কন্যা; সুতরাং তাঁর রয়েছে একটি নিশ্চিত নিরাপদ ভবিষ্যৎ। অন্যদিকে আনসার বিপ্লবী; তার ভাগ্য অনিশ্চিত। তবুও রুবি সকল ঐশ্বর্যের হাতছানি উপেক্ষা করে আনসারের কাছে চলে যায়। শুধুমাত্র ভালোবাসার তাড়নায় সংসার ত্যাগ করেছে তা বলা যায় না; বরং যোদ্ধার সহযোগী হওয়ার কামনা থেকেও করে থাকতে পারে। তাছাড়া নজরুল সবসময়ই চাইতেন নারীরা গৃহকোণ ত্যাগ করুক, দাসত্ব থেকে মুক্তি পাক, স্বাধীন হোক। ফলে যখনই নারী প্রসঙ্গ এসেছে তখনই তিনি নারীকে স্বমোহিমায় উদ্ভাসিত হতে বলেছেন। নজরুলের সাহিত্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায় তিনি রোকেয়া, তারিকুল আলম, আয়েশা আহমেদ, মিসেস এম রহমান, আবুল ফজল প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের মতো চিন্তা করতেন যে নারীরা শিক্ষার মাধ্যমে ক্ষমতা এবং জীবিকা উভয়ই অর্জন করবে।[১০১] নারীরা স্বাধীনতার সৈনিক হবে, অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করবে।

নারী স্বাধীনতায়, নারীর পৃথক সত্তায় বিশ্বাসী নজরুল নারীকে এক বিশেষ বীর্যবতী রূপে দেখেছেন।[১০২] তাই রাজনীতিতে পুরুষের ন্যায় নারীরও অংশগ্রহণ তিনি মনেপ্রাণে চেয়েছেন। 'কুহেলিকা' উপন্যাসে নজরুল নারীর বিপ্লবী চরিত্র অঙ্কন করে রাজনীতিতে সক্রিয় করেছেন এবং প্রকারান্তরে নারীকে দেশের তরে উৎসর্গেরই আহ্বান করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে উপযুক্ত শিক্ষা ও পরিবেশ পেলে নারীরাও রাজনীতি করতে পারে, বিপ্লবী হতে পারে, রাষ্ট্র পরিচালনা করতে পারে। কাজেই নারীর মেধা কম এ ধারণা আজ অচল। 'বাঁধনহারা' উপন্যাসে নজরুল

[৯৯] "নারী," 'সাম্যবাদী,' নর ২য়, পৃ. ৯১।

[১০০]রফিকুল ইসলাম, *কাজী নজরুল ইসলাম :*,পৃ. ৩৩৪।

[১০১] সোনিয়া নিশাত আমিন, *বাঙালি মুসলিম নারীর আধুনিকায়ন: ১৮৭৬-১৯৩৯*, অনু.পাপড়ীন নাহার (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০২), *পৃ.* ১৩৮-৫৫।

[১০২]নীলিমা ইব্রাহিম, *বাঙালি মানস ও বাংলা সাহিত্য* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৬৬), পৃ. ৮৮।

নারীকে দেখেছেন 'কল্যাণী মূর্তি' রূপে; যারা চিরকাল পাষাণী হয়ে থাকতে পারে না। কেননা নারী যদি পাষাণী হয় তাহলে বিশ্ব তৈলহীন প্রদীপের মতো নিমিষেই অন্ধকার হয়ে যাবে। তাই কল্যাণী নারীই বিশ্বের প্রাণ। এভাবে পুরুষরা যেখানে যে বিপ্লবে অংশগ্রহণ করেছে সে বিপ্লবে নারীরা তাদের সহযাত্রী ও সহকর্মী হয়ে শক্তি ও সাহস যুগিয়েছে।

'নারী' কবিতাতে নজরুল দেখিয়েছেন পৃথিবীর যতো বড় বড় জয় ও অভিযান হয়েছে তার অর্ধেক কৃতিত্ব নারীর আর অর্ধেক নরের। সুতরাং যে মানব সভ্যতায় অর্ধেক দান নারীর সেই নারী বঞ্চিত থাকবে তা নজরুল মেনে নিতে পারতেন না। এ জন্য বিদ্যাসাগর কিংবা বঙ্কিমসাহিত্যে নারীদের অস্পৃশ্য ও গ্লানিময় জীবনের প্রচ্ছদপট হিসেবে অঙ্কিত হলেও নজরুল তাকে অঙ্কিত করেছেন গৌরবোজ্জল চরিত্রে।[১০৩]

নারী-পুরুষ নির্বিশেষে রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা ছিলো নজরুলের 'ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির শ্রমিক প্রজা স্বরাজ' এর উদ্দেশ্য।[১০৪] নারী, হোক সে সধবা অথবা বিধবা, তার মস্তক সব সময় উঁচু থাকবে। কোনো অবস্থাতেই যেনো সে নিজেকে ছোটো না ভাবে। তাকে অবদমন করার জন্য যদি কেউ দুঃসাহস দেখায়, নজরুলের আহ্বান তখনই যেনো নারী তার চুল বেঁধে, দুঃখ-কষ্ট ভুলে তা প্রতিহত করে। নজরুলের আহ্বান-

"সধবা অথবা বিধবা তোমার রহিবে উচ্চ শির,
উঠ বীর-জায়া, বাঁধো কুন্তল, মোছো এ-অশ্রু-নীর !"[১০৫]

পৃথিবীর যতো বড় বড় অভিযান, যতো অর্জন তার পেছনে রয়েছে নারীদের অর্ধেক অবদান। কিন্তু ইতিহাসে নারীদের এই বিপুল অবদানকে স্বীকার করা হয় নি। নজরুল পুরুষদেরকে নারীদের অবদান স্মরণ করে দেওয়ার পাশাপাশি নারীদেরকেও এগিয়ে আসার আহ্বান করেছেন। পুরুষদের নির্যাতনের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন-

যুগের ধর্ম এই–
পীড়ন করিলে সে-পীড়ন এস পীড়া দেবে তোমাকেই
শোনো মর্তের জীব !
অন্যেরে যত করিবে পীড়ন, নিজে হবে তত ক্লীব ![১০৬]

নজরুল দেখান যে হযরত মুহাম্মদ (সা:) এর সময়েও নারীরা স্বামী সেবার পাশাপাশি মসজিদে যেমন নামাজ পড়েছেন তেমনি আবার যুদ্ধে গমন করেছেন। কাজেই যারা নারীদেরকে

[১০৩]অনীক মাহমুদ, *চিরায়ত বাংলা:*, ১৭০।
[১০৪]রফিকুল ইসলাম, কাজী নজরুল ইসলাম:,পৃ. ১০৭।
[১০৫] "ব্যথার দান," নর ১ম, পৃ. ২৩৮।
[১০৬] "নারী," 'সাম্যবাদী,' নর ২য়, পৃ. ৯০।

চার দেয়ালের মধ্যে বন্দী রাখতে চায় তারা যে ধর্ম সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গভাবে অবগত নয় তা প্রমাণিত। তারা জানতে চায় না যে ইসলামই নারীদেরকে পুরুষের সমান অধিকার দিয়েছে। ইসলামের কোনো বিধানের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষে কোনো ভেদাভেদ করা হয় নি। মুসলমানদের এই পুরোনো ঐতিহ্য তুলে ধরতে গিয়ে তিনি বলেন-

নারীরে প্রথম দিয়াছি মুক্তি নর-সম অধিকার,
মানুষের গড়া প্রাচীর ভাঙিয়া করিয়াছি একাকার,
আঁধার রাতির বোরকা উতারি এনেছি আশার ভাতি
আমরা সেই সে জাতি ॥ [১০৭]

'অবরোধ ও স্ত্রী-শিক্ষা' প্রবন্ধে নজরুল যেমন নারীদের পর্দা ওা অবরোধপ্রথা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন তেমনি 'বাঙলার মুসলিমকে বাঁচাও' প্রবন্ধে এ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। নজরুল বারবার এ আলোচনায় ফিরে এসেছেন কেননা তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন ধর্মের দোহাই দিয়ে নারীদেরকে গৃহকোণে বন্দী রাখার যে অশুভ পায়তারা তা প্রতিহত করতে না পারলে দেশের যেমন উন্নতি হবে না তেমনি ধর্মে যা নেই তা প্রতিষ্ঠিত হবে। নারীর উন্নতি ব্যতীত যে দেশের উন্নতি সম্ভব নয় তা বঙ্কিমও মনে করতেন। বঙ্কিচন্দ্র তাঁর 'প্রাচীনা ও নবীনা' প্রবন্ধে নারী পুরুষের সমতা প্রসেঙ্গ বলেছেন-"আমাদিগের প্রধান কথা এই যে, স্ত্রীগণ সংখ্যায় পুরুষগণের তুল্য বা অধিক্য, তাহারা সমাজের অর্ধাংশ।... তাহাদিগের উন্নতি সমাজের উন্নতি; যেমন পুরুষদিগের উন্নতিতে সমাজের উন্নতি...। স্ত্রী পুরুষের সমানভাগের সমষ্টিকে সমাজ বলে; উভয়ের সমান উন্নতিতে সমাজের উন্নতি।"[১০৮] আর বেগম রোকেয়া নারীর ক্ষমতায়নের কথা বলতে গিয়ে বলেন যে, পুরুষের সহযোগিতা ছাড়া নারীর মুক্তি সম্ভব নয়। আর নারীর মুক্তি না ঘটলে সমাজের, দেশের, জাতির কোনো উন্নয়ন সম্ভব নয়। যে সমাজ সঙ্গিনী নারীদের পিছনে ফেলে উন্নতির পথে ধাবিত হতে চায় তারা ব্যর্থ হয়।[১০৯] নজরুলও মুসলিম ছাত্রদের সামনে নারীর অবরোধ প্রথা দূর করার জন্য আহ্বান করেন। তিনি বলেন-

ইসলামের প্রথম ঊষার ক্ষণে, সুবহ্-সাদেকের কালে যে কল্যাণী নারীশক্তি রূপে আমাদের দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থান করে আমাদের শুধু সহধর্মিনী নয়. সহকর্মিনী হয়েছিলেন–যে নারী সর্বপ্রথম স্বীকার করলেন আল্লাহকে, তাঁর রসুলকে–তাঁকেই আমরা রেখেছি দুঃখের দূরতম দুর্গে বন্দিনী করে–সকল আনন্দের, সকল খুশির হিসসায় মহরুম করে। তাই আমাদের সকল শুভ-কাজ, কল্যাণ-উৎসব আজ শ্রীহীন, রূপহীন, প্রাণহীন। তোমরা অনাগত যুগের মশালবর্দার–তোমাদের অর্ধেক আসন ছেড়ে দাও কল্যাণী নারীকে। দূর করে দাও তাঁদের

[১০৭]"বুলবুল," নর ৬ষ্ঠ, পৃ. ২৭৬।

[১০৮] বঙ্কিচন্দ্র চট্টপাধ্যায়,"প্রাচীনা ও নবীনা"উদ্ধৃত, আহমদ শরীফ, *বাঙলার মরীষা* (ঢাকা: অনন্যা, ২০০৫), পৃ. ৫৫।

[১০৯] মোতাহার হোসেন, *বেগম রোকেয়া জীবন ও সাহিত্য* (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০১), পৃ. ২৭২।

সামনের ঐ অসুন্দর চটের পর্দা–যে পর্দার কুশ্রীতা ইসলাম-জগতের, মুসলিম জাহানের আর কোথাও নেই।[১১০]

ধর্মের দোহাই দিয়ে নারীদেরকে এমনভাবে তৈরি করা হয় যে, তাদেরকে যদি বাইরে বের হয়ে আসতে বলা হয় তবুও তারা নিজ থেকেই বের হবে না। মানসিক দাসত্ব তাদেরকে পেয়ে বসেছে।নজরুল বাংলার মুসলমানদের পর্দাপ্রথার এই গোঁড়ামি তুলে ধরে বলেন-

আমাদের অধিকাংশ শিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত লোকই চাকুরে, কাজেই খরচের সঙ্গে জমার অঙ্ক তাল সামলাইয়া চলিতে পারে না। অথচ ইহাদেরই পর্দার ফখর সর্বাপেক্ষা বেশি। আর ইহাদের বাড়িতে শতকরা আশিজন মেয়ে যক্ষ্মায় ভুগিয়া মরিতেছে আলো-বায়ুর অভাবে। এইসব যক্ষ্মারোগগ্রস্ত জননীর পেটে স্বাস্থ্যসুন্দর প্রতিভাদীপ্ত বীরসন্তান জন্মগ্রহণ করিবে কেমন করিয়া ! ফাঁসির কয়েদিরও এইসব হতভাগিনীদের অপেক্ষা অধিক স্বাধীনতা আছে। আমরা ইসলামি সেই অনুশাসনগুলির প্রতিই জোর দিয়া থাকি, যাহাতে পয়সা খরচ হইবার ভয় নাই।[১১১]

ধনী-গরিবের সাম্য

মানুষের উপর মানুষের আধিপত্য বা উৎপীড়ন তথা সকল ধরনের সামাজিক অন্যায়, অবিচার ও অন্যান্য ব্যাধিসমূহ দূরীকরণের মাধ্যমে সমাজে ন্যায়বোধ ও কল্যাণধর্ম প্রতিষ্ঠাই মানবতাবাদের মূল লক্ষ্য।[১১২] বাংলার আবহমান কালের ধর্মসমূহ এই মানবতাবাদের প্রসারের জন্য প্রয়োজনে ধর্মের সংস্কার করেছে। শ্রীচৈতন্য হিন্দু ধর্মে 'বৈষ্ণববাদ' নামের মানবতাবাদী দর্শন প্রতিষ্ঠা করেন। মুসলিম সুফি সাধকরাও ঐ সকল সুবিধা বঞ্চিত মানুষের কাছে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন নিয়ে আগমন করেন। আর এদের মিলনে লালন ফকিরের মাধ্যমে নতুন মানবতাবাদী দর্শন 'বাউলতত্ত্ব' প্রতিষ্ঠা লাভ করে।[১১৩] এরই ধারাবাহিকতায় যে 'সামাজিক মানবতাবাদ'[১১৪] প্রতিষ্ঠিত হয় কাজী নজরুলকে এর অন্যতম একজন ধারক বলা যায়।

অন্যায় অশুভের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, রিক্ত নিপীড়িত মানুষের দাবি আদায় দার্শনিকদের অন্যতম লক্ষ্য। সক্রেটিস থেকে শুরু করে মধ্যযুগের উইক্লিফ, ষোল শতকের ইতালীয় দার্শনিক ব্রুনো আর অতি সাম্প্রতিককালের বার্ট্রান্ড রাসেল ও জ্যাঁ-পল সার্ত্র প্রমুখ দার্শনিকগণ নির্যাতিত হয়েছেন কিন্তু অধিকারবঞ্চিত মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রাম থেকে বিরতো থাকেন নি। মানবকল্যাণের এই চিন্তাধারা নজরুলের মধ্যে ব্যাপক আকারে বিদ্যমান ছিলো। মানবকল্যাণে তিনি নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন। নজরুল পূর্ববর্তী শরৎচন্দ্রের রচনার কেন্দ্রবিন্দু ছিলো মধ্যবিত্ত ও

---

[১১০] "বাঙলার মুসলিমকে বাঁচাও," 'অভিভাষণ,' নর ৮ম, পৃ. ২৭।

[১১১] "অবরোধ ও স্ত্রী-শিক্ষা," 'অভিভাষণ,' নর ৮ম, পৃ. ১১।

[১১২] এম. আবদুল হামিদ, *দার্শনিক প্রবন্ধ সংকলন* (ঢাকা: অনন্যা, ২০১১), পৃ. ১০৯-১০।

[১১৩] তদেব।

[১১৪] রমেন্দ্রনাথ ঘোষ, *রমেন্দ্রনাথ ঘোষ দার্শনিক প্রবন্ধাবলি*, সম্পা. হাসানআজিজুল হক ও মহেন্দ্র নাথ অধিকারী(ঢাকা: ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ২০১৪), পৃ. ২২৬।

নিম্নমধ্যবিত্তের জীবনী। কিন্তু তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে, নিজের অভিমান বিসর্জন না দেওয়ার কারণে সমাজের আরও নীচের স্তরে নেমে গিয়ে তাদের দুঃখ দৈন্যের মাঝখানে দাঁড়াতে পারেন নি। কিন্তু নজরুল তা পেরেছেন। অনিক মাহমুদ দেখিয়েছেন জাত্যভিমানের ছোঁয়া নজরুলকে স্পর্শ করতে পারেনি। তিনি সকল ভেদাভেদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও বিপ্লবের ঝড় তুলেছেন। চণ্ডীদাসের মতো তিনিও মনে করতেন 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'।[১১৫]

এদিক থেকে নজরুল ছিলেন সাম্য ও মানবতার কবি। মানুষকে তিনি দেখেছেন স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হিসেবে; যেখানে ছোটলোক-বড়লোক, সাদা-কালো, ধনী-গরীব, রাজা-প্রজা, মালিক-শ্রমিক সবাই সমান। অসাম্যকে দূর করে সাম্যভিত্তিক নৈতিক সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে মানবতাবাদী ও নৈতিক দৃষ্টিতে দেখেছেন তাঁর চারপাশের পরিবেশ ও প্রতিবেশকে। তিনি ধনী-গরিবের আকাশ-পাতাল পার্থক্য লক্ষ করে এই অসমতাকে দূর করতে চেয়েছেন। কিন্তু এর শেকড় ছিলো সমাজের অন্ত:মূলে।

কৃষির আবির্ভাবের প্রারম্ভিক যুগে মানুষের মধ্যে উঁচু-নীচু ভেদজ্ঞান তেমন ছিলো না। কিন্তু কৃষিতে লাঙল আবিষ্কার ও তৎপরবর্তী সভ্যতা ও শিল্পায়নের দ্রুত বিকাশ এবং দ্রব্যসামগ্রীর সংরক্ষণ পদ্ধতি আবিষ্কারের ফলে সাম্যভিত্তিক ব্যবস্থার পরিবর্তে শোষণভিত্তিক ব্যবস্থা চালু হয়। শ্রমজীবী মানুষের শ্রমকে ভোগবাদী সমাজ একটি ভোগ্য পণ্য মনে করা শুরু করে। প্রভাবশালীরা তাদের পেশিশক্তি ও বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে নিম্নশ্রেণির উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে এবং এর মাধ্যমে নিম্নশ্রেণিকে অবদমন শুরু করে। বিত্তশালীর আরাম-আয়েশের জীবনকে সুদৃঢ় করতে তৈরি হয় দাসপ্রথার। এভাবে মানুষে মানুষে উঁচু-নীচুভাব, জাতপ্রথার আবির্ভাব ঘটে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আবির্ভাবের পর ভারতবর্ষে সে চিত্র আরো ভয়াবহ আকার ধারণ করে। ধনী-গরিবের ব্যবধান বেড়ে এমন হয় যে ১৭৭০ সালে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় যাতে বাংলার এক-তৃতীয়াংশ মানুষ প্রাণ হারায় যাদের অধিকাংশই ছিলো দরিদ্রশ্রেণি। পরবর্তীতে ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্নওয়ালিশ কর্তৃক চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থা প্রবর্তন করলে দরিদ্র-শ্রমিক শ্রেণির অবস্থা আরো শোচনীয় হয়ে উঠে। দিন আনি দিন খাই ছিলো তৎকালীন দরিদ্র কৃষকদের অবস্থা।[১১৬]

কাজী নজরুল ইসলাম কৃষক-শ্রমিক-জেলে, মুটে-মজুরদের ওপর ধণিক শ্রেণির নির্দয় ব্যবহার প্রত্যক্ষ করেন। তিনি বুঝতে পারেন সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠির অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হলে রাজনীতিকে একটি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। তাই তিনি ১৯২৫ সালের শেষদিকে হেমন্তকুমার সরকার, কুতুবউদ্দীন আহ্মদ ও শাসসুদ্দীন আহ্মদের

---

[১১৫] অনীক মাহমুদ, চিরায়ত বাংলা:,পৃ. ১৭০-১।

[১১৬] রমেশচন্দ্র দত্ত, *বাংলার কৃষক*, অনু. কাজী ফারহানা আক্তার লিসা ও সাদাত উল্লাহ খান (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০৮), পৃ. ৫৩।

সহযোগিতায় কোলকাতায় 'The Labour Swaraj Party of Indin National Congress'অর্থাৎ 'ভারতীয় জাতীয় মহা সমিতির অন্তর্ভুক্ত মজুর-স্বরাজ পার্টি' সংক্ষেপে 'শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ দল' নামে একটি নতুন রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করেন।[১১৭] শোষণ ও বঞ্চণাহীন জাতি গঠন, আর্ত-মানবতার সেবা ও তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ছিলো এ দল গঠনের মূল লক্ষ্য। তিনি দলের কর্মনীতি ও সংকল্প ঠিক করেন এভাবে-

> দেশের শতকরা আশি জন যারা;
> এই শ্রমিক ও কৃষকগণকে সংঘবদ্ধ করা এবং তা'দিগকে জন্মগত অধিকার লাভে সাহায্য করা, যাতে তারা রাজনৈতিক অধিকার সম্বন্ধে আরও সচেতন হয়ে নিজের সমতার এবং নিজেদের স্বার্থে ক্ষমতাশালী স্বার্থপর ব্যক্তিগণের হাত থেকে স্বাধীনতা আনতে পারে।[১১৮]

সমাজের পিছিয়ে পড়া এই কৃষক-শ্রমিক, মুটে-মজুরদের গ্লানি দূর করে মানুষ হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার প্রত্যয়ে নজরুল কলমযুদ্ধ শুরু করেন। বিদ্রোহী কবি নজরুলের বিদ্রোহের উৎসনির্ঝর হচ্ছে সমাজের সাধারণ মানুষ।[১১৯] ১৯৪১ সালে ৫-৬ই এপ্রিল বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সমিতির বক্তৃতায় এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন- "বিশ্বাস করুন আমি কবি হতে আসিনি, ...জাতিতে জাতিতে বিদ্বেষ যুদ্ধ বিগ্রহ, মানুষের জীবনে একদিকে কঠোর দারিদ্র্য, ঋণ, অভাব, অন্যদিকে লোভী অসুরের যক্ষের ব্যাঙ্কে কোটি কোটি..., এ ভেদ জ্ঞান দূর করতেই এসেছিলাম।"[১২০] নজরুলের সংগ্রামের কারণ নীলিমা ইব্রাহিম বর্ণনা করেছেন এভাবে-"একদিকে পরাধীনতার বিষময়জ্বালা ও অন্যদিকে ধনতান্ত্রিক সভ্যতার কুক্ষিতে সামাজিক জীবনের অসাম্যজনিত দুঃখ-ক্লেশ কবিকে উন্মাদ করে তুলেছিলো। নির্জিত মানবতার জাগরণ-উন্মাদনায় কবি সেদিন উন্মত্ত হয়ে উঠেছিলেন।"[১২১]

সমাজের ধনী-গরিবের অসাম্য যে কতো তীব্র আকার ধারণ করেছিলো তার বর্ণনা পাওয়া যায় নজরুলের 'ধর্মঘট' প্রবন্ধে। সেখানে তিনি একটি প্রবাদের মাধ্যমে চাষা সম্প্রদায় ও তার 'নাড়া-কাটা' প্রভুদের চিত্র অঙ্কন করেছেন। তিনি দেখান যে, চাষীরা হাড়-ভাঙা পরিশ্রম করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলেও যখন দু'মুঠো অন্নের ব্যবস্থা করতে পারে না, হাঁটুর উপর পর্যন্ত একটা তেনা বা নেঙটা ছাড়া ভালো কাপড় পরতে পারে না, ছেলেমেয়েদের সাধ-ইচ্ছা মেটাতে পারে না, বরং কশাইখানার পশু অপেক্ষাও নিকৃষ্টতর জীবন অতিবাহিত করে এবং বীভৎস নরকঙ্কালের মতো দেহে ত্রিশ-চল্লিশ বছরেই জীবনের সাঙ্গ করে, তখন মহাজনরা পায়ের উপর পা দিয়া নওয়াবি চালে বারো মাসে তেত্রিশ পার্বণ করে থাকে। এ হতভাগাদের দিকে তারা ফিরেও তাকায় না।

---

[১১৭] শান্তিরঞ্জন ভৌমিক, *নজরুলের উপন্যাস* (ঢাকা: নজরুল ইন্সটিটিউট, ১৯৯২), পৃ. ৬৬।
[১১৮] রফিকুল ইসলাম, কাজী নজরুল ইসলাম:, পৃ. ৩৩।
[১১৯] অনীক মাহমুদ, চিরায়ত বাংলা:, ১৬৮।
[১২০]"অভিভাষণ," নর ৮ম, পৃ, ৪৭-৮।
[১২১] নীলিমা ইব্রাহিম, বাঙালি মানস ও বাংলা সাহিত্য, পৃ. ৮৩।

অনুরূপ চিত্র অঙ্কিত হয়েছে 'গরিবের ব্যথা' কবিতাতেও। সেখানে নজরুল একটি গরিব ঘরের সন্তান ও ধনীর সন্তান লালন-পালন প্রক্রিয়ার মধ্যকার তুলনামূলক পার্থক্য তুলে ধরেন এবং এর মাধ্যমে তিনি সম্পদের অসম বন্টনের ফলে সৃষ্ট দরিদ্র শ্রেণির যে ভয়াবহ দুর্দশা তা বর্ণনা করেছেন। তিনি দেখান যে, ধনীর সন্তানের জন্য থরে থরে পোশাক সাজানো থাকলেও গরিবের সন্তান হাঁড়কাপানো শীতে বস্ত্রহীন ভাবে মায়ে-পোয়ে ছাঁচ-গলিতে শুয়ে থাকতে বাধ্য হয়। ধনীর সন্তান যখন বাবা-মায়ের আদরে লালিত-পালিত হচ্ছে, উন্নতমানের খাবার খাচ্ছে তখন গরিবের ঐ সন্তানটি হয়তো ডাস্টবিনের পঁচা-গলা খাবার খেয়ে রাস্তার পাশে, বাসস্ট্যাণ্ডের ধারে নোংরা কাপড় পড়ে জন্তু-জানোয়ারের সাথে ঘুমিয়ে থাকে। ধনীর সন্তানকে খাওয়ানোর জন্য যখন তার পিতা-মাতা পেছনে পেছনে তাড়া করছে তখন হয়তো গরিবের ঐ সন্তানটি ক্ষুধার খাবারের জন্য মানুষের কাছে হাত পাতছে কিন্তু তাকে খাবার না দিয়ে ঘৃণাভরে গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দিচ্ছে। যেখানে ধনীর সন্তানকে লালনের জন্য দাস-দাসী রাখা হচ্ছে তখন হয়তো গরিবের ঐ সন্তানটির একটু তেলের অভাবে মাথার কটা চুলে জটা বেঁধে গেছে। ধনীর সন্তানের শরীর সামান্য গরম হলেই ডাক্তারের পর ডাক্তার লাগিয়ে রাখা গয়, অথচ গরিবের সন্তান জ্বরের ধুক্‌ধুকানিতে মরতে বসলেও এদের মুখে এক গ্লাস পানি দেওয়ার কেউ থাকে না। সমাজের এই হেন বৈষমকে উদ্ঘাটনের মাধ্যমে নজরুল মানুষের মধ্যকার সুপ্ত নৈতিকতাকে জাগ্রত করাতে চান। তিনি মানুষের বিবেককে নাড়া দিয়ে বলেন-

এদের ফেলে ওগো ধনী, ওগো দেশের রাজা,
কেমন করে রোচে মুখে মণ্ডা-মিঠাই-খাজা?[১২২]

নজরুল লক্ষ করেন সামাজিক বৈষম্য-রীতিতে সৃষ্ট কুলি-মজুর, চাষীর ভাগ্যেন্নোয়নের পথ রুদ্ধ। যে মানুষের পরিশ্রমের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে মানব সভ্যতা, সেই মানুষগুলোই আজ তথাকথিত সুবিধাভোগী বাবুশ্রেণির অমানবিক নির্যাতনের শিকার। বাবুশ্রেণী বিলাস বাসনের জীবন-যাপন করছে শ্রমিকের গড়া সেই ইমারতে। আর ইমারতের সেই কারিগররা থাকছে বস্ত্রহীন; অনাহারে অর্ধাহারে কাটছে তাদের দিন, অন্যের গতি বৃদ্ধি করে নিজেরা থাকছে গতিহীন। কষ্টার্জিত অর্থে সন্তানকে দু'মুঠো ভাত মুখে তুলে দিতে না পারলেও ধনীদের সন্তানরা মিন্ডা-মিঠাই খেয়ে বড় হচ্ছে। এই ঘৃণ্য আচরণে নজরুল ব্যথিত হয়ে বিদ্রোহী হয়ে উঠেন। তিনি সামাজিক এই বৈপরীত্য ও বৈষম্যের বিপরীতে সর্বকালের সর্বদেশের মানুষের মধ্যে সমানাধিকার ও ন্যায়সংগত সাম্যভিত্তিক সম্পদ বন্টনের আহ্বান করেন।

মাটির ঘরে জন্ম নজরুল; তাই আজীবন এই সকল মাটির মানুষের দুঃখ-বেদনা, চাষী-কুলি-শ্রমিক শ্রেণির বীভৎস নগ্নতা, মনুষ্যত্ব-বিবর্জিত অমানুষিক পাশবিকতায় ব্যথিত হন। তাদের মুক্তির

[১২২] "গরিবের ব্যাথা," 'নির্ঝর,' নর ৫ম, পৃ. ২৫।

জন্য Larger humanity বা মহত্তর মানবতা প্রতিষ্ঠার জন্য আহ্বান করেন। নজরুল ইউরোপ আমেরিকার পদাঙ্ক অনুসরণ করে বাংলার শ্রমিকের জন্যও একই নীতি অনুসরণের স্বপ্ন দেখেন, যেখানে শ্রমিকরা তাদের উপার্জন দিয়ে স্বাস্থ্য-শিক্ষা, আহার-বিহার ভালোভাবে করতে পারবে। এক্ষেত্রে নজরুল মনে করেন শ্রমিক আন্দোলনের সাথে সাথে গণতন্ত্রের জাগরণও দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ছে এবং পড়বে।[১২৩] নজরুল এই প্রবন্ধের মাধ্যমে মানুষের মধ্যকার মানবিকতা ও নৈতিকতাকে জাগ্রত করতে চেয়েছেন। তিনি চাষী, শ্রমিক, কুলি শ্রেণির দুর্দশা বর্ণনা করেছেন মানুষের সহনুভূতি ও তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার উপায় হিসেবে। যার মূল লক্ষ্য নৈতিকতার মহাজাগরণ।

সমাজের উঁচু-নীচুভেদকে তিনি দুপায়ে মাড়ায়ে বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। এজন্য সমাজে যাদেরকে 'ছোটলোক' সম্প্রদায় হিসেবে গণ্য করা হয়, সমাজ গঠনে যাদেরকে দূরে রাখা হয় অথবা যাদের অবদানকে অস্বীকার করা হয়, সমাজের এই দশ আনা শক্তিকে উপেক্ষা না করে বরং দেশগঠনে তাদেরকে অংশী করার জন্য আহ্বান করেন। তিনি মনে করেন যাদেরকে 'ছোটলোক' বলা হয় তারা প্রকৃতপক্ষে ছোটলোক নয় বরং অভিজাত শ্রেণির অন্তরই মসীময় অন্ধকার ও প্রকৃত ছোটলোক। নজরুল মনে করেন যখনই এই ছোটলোক শ্রেণি তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য উৎপীড়নের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে তখনই ভদ্র সম্প্রদায় তাদের মাথায় প্রচণ্ড আঘাত করেছে এবং তাদের অবদমন করেছে। আর এজন্যই জাতির অধঃপতন হয়েছে। তাই দেশের উন্নয়নের স্বার্থে তাদের মূল্যায়ন করতে হবে। কেননা আভিজাত্য-গর্বিত, মিথ্যুক ভণ্ড ভদ্র সম্প্রদায় দিয়ে কখনোই কোনো দেশ বা জাতিগঠন সম্ভব নয়। নজরুল মনে করেন যদি এই অবহেলিত মানুষগুলোকে উদ্বুদ্ধ করা যায় তাহলে শত বছরের প্রচেষ্টাকে তারা নিমিষেই সম্ভব করে তুলবে। যেমন করতে পেরেছিলেন মহাত্মা গান্ধী। তিনি অনাহারের সমবেদনায় নিজে অনাহারী থেকেছেন, জাতি-বর্ণ ভেদ করতেন না বলেই তাঁর ডাকে সবাই সাড়া দিয়েছেন। তাই নজরুল ভদ্র সম্পদায়কে আহ্বান করে বলেন- "আমাদের এই পতিত, চণ্ডাল, ছোটলোক ভাইদের বুকে করিয়া তাহাদিগকে আপন করিয়া লইতে, তাহাদেরই মতো দীন বসন পরিয়া, তাহাদের প্রাণে তোমারও প্রাণ সংযোগ করিয়া উচ্চ শিরে ভারতের বুকে আসিয়া দাঁড়াও, দেখিবে বিশ্ব তোমাকে নমস্কার করিবে।"[১২৪]

এই অবহেলিত শ্রেণির প্রতি মানুষের সহমর্মিতা বৃদ্ধি ও অধিকার নিশ্চিতের জন্য তিনি তাদের গুণকীর্তন করেন, তাদের অবদানকে স্বীকার করেন। তিনি দেখান যে, শ্রমিকদের শ্রমের ফলেই পাহাড়ের তুষার গলে, মরুভূমিতে ফসল ফলে, সিন্ধু চষে মুক্তা আনে, কয়লা খনি থেকে মুক্তা

---

[১২৩] "ধর্মঘট," 'যুগবাণী,' নর ১ম, পৃ. ৩৮২-৩।

[১২৪] "উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন," 'যুগবাণী,' নর ১ম, পৃ. ৩৯৭।

আসে, পাতাল ফেড়ে ফণীর মাথার মণি আনে। 'কুহেলিকা' উপন্যাসে তিনি এই কৃষকশ্রেণিকে অঙ্কিত করেছেন সৃষ্টির সবচেয়ে খাঁটি মানুষ হিসেবে, সবচেয়ে বড় কবি হিসেবে। তিনি মনে করতেন কবিরা 'কথার কবি' কিন্তু কৃষকরা 'সত্যিকার ফুলের কবি'; কবিরা কালি-ভরা কলম দিয়ে যে ফুল ফুটাতে পারে না কৃষকের লাঙল তারচেয়ে বেশি ফুল ফুটাতে পারে। কৃষকের শ্রমের ফলেই ধরণীতে এত ঐশ্বর্য-সম্ভার, এত রূপ, এত যৌবন। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র জাহাঙ্গীর বন্ধু হারুনের সাথে তার গ্রামের বাড়ি যাওয়ার পথে মাঠ-ঘাটের অপরূপ দৃশ্য তাকে মোহিত করে। এর চিত্রকরের প্রতি তিনি বিনয়াবনত হন। তাদের উদ্দেশ্যে জাহাঙ্গীরের উক্তির মধ্য দিয়ে নজরুল তাঁর দর্শন ফুটিয়ে তুলেন। তিনি বলেন-

> তাই ভাবছি হারুন, এত বিপুল শক্তি এত বিরাট প্রাণ নিয়েও এরা পড়ে আছে কোথায়। এরা উদাসীন আত্মভোলার দল, সকলের জন্য সুখ সৃষ্টি করে নিজে ভাসে দুঃখের অথৈ পাথারে। এরা শুধু কবি নয় হারুন, এরা মানুষ! এরা সর্বত্যাগী তপস্বী দরবেশ! এরা নমস্য।[১২৫]

তিনি বিশ্বাস করতেন কৃষক ও চাষা ছাড়া মানব সভ্যতা বিকোশিত হতে পারে না। রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে তারা সকলের অন্ন জোগায়। তাই তাদেরকে ঘৃণা করা উচিত নয়। 'চাষী' মক্তব সাহিত্যে নজরুল এ বিষয়ে বলেন-

চাষীকে কেও চাষা বলে
করিও না ঘৃণা,
বাঁচতাম না আমরা কেহ
ঐ যে কৃষাণ বিনা।[১২৬]

অন্যত্র 'মানুষ' কবিতায় তিনি বলেন-

রাখাল বলিয়া কারে করো হেলা, ও-হেলা কাহারে বাজে !
হয়তো গোপনে ব্রজের গোপাল এসেছে রাখাল-সাজে !
চাষা বলে করো ঘৃণা!
দেখো চাষা-রূপে লুকায়ে জনক বলরাম এল কি না![১২৭]

নজরুল মানুষকে অর্থের বিচারে বিচার না করে মানবিকতার দিক থেকে বিচারের জন্য আহ্বান করেন। এজন্য সমাজের হীনপতিত ঘৃন্য মানুষও কবির দেওয়া সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত হয়নি; বারাঙ্গনাদেরকে যেমন তিনি শ্রদ্ধা করেছেন তেমনি 'কুহেলিকা'র জারজ জাহাঙ্গীর, বাঈজি সন্তান সকলের প্রতি কবির সমান সহানুভূতি ছিলো। এমনকি নজরুল চাড়াল-ডোমসহ সকল মানুষের দেহকে মন্দির-মসজিদের চেয়ে পবিত্র মনে করেন। সকলকে 'মানুষের জন্য ধর্ম, ধর্মের

---

[১২৫] "কুহেলিকা," নর ৩য়, পৃ. ২৯০।
[১২৬] "চাষী," 'মক্তব সাহিত্য,' নর ৬ষ্ঠ, পৃ. ৩৭৪।
[১২৭] "মানুষ," 'সাম্যবাদী', নর ২য়, পৃ. ৮৩।

জন্য মানুষ নয়'; 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'; । 'মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান', 'মানুষধর্মই সবচেয়ে বড় ধর্ম' এই সত্যকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করতে বলেন।

মানুষকে তিনি দেখেছেন অপার সম্ভাবনার এক মিলনক্ষেত্র হিসেবে। কেননা তিনি মনে করেন এই মানুষের মধ্যেই ঈশ্বরের অবস্থান, এই মানুষই সাধনাবলে অবতার তথা ইবরাহিম, মূসা, ঈসা, মুহাম্মদ, কল্কি, বুদ্ধ, কৃষ্ণের মতো মহাপুরষ হয়ে যেতে পারেন। নারী-পুরুষ, পাপী-তাপী, চোর-ডাকাত, বারাঙ্গনা, লম্পট প্রভৃতি নানা দোষে দুষ্ট, নির্গুণ, নির্বোধ ও নিষ্ঠুর মানুষকে ইতোপূর্বে এমন নিঃসংশয়ে, আদরে, করুণায়, নিঃসঙ্কোচে সামাজিকভাবে কেউ কখনো গ্রহণ করেনি।[১২৮] সুতরাং নিজেকে ছোটো ভাবা উচিত নয়। মানুষ নিজেদের অসীমতা জানতে পারে না তাই তারা নিজেকে ছোটো মনে করে। নজরুল এই আত্ম-অজানা মানুষকে জেগে উঠার আহ্বান জানিয়ে বলেন-

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, যাহা সাধ–তুমি তাই হতে পারো,
ক্ষুদ্রের মাঝে থাকো তুমি, তাই বৃহতের সাথে হারো।
ভাঙো ভাঙো এই ক্ষুদ্র গণ্ডি, এই অজ্ঞান ভোলো,
তোমাতে জাগেন যে মহামানব, তাহারে জাগায়ে তোলো!
তুমি নও শিশু দুর্বল, তুমি মহৎ ও মহীয়ান,
জাগো দুর্বার, বিপুল, বিরাট, অমৃতের সন্তান।[১২৯]

তিনি মনে করেন এই পৃথিবীর মালিকানা কোনো ব্যক্তি, জাতি, গোষ্ঠী বা দেশ বিশেষের নয়; মালিকানা একমাত্র আল্লাহর। আল্লাহর সৃষ্ট জীব হিসেবে সকল মানুষের সমঅধিকার রয়েছে সবকিছুর মধ্যে। আর এটিই সাম্যের মূলমন্ত্র। আল্লাহ সকল মানুষকে তাঁর নেয়ামত সমানভাবে প্রদান করেন। ফলে মানুষের কোনো অধিকার নেই কারো অধিকার হরণ করার। মানুষ হয়ে অপর মানুষের অপমানকে নজরুল দেখেছেন খোদার উপর খোদকারি রূপে। খোদা আনন্দের বিকাশ-স্বরূপ মানুষ সৃষ্টি করেছেন। ফলে তিনি মানুষের প্রতি বৈষম্য করেন না। সকল ধরণের বৈষম্য মানুষ সৃষ্ট। নজরুল তাই মানুষের বিবেককে তথা নৈতিকতাকে জাগ্রত করতে গিয়ে বলেন-

খোদার সৃষ্টি-তাহার আনন্দের বিকাশ-স্বরূপ এই মানুষকে ঘৃণা করিবার অধিকার তোমায় কে দিয়াছে ? তোমাদেরই বা বড় হইবার অধিকার কে দিয়াছে, তুমি কিসের জন্য ভদ্র বলিয়া মনে করো? এসব যে তোমারই সৃষ্টি, –খোদার উপর খোদকারি। এই মহা-অপরাধের মহাশাস্তি হইতে তোমার রক্ষা নাই, –রক্ষা নাই।[১৩০]

---

[১২৮] আহমদ শরীফ, একালে নজরুল, পৃ. ৯৭।
[১২৯] "মায়া-মুকুর," 'অগ্রন্থিত কবিতা,' নর ৯ম, পৃ. ৭৪।
[১৩০] "উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন," 'যুগবাণী,' নর ১ম, পৃ. ৩৯৬-৭।

'কুলি-মজুর' কবিতাতে বাবু সা'ব কর্তৃক কুলিকে নিচে ফেলে দেওয়ার দৃশ্য দেখে নজরুলের যে বেদনার ভাব জাগ্রত হয়েছে তা থেকেই এই কুলি শ্রেণির সাম্যের দিকটিকে তিনি গুরুত্ব দিয়ে দেখেন। সভ্যতা বিনির্মাণে কুলি-শ্রমিক শ্রেণির অবদান উল্লেখ করে তাদেরকে তিনি জেগে উঠার আহ্বান করেন। 'শ্রমিকের গান' কবিতাতেও নজরুল শ্রমিকদের ত্যাগের বর্ণনা দিয়ে শ্রমিকদের জেগে উঠার ডাক দেন। নজরুলের আহ্বান-

ওরে ধ্বংস-পথের যাত্রীদল !
ধর হাতুড়ি, তোল কাঁধে শাবল ॥
আমরা হাতের সুখে গড়েছি ভাই,
পায়ের সুখে ভাঙব চল।
ধর হাতুড়ি, তোল কাঁধে শাবল ॥[১৩১]

'কৃষাণের গান' কবিতায় নজরুল বলেন ভারতবর্ষের মাটি যেনো সোনা। বীজ পড়লেই সোনার শস্য উৎপন্ন হয়। পর্তুগিজ, ওলন্দাজ এবং ব্রিটিশদের আগমনের পূর্বে বাঙালির গলায় গলায় গান আর গোলায় গোলায় ধান ছিলো। কিন্তু তারা আগমনের পর থেকে বাংলার সোনা বিদেশীরা নিয়ে যেতে থাকে। ফলে বাঙালির গান, ধান গরু সব কিছু চলে যেতে থাকে। বাঙালিরা দিনে দিনে নিঃস্ব হয়ে যায়। নিজ হাতে ফসল তুলে দিতে হতো অন্যের গোলায়। এ অবস্থা আর চলতে পারে না। তাই নজরুল কৃষকদের আহ্বান করছেন এর প্রতিবাদ করতে এবং নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে। তিনি বলেন-

আজ জাগ রে কৃষাণ, সব তো গেছে, কিসের বা আর ভয়,
এই ক্ষুধার জোরেই করব এবার সুধার জগৎ জয়।
ঐ বিশ্বজয়ী দস্যুরাজার হয়-কে করব নয়,
ওরে দেখবে এবার সভ্যজগৎ চাষার কত বল ॥[১৩২]

'ঈদের চাঁদ' কবিতায় নজরুল গরিবের সম্পদ লুটকারী ধনীদেরকে গরিবের প্রাপ্য হিস্যা আদায় করতে বলেন। অন্যথায় তাদেরকে ঈদগাহে যেতে না দেওয়ার হুমকি দেন। তিনি বলেন-

দ্বার খোলো সাততলা-বাড়ি-ওয়ালা, দেখো কারা দান চাহে,
মোদের প্রাপ্য নাহি দিলে যেতে নাহি দেবো ঈদ্‌গাহে।[১৩৩]

আর 'ফরিয়াদ' কবিতায় ধণিকশ্রেণি দরিদ্রশ্রেণির উপর যে নির্যাতন করছে তার অবসান কামনা করে নজরুল বলেন-

এত অনাচার সয়ে যাও তুমি, তুমি মহা মহীয়ান !
পীড়িত মানব পারে নাকো আর, স'বে না এ অপমান ![১৩৪]

---

[১৩১] "শ্রমিকের গান," 'সর্বহারা,' নর ২য়, পৃ. ১১৪।
[১৩২] "কৃষাণের গান," 'সর্বহারা,' নর ২য়, পৃ. ১১৪।
[১৩৩] "ঈদের চাঁদ," 'নতুন চাঁদ,' নর ৬ষ্ঠ, পৃ. ৪৪।

'চাষার গান' কবিতাতে চাষী কৃষকদের অবস্থা বলতে গিয়ে বলেন যে, কৃষকরা তাদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে শস্য উৎপাদন করলেও তার সিংগভাগই রাজার সেপাই নিয়ে যাওয়ায় চাষীর অভাব কোনোদিন শেষ হয় না। অথচ চাষার ফসল দিয়ে জমিদারের আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হওয়ার উপক্রম হয়। তারা বারো মাসে তেরো পূজা করলেও কৃষকদের উনানে শূন্য হাড়ি। এমতাবস্থায় নজরুল মনে করেন তাদের প্রাপ্য হিস্যা আদায় করার জন্য প্রয়োজনে চাষের লাঙলকে অস্ত্র বানিয়ে রাজার পিয়াদাকে শায়েস্তা করতে হবে। তাই তিনি কৃষকদের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে তাদেরকে আহ্বান করেন। 'কৃষকের ঈদ' কবিতাতেও এই একই চিন্তার প্রতিফলন দেখা যায়। ঈদের আনন্দের দিনেও হয়তো খাবারের অভাবে কৃষকের সন্তান মারা গেছে। গরিবের শরীরে পোশাক না থাকলেও ধনীদের শরীরে রয়েছে বাহারী পোশাক। আর ইমাম সেই ধনীদেরই প্রতিনিধি। 'জাগর-তূর্য' কবিতাতেও নজরুল শ্রমিক শ্রেণিকে সব মহিমার উত্তরাধিকারী হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেন যে, তারা সকল অলিখিত গল্পের নায়ক হলেও তারাই আজ নিগৃহিত। নজরুল শ্রমিক শ্রেণির অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে দিয়ে বলেন যে ঘুমের ঘোরে যে শৃঙ্খল তার দেহ-মন বিকল করে রেখেছে, আজ সময় এসেছে সব শৃঙ্খল ছিন্ন করার। সমীর যেমন শিশির-বারি ঝেড়ে ফেলে তেমনি সকল শৃঙ্খল ঝেড়ে ফেলতে হবে। অত্যাচারীরা সংখ্যায় অল্প, অথচ দলিত শ্রেণি সংখ্যায় অসংখ্য। তাই 'রুদ্র-মঙ্গল' প্রবন্ধে অন্যায়ের অবদমন করার জন্য কৃষক, মুটে-মজুরদের আহ্বান করে নজরুল বলেন-

> জাগো জনশক্তি ! হে আমার অবহেলিত পদপৃষ্ট কৃষক, আমার মুটে-মজুর ভাইরা ! তোমার হাতের এ-লাঙল আজ বলরাম স্কন্ধে হলের মতো ক্ষিপ্ত তেজে গগনের মাঝে উৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠুক, এই অত্যাচারীর বিশ্ব উপড়ে ফেলুক– উলটে ফেলুক ! আন তোমার হাতুড়ি, ভাঙ ঐ উৎপীড়কের প্রাসাদ–ধুলায় লুটাও অর্থ-পিশাচ বল-দর্পীর শির। ছোড়ো হাতুড়ি, চালাও লাঙল, উচ্চে তুলে ধর তোমার বুকের রক্তে-মাখা লালে-লাল ঝাণ্ডা !যারা তোমাদের পায়ের তলায় এনেছে, তাদের তোমরা পায়ের তলায় আন। সকল অহঙ্কার তাদের চোখের জলে ডুবাও। নামিয়ে নিয়ে এস ঝুঁটি ধরে ঐ অর্থ-পিচাশ যক্ষগুলোকে।[১৩৫]

অন্যদিকে নজরুল গরিবদের অধিকার আদায়ের প্রতি ধনীদের আহ্বান করেন। অন্যথায় গরিবদের বিদ্রোহের সম্মুখিন হতে হবে বলে তিনি হুঁশিয়ারি দেন। বিপ্লব তাঁর উদ্দেশ্য নয়। তিনি চাইতেন সাম্যভিত্তিক নৈতিক সমাজ; যেখানে সবাই তার নিজের অধিকার নিয়ে মানুষের মতো বেঁচে থাকবে; থাকবে না কোনো ভেদজ্ঞান, হানাহানি, রক্তারক্তি; থাকবে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন, সহমর্মিতা, পরমতসহিষ্ণুতা; একের দুঃখে অন্যে কাতর হবে; বিপদে এগিয়ে আসবে; সকল বিপদ সবাই মিলে মোকাবেলা করবে; কাঁধে কাধে, গলায় গলায় ভাব নিয়ে সমাজে বসবাস করবে। আর এভাবেই প্রতিষ্ঠিত হবে একটি কল্যাণমূলক ও সাম্যভিত্তিক সমাজ ও রাষ্ট্র।

---

[১৩৪] "ফরিয়াদ," 'সর্বহারা,' নর ২য়, পৃ. ১২৪।
[১৩৫] "রুদ্র-মঙ্গল," নর ২য়, পৃ. ৪১৯-২০।

নজরুলের রাজনৈতিক ভাবনায় নৈতিকতা

নজরুল যে সমাজ ও রাষ্ট্রে বসবাস করতেন সে সমাজ ও রাষ্ট্র ছিলো ব্রিটিশ শাসনের অধীন। শোষণ ছিলো তাদের মূল উদ্দেশ্য। পরাধীন রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে কারোরই রাজনৈতিক স্বাধীনতা ছিলো না। ব্রিটিশদের শাসন-শোষণ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের আন্দোলন দানা বেঁধে উঠতে থাকলে ব্রিটিশরা তা অঙ্কুরেই ধ্বংস করে দেয়। ব্রিটিশদের দমন-পীড়নমূলক আচরণ দেখে নজরুল মানসিকভাবে আহত হন। মানুষ হয়ে মানুষের অপমানকে তিনি দেখেন মানবতার অপমান হিসেবে। নজরুলের কামনা ছিলো ভারতের এক বিন্দু জায়গাও ব্রিটিশদের অধীন না রাখা। রাষ্ট্রের স্বাধীনতাই ছিলো তাঁর ভাবনার কেন্দ্রবিন্দু। এজন্য তিনি বিপ্লবীদেরকে যেমন একদিকে বিপ্লবের জন্য আহ্বান করেন, তেমনি ধর্মপাগল মানুষকে ধর্মকলহ বাদ দিয়ে ধর্মের প্রকৃত বিধান অনুসরণের জন্য আহ্বান করেন। কেননা তিনি বিশ্বাস করতেন প্রচলিত প্রতিটি ধর্মই তার অনুসারীদেরকে দেশপ্রেমের প্রতি গুরুত্ব এবং রাষ্ট্রের স্বাধীনতাকে অক্ষুন্ন রাখার প্রতি নির্দেশ দিয়েছে। হযরত মুহাম্মদ (সা:) থেকে শুরু করে হযরত উমর (রা:) এর শাসন প্রক্রিয়ায় মানুষের মর্যাদা ও প্রজাহিতৈষী মনোভাব নজরুলকে ব্যাপকভাবে আকৃষ্ট করে। তিনি এমন শাসকের প্রত্যাশা করেন যে শাসক হযরত উমরের (রা:) এর ন্যায় রাষ্ট্র পরিচালনা করবেন। সে শাসকের নিকট কোনো জাতি-ধর্ম-বর্ণ মুখ্য না হয়ে বরং মানুষ মুখ্য হবে। সে শাসনব্যবস্থায় সকলের মর্যাদা হবে খোদার সৃষ্টি হিসেবে এবং সেখানে রাজা-প্রজার কোনো ভেদ থাকবে না, মন্দির-মসজিদ-গির্জা তার নিকট সমান মর্যাদা পাবে। ধর্মীয় নৈতিকতা হবে সে রাষ্ট্রের ভিত্তি।

এজন্য নজরুল রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কিত প্রতিটি অঙ্গকে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যকে সুষ্ঠুভাবে পালন করতে বলেন। আর এটিকে তিনি দেখেছেন ধর্মের নৈতিক বিধান হিসেবে।

নাগরিক ও রাষ্ট্র

প্লেটো তাঁর *রিপাবলিক* গ্রন্থে নাগরিক ও রাষ্ট্রের মধ্যকার সম্বন্ধ কেমন হবে তার চিত্র তুলে ধরেছেন। নাগরিককে তিনি একই সাথে ব্যক্তি ও সামাজিক জীব হিসেবে দেখেছেন। রাষ্ট্র একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাচীন সামাজিক ও নৈতিক প্রতিষ্ঠান। রাষ্ট্রের দুই ধরনের নৈতিক কাজ রয়েছে। (১) ব্যক্তিকে অন্য ব্যক্তির অধিকার হরণে বাধা দেওয়া এবং ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য নেতিবাচক ক্রিয়া; (২) ব্যক্তির বস্তুগত ও নৈতিক ভালোর জন্য ইতিবাচক ক্রিয়া। যারা রাষ্ট্রের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে ও নিয়ম লঙ্ঘন করে তাদের প্রতিহত করে শান্তি ও শৃঙ্খলা নিশ্চিত করাই হলো রাষ্ট্রের নেতিবাচক দিক। আর ইতিবাচক দিকগুলোর মধ্যে ব্যক্তির বস্তুগত উন্নতির পাশাপাশি আধ্যাত্মিক উন্নতি যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চাকরি, এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির ব্যবস্থা করা। আধুনিক জগতে এটিই

'কল্যাণ রাষ্ট্র'[১৩৬] নামে পরিচিত। নজরুলের ভাবনায় এই কল্যাণ রাষ্ট্রের রূপরেখার উপস্থিতি রয়েছে।

রাষ্ট্রের প্রতি মানুষের রয়েছে কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য। তার মধ্যে দেশপ্রেম, দেশকে ভালোবাসা, এর সমৃদ্ধির জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করা, এর অর্জনে গৌরবান্বিত হওয়া, রাষ্ট্রের শৃঙ্খলাবিরোধী কোনো কর্ম না করা, জাতি-ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ নির্বিশেষে সকলের প্রতি সৌহাদ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা প্রভৃতি।[১৩৭] নজরুল মনে করেন, নাগরিকদের দায়িত্বই হলো রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের জন্য অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকা পালন করা। পরাধীনতা থেকে স্বাধীনতা আনয়ন করাই তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। তবে তিনি মনে করেন স্বাধীনতা এমনি এমনি আসবে না। তার জন্য সংগ্রাম করতে হবে। তিনি বলেন-"পূর্ণ স্বাধীনতা পেতে হলে সকলের আগে আমাদের বিদ্রোহ করতে হবে, সকল-কিছু নিয়ম-কানুন বাঁধন-শৃঙ্খল মানা নিষেধের বিরুদ্ধে।"[১৩৮] এজন্য তিনি সাহিত্যকে বেছে নিয়েছেন প্রতিবাদের হাতিয়ার হিসেবে। গোলাম মুরশিদের মতে, নজরুলের কবিতা বলতে বোঝায় দেশাত্মবোধক কবিতা, বিপ্লবের কবিতা, নির্যাতন-বিরোধী কবিতা, ঘুম ভাঙানোর কবিতা।[১৩৯] নজরুল আরো মনে করতেন বাঙালির স্বাধীনতা তখনই অর্জিত হবে যখন সবাই মুক্তির তীব্র আকাঙ্খা নিয়ে জেগে উঠতে পারবে। সমাজের বিদ্যমান বিষবাষ্প উপড়ে ফেলতে পারবে। এ জন্য তিনি করণীয় সম্পর্কে বলেন-

> আর আমাদের নিরাশায় মুষড়ে পড়ে থাকার সময় নেই, সবাইকে মুক্তির তীব্র আকাঙ্খা নিয়ে জাগতে হবে, গা-ঝাড়া দিয়ে উঠতে হবে। আমাদের অন্তরে, বাহিরে, সমাজে, ধর্মে, রাষ্ট্রে মৃত্যুর বিষবীজ ছড়িয়ে আছে–সে করাল কবল থেকে আমাদের রক্ষা পেতেই হবে–আর তার জন্যে সর্বাগ্রে চাই স্বরাজ।[১৪০]

ইমানুয়েল কান্ট মনে করেন, যুক্তিসম্মত আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও অনুগত হওয়া প্রত্যেক নাগরিকের অবশ্য কর্তব্য।[১৪১] যুক্তিসংগত আইনের প্রতি নজরুলেরও ছিলো অগাধ শ্রদ্ধা। কিন্তু তৎকালীন শাসকগণ এমন নিয়ম-নীতি ও আইন প্রণয়ন করেছিলো যাতে করে তারা সোনার সিংহাসনে বসে নিশ্চিন্তে গুড়ুক টানতে পারে। এ জন্য ক্ষুদিরাম বসু, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, বাংলার কৃষকসহ যারাই স্বাধীনতার প্রশ্নে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছেন তাদেরই বিরুদ্ধে ব্যাপক দমন-পীড়নমূলক

---

[১৩৬] কল্যাণ রাষ্ট্র বলতে সে রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে বুঝায় যে রাষ্ট্র নাগরিকদের জন্য খাদ্য, বস্ত্র, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার সুবিধা প্রদান করে এবং বেকারত্ব, অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে জীবিকা অর্জনে ব্যর্থ জনগণের পূর্ণ অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।

[১৩৭] Jadunath Sinha, *A Manual of Ethics*, Revised ed. (Calcutta: New Central Book Agency,1984), p. 283-4.

[১৩৮] "ধূমকেতু'র পথ," 'রুদ্র.মঙ্গল,' নর ২য়, পৃ. ৪২৮।

[১৩৯] গোলাম মুরশিদ, বিদ্রোহী রণক্লান্তঃ, পৃ. ১১৪।

[১৪০] "মুশকিল," নর ৭ম, পৃ. ১১।

[১৪১] আমিনুল ইসলাম, *আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শন*, পৃ. ২৭১-২।

ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। দেশের স্বাধীনতা ছিলো নজরুলের প্রধান স্বপ্ন। 'ধূমকেতু'র প্রতিটি পাতার ছত্রে ছত্রে প্রতিফলিত হয়েছে সেই স্বাধীনতার আকাঙ্খা। তিনি মনে করেন দেশকে পরাধীনতা থেকে মুক্ত করা প্রতিটি নাগরিকের প্রধান কর্তব্য। আর তার জন্য প্রয়োজনে অবৈধ আইন লংঘন করতে হবে। কেননা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন স্বাধীনতাকামীদের সুবোধ বালকের মতো আইন মানা পথে স্বাধীনতা আসবে না। এজন্য জীবনের প্রথমেই তিনি 'বিদ্রোহী' কবিতাতে অপশাসকদের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ শুরু করেছিলেন 'ধূমকেতু'র মাধ্যমে তাঁর পূর্ণতা আনেন। গোলাম মুরশিদ এ প্রসঙ্গে বলেন যে, *ধূমকেতুর* প্রধান অবদান হলো তরুণ সমাজকে দেশের স্বাধীনতার প্রতি সচেতন করে তোলা এবং স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে ত্যাগে উদ্বুদ্ধ করা।[১৪২]

এটি করতে গিয়ে দেশের জন্য যুদ্ধ করাকে প্রতিটি নাগরিকের ধর্মীয় ও নৈতিক দায়িত্ব হিসেবে তিনি বিবেচনা করেন। এজন্য প্রয়োজনে আত্মত্যাগ করতে হবে বলে তিনি স্মরণ করিয়ে দেন এবং আত্ম-অবমাননা, আত্ম-প্রবঞ্চনা থেকে দূরে থাকতে পরামর্শ দেন। যারা নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থে দেশের বৃহৎ স্বার্থকে জলাঞ্জলি দেওয়ার জন্য আলাদা দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে তাদের উদ্দেশ্যে নজরুলের বক্তব্য-

> আমরা স্বাধীন–মুক্ত। সে যেই হোক না কেন, আমরা কেন তার অধীনতা স্বীকার করতে যাব? শিকল সোনার হলেও তা শিকল। ... আমার জন্মভূমি কোনো বিজয়ীর চরণ স্পর্শে কখনো কলঙ্কিত হয়নি, আর হবেও না। 'শির দিব, তবুও স্বাধীনতা দিব না।'[১৪৩]

নজরুলের এই স্বাধীনতার স্বপ্ন পূরণের প্রধান অন্তরায় ছিলো তৎকালীন ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলোর ভ্রান্ত প্রবণতা। প্রতিটি ধর্মে দেশপ্রেমকে ঈমানের অংশ করলেও অধিকাংশ মানুষ শুধু প্রচলিত ধর্মাচার ও শাস্ত্র অধ্যয়নেই ব্যস্ত থাকতো। তাদের চেতনা তথা বোধকে জাগাতে নজরুল দেশের জন্য যুদ্ধ করা, অন্যায়ের প্রতিবাদ করাকে জিহাদ হিসেবে দেখেন। কিন্তু ধর্মের অন্যতম এই মূলমন্ত্রকে বাদ দিয়ে যারা শুধুমাত্র নামাজ পড়াকে ইবাদত মনে করে তাদের উদ্দেশ্যে নজরুল ধর্মের অতীত ইতিহাস তুলে ধরে বলেন-

> ওগো তরুণ, আজ কি তুমি ধর্ম নিয়ে পড়ে থাকবে–তুমি কি বাঁচবার কথা ভাববে না? ওরে অধীন, ওরে ভণ্ড তোর আবার ধর্ম কি? যারা তোকে ধর্ম শিখিয়েছে, তারা শত্রু এলে বেদ নিয়ে পড়ে থাকত? তারা কি দুশমন এলে কোরআন পড়তে ব্যস্ত থাকত? তাদের রণকোলাহলে বেদমন্ত্র ডুবে যেত, দুশমনের খুনে তাদের মসজিদের ধাপ লাল হয়ে যেত। তারা আগে বাঁচত।[১৪৪]

---

[১৪২] গোলাম মুরশিদ, বিদ্রোহী রণক্লান্ত:, পৃ. ১৫৭।
[১৪৩] "মেহের-নেগার," 'রিক্তের বেদন,' নর ২য়, পৃ. ২৬৭।
[১৪৪]"আমার ধর্ম," নর ৭ম, পৃ. ১১।

স্বাধীনতার জন্য আইন না মানার অনুপ্রেরণা নজরুল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে পেয়ে ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ 'ধূমকেতু'র জন্য বাণী পাঠান। সেখানে অর্ধচেতন জাতিকে জাগিয়ে তুলার আহ্বান করে তিনি বলেন- "জাগিয়ে দে রে চমক মেরে/ আছে যারা অর্ধ চেতন"। নজরুল গুরুর সে আশির্বাদ ভুলে যাননি। তাছাড়া *বাসন্তী* পত্রিকাতেও জাতি ও দেশের বাধা বিঘ্ন জড়তা ধ্বংস করে দেশে নূতন প্রাণের উৎস আনয়ন করার জন্য প্রার্থনা করা হয়।[১৪৫] ঘুমন্ত জাতিকে জাগাতে নজরুল তাই যুবকদের বেছে নেন। কেননা তিনি বিশ্বাস করতেন যে যৌবনের শক্তিই সভ্যতার নির্মাতা। তারাই পারে পরাধীনতার হাত থেকে দেশকে মুক্ত করতে। তারাই পারে সকল ধরনের অপসংস্কৃতি দূর করে সাম্য ও ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে। তারাই দেশকে নতুনভাবে সাজাতে পারবে। কেননা বৃদ্ধরা হাজারো সংস্কারের বেড়াজালে আবদ্ধ। প্রগতির পথে তারা বিন্ধ্যাচল। নজরুল তরুণদেরকে বৃদ্ধত্বের শাসন না মানার আহ্বান করে বলেন-

> যুগে যুগে ধরা করেছে শাসন গর্বোদ্ধত যে যৌবন-
> মানেনি কখনো, আজো মানিবে না বৃদ্ধত্বের এই শাসন।
> আমরা সৃজিব নতুন জগৎ আমরা গাহিব নতুন গান,
> সম্ভ্রমে-নত এই ধরা নেবে অঞ্জলি পাতি মোদের দান।
> যুগে যুগে জরা বৃদ্ধত্বেরে দিয়াছি কবর মোরা তরুণ–
> ওরা দিক্ গালি, মোরা হাসি খালি বলিব 'ইন্না... রাজেউন !'[১৪৬]

'আমি গাই তারি গান' কবিতায় তারুণ্য ও যৌবনের কবি কাজী নজরুল ইসলাম দেশ গঠনে যুবকের উপর ভরসা করেন। এজন্য তরুণদেরকে ভালো মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা, অন্যায়ের প্রতিবাদক হিসেবে তৈরি করা এবং সর্বোপরি তাদেরকে নৈতিক জীবন যাপনে অভ্যস্ত করার উপর তিনি জোর দেন। যেমনটা করেছিলেন গ্রিক দার্শনিক সক্রেটিস। নজরুল সেই সকল যুবকের গান গেয়েছেন, কুর্নিশ করেছেন যারা দৃপ্ত-দম্ভে অসি ধরে, যুগে যুগে তৈরি করে পিরামিড, যাদের ভাঙার ইতিহাসে পুরাতন পুঁথি শুকনো পাতার মতো ঝরে গেছে, যারা বক-ধার্মিকদের সনাতন তাড়ি-খানাকে ভেঙে চলে। 'জীবন-বন্দনা' কবিতাতেও নজরুল সেসকল তরুণদের জয়গান করেছেন যারা শ্রমের বিনিময়ে মাটির পৃথিবীকে শস্য-শ্যামল করে তুলে, বনের বাঘ, মরুর সিংহ, সাপের ফণা তথা মৃত্যুভয় উপেক্ষা করে দেশের জন্য বেরিয়ে পড়ে, মাতৃভূমির উন্নতির আবেগে অবগাহন করে সংগ্রামে ঝেপে পড়ে তারাই জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান। 'জাগো সুন্দর চিরকিশোর' নামক নাটিকা ও গীতিবিচিত্রাতে কঙ্কণ, কল্পনা, কামাল, বেণু, ও চাকাম ফুসফুস এর সংলাপের মধ্যে এ বিষয়টি ফুটে উঠেছে।

---

[১৪৫] মুস্তফা নূরউল ইসলাম, *সমকালে নজরুল ইসলাম*, পৃ.৩৫।
[১৪৬] "যৌবন-জল-তরঙ্গ," 'সন্ধ্যা,' নর ৪র্থ, পৃ. ৬৯।

সিরাজগঞ্জ নাট্যভবনে মুসলিম তরুণ সম্মেলনে নজরুল যুবকদের বলেন, রাষ্ট্রের প্রয়োজনে তাদের উচিত হবে পুরাতন, জরা এবং বার্ধক্যের বিরুদ্ধে অভিযান করা। তাদের কাজ হবে কামাল-করিম-জগলুল-সানইয়াত-লেলিনের শক্তিতে শক্তিমান হওয়া, বৈমানিকরূপে আকাশের শেষসীমা খুঁজতে যাওয়া, গৌরীশৃঙ্গ কাঞ্চনজঙ্ঘার শীর্ষদেশ অধিকার করা, সমুদ্রের নীল মঞ্জুষার মণি আহরণ করা, মঙ্গলগ্রহে চন্দ্রালোকে যাওয়ার পথ আবিষ্কার করা, নব নব গ্রহ-নক্ষত্র সন্ধান করা প্রভৃতি। এছাড়াও তরুণরা হবে অন্যের প্রতি মমতাময়ী ও উদার। তারা শ্মশানঘাটে শব নিয়ে যাবে, দুর্ভিক্ষ-বন্যা-পীড়িতদের মুখে খাবার তুলে দিবে, বন্ধুহীন রোগীর শয্যাপাশে বসে রাতের পর রাত জেগে থাকবে, ভিখারি সেজে অসহায়দের জন্য ভিক্ষা করবে, এবং দুর্বলের পাশে দাঁড়িয়ে তার বুকে আশার আলো জাগাবে। যুবকদের কোনো দেশ-জাতি-ধর্মভেদ থাকবে না, তারা সকল কালের, সকল দেশের এবং সকল জাতির। ক্ষুদ্র জাতির মধ্যে তারা আবদ্ধ থাকবে না। পথ-পার্শ্বের যে অট্টালিকা পড় পড় অবস্থা তাকে ভেঙ্গে ফেলতে হবে কেননা তা অনেক মানুষের মৃত্যুর কারণ হবে।[১৪৭]

রাষ্ট্রের বৃহত্তর স্বার্থে নাগরিকদেরকে ব্যক্তিগত স্বার্থের লোভ ত্যাগ করতে হবে। দেশপ্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত নজরুল নিজের জীবনের সুখ, আনন্দকে তোয়াক্কা করেন নি। তিনি চাইলে বিত্ত-বৈভবের মালিক হতে পারতেন। কিন্তু জেল খেটেছেন তবুও ভারতের প্রাণের দাবি থেকে বিচ্যুত হন নি, বরং সর্বপ্রথম তিনি লিখিতভাবে ভারতের স্বাধীনতার দাবি উত্থাপন করেন। তিনি বলেন-

> "সর্বপ্রথম, 'ধূমকেতু' ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা চায়।
> স্বরাজ-টরাজ বুঝি না, কেননা, ও-কথাটার মানে এক এক মহারথী এক এক রকম করে থাকেন। ভারতবর্ষের এক পরমাণু অংশও বিদেশীর অধীন থাকবে না। ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ দায়িত্ব, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা-রক্ষা, শাসনভার, সমস্ত থাকবে ভারতীয়ের হাতে। তাতে কোনো বিদেশীর মোড়লি করবার অধিকারটুকু পর্যন্ত থাকবে না।"[১৪৮]

জননী ও জন্মভূমির মঙ্গলের জন্য যখন একদল বাঙালি তরুণ অগাধ-অসীম উৎসাহ নিয়ে দেশের আগুনে প্রাণ আহুতি দেওয়ার জন্য খাকি পোষাকে বের হচ্ছিল তখন বীর সেনানীদের মাতা-ভগ্নিদের মাল্য প্রদান দেখে নজরুল আপ্লুত হয়ে উঠেন। মায়ের দেওয়া মালাকে তিনি দেখছেন 'ভাবি-বিজয়ের আশিস-মাল্য' এবং বোনের 'স্নেহ-বিজড়িত অশ্রুর গৌরবোজ্জ্বল-কণ্ঠহার' রূপে। তরুণদের এই অভিযান দেখে নজরুল বুঝতে পারেন "অনেকদিন পরে দেশে একটা

---

[১৪৭] "বার্ধক্য ও যৌবন," 'অভিভাষণ,' নর ৮ম, পৃ. ৯-১০।
[১৪৮] "ধূমকেতু'র পথ," 'রুদ্র.মঙ্গল,' নর ২য়, পৃ. ৪২৮।

প্রতিধ্বনি উঠছে, 'জাগো হিন্দুস্থান, জাগো! হুঁশিয়ার।'[১৪৯] তাই তিনি তরুণদের বৃদ্ধ-জরা-মরাদের প্ররোচনায় কান না দিতে, দেশপ্রেমে উদ্দীপ্ত করতে গিয়ে বলেন-

> পারবে? বাংলার সাহসী যুবক! পারবে এমনি করে তোমাদের সবুজ, কাঁচা, তরুণ জীবনগুলো জ্বলন্ত আগুনে আহুতি দিতে, দেশের এতটুকু সুনামের জন্যে? তবে এস! 'এস নবীন, এস! এস কাঁচা, এস!' তোমরাই তো আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ আশা, ভরাসা, সব! বৃদ্ধদের মানা শুনো না। তাঁরা মঞ্চে দাঁড়িয়ে সুনাম কিনবার জন্যে ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা দিয়ে তোমাদের উদ্বুদ্ধ করেন, আবার কোনো মুগ্ধ যুবক নিজেকে ঐ রকম বলিদান দিতে আসলে আড়ালে গিয়ে হাসেন এবং পরোক্ষে অভিসম্পাৎ করেন! মনে করেন, 'এই মাথা-গরম' ছোকরাগুলো কি নির্বোধ।' ভেঙে ফেলো ভাই, এদের এ সঙ্কীর্ণ স্বার্থ-বন্ধন!"[১৫০]

রাষ্ট্রের প্রতি মানুষের যেমন দায়িত্ব-কর্তব্য রয়েছে, তেমনি জনগণের প্রতিও রাষ্ট্রের রয়েছে কিছু দায়বদ্ধতা। বলা যায়, রাষ্ট্রের উৎপত্তিই হয়েছে জনগণের অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য। নজরুলের সাহিত্য পর্যালোচনা করে রাষ্ট্রকে নাগরিকদের যে সকল বিষয়ের নিশ্চয়তা দেওয়ার ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তাদের মধ্যে ব্যক্তি-স্বাধীনতার অধিকার; ব্যক্তিগত ও পারিবারিক গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার; বিবেক ও ধর্মবিশ্বাসের স্বাধীনতা; নারী ও শ্রমিকের অধিকার; সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অধিকারে নারীর স্বীকৃতি; অর্থনৈতিক নিরাপত্তা লাভ করার অধিকার; অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার অধিকার, ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা; রাজনৈতিক স্বাধীনতা; জনগণের স্বাধীনতা রক্ষা করা; প্রতিনিধিত্বশীল ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা; আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা; সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ ও অধিকার রক্ষা করা; সকলের সমান অধিকার ও সাম্য নিশ্চিত করা; ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করা; গণতান্ত্রিক নীতি ও মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা; রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা; মানুষকে মানুষের গোলামী হতে মুক্ত করা; সামাজিক যুলুম-নির্যাতন বন্ধ করা; সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠা করা; অর্থনৈতিক শোষণ বন্ধ করা; ভারসাম্যপূর্ণ অর্থ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা; অর্থনৈতিক শোষনের পথ বন্ধ করা; সকলের জন্য বৈধভাবে জীবিকা অর্জনের পথ উন্মুক্ত করা এবং ব্যক্তি মালিকানা ও রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রনের মধ্যে সমন্বয় করা; দূর্যোগকালীন সময়ে নিরাপত্তা; ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটান প্রভৃতি অন্যতম।

রাষ্ট্রের নাগরিকদের মধ্যে সুকুমার বৃত্তির চর্চা তথা ললিত কলার পৃষ্ঠপোষকতা করা রাষ্ট্রের অন্যতম একটি দায়িত্ব। সাহিত্য সৃষ্টি তার মধ্যে অন্যতম একটি। নজরুল সমকালে তা ছিলো অনুপস্থিত। উল্টো সাহিত্য রচনার জন্য তিনি কারান্তরীণ হন। তাঁর কয়েকটি বই বাজেয়াপ্ত করা হয়, এবং কয়েকটি নিষিদ্ধ করা হয়। নাগরিকের ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার সংরক্ষণ করা রাষ্ট্রের

---

[১৪৯] "রিক্তের বেদন," নর ২য়, পৃ. ২৩৪।
[১৫০] "রিক্তের বেদন," নর ২য়, পৃ. ২৩৪।

অন্যতম একটি দায়িত্ব হলেও এক্ষেত্রে তা লংঘন করা হয়। অথচ সাহিত্য রচনার জন্য একটা মৌলিক শর্তই হলো লেখকের আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা থাকা।

শাসক-শাসিতের সম্পর্ক

নজরুলের সময়ে ভারতবর্ষ ব্রিটিশদের অধীনে ছিলো। তারা নানাচ্ছলে ভারতবর্ষকে জোরপূর্বক শাসন করে। ক্ষমতা নির্বিঘ্ন করতে ভেদনীতির আশ্রয় নেয়, মানুষের রাজনৈতিক অধিকারসহ অন্যান্য অধিকার হরণ করে। পরাধীন রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে শাসকদের সাথে তাদের সম্পর্ক বৈরি ছিলো। ফলে সংঘর্ষও ছিলো অনিবার্য। এরই ফলস্বরূপ গড়ে উঠে সিপাহি বিদ্রোহ, কৃষক বিদ্রোহ, স্বদেশী আন্দোলন। ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করতে শাসকরাও এ সকল আন্দোলনকে বোমা ও কামানের আঘাতে দমন করেছে। জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড তাদের পীড়নের অন্যতম একটি উদাহরণ। ঔপনিবেশিক শাসনামলে ভারতীয়রা যাতে করে বিপ্লবী না হয়ে উঠতে পারে সেজন্য ব্রিটিশরা বিভিন্ন ধরনের নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতো। তাদের মধ্যে একটি হলো বাকস্বাধীনতা হরণ। সেসময় চিত্তরঞ্জন, আলী শেরওয়ানিকসহ আরো যাদের মুখবন্ধের চেষ্টা করা হয়েছিলো নজরুল তাদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর মুখবন্ধ করতে অবশেষে ইংরেজরা তাঁকে জেলে পাঠায়। বাঙালি কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে তিনিই প্রথম রাজনৈতিক কারণে জেল খেটেছিলেন।[১৫১] ব্রিটিশদের এই ভীরুতা দেখে নজরুল বলেন যে, যারা মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত তারা বাহিরে গদাই-লশকরি চাল যতই দেখাক না কেন অন্তরে তারা খ্যাঁকশিয়ালের চেয়েও ভীরু। তিনি বলেন-"যাহার মনের জোর নাই–সত্যের জোর নাই, সে-ই এমন করিয়া গায়ের জোরে দুর্বলকে থামাইতে চেষ্টা পায়। ... যাহাদের মনে পাপ, তাহারা বাহিরে যতই গদাই-লশকরি চাল দেখাক, অন্তরে তাহারা খ্যাঁকশিয়ালের চেয়েও ভীরু।"[১৫২]

নজরুল তাই সরকারকে তথা শাসকশ্রেণিকে জনগণের দাবির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার জন্য আহ্বান করেন। জোর করে চুপ করাতে গেলে যে তা হিতে বিপরীত হয় সে কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি বলেন- "জোর করিয়া একজনকে চুপ করাইয়া দিলে তাহার ঐ না কওয়াটাই বেশি কথা কয়। কারণ, তখন তাহার একার মুখ বন্ধ হয় বটে, কিন্তু তাহার হইয়া–সত্যকে, ন্যায়কে রক্ষা করিবার জন্য–আরো লক্ষ লোকের জবান খুলিয়া যায়। বালির বাঁধ দিয়া কি দামোদরের স্রোত আটকানো যায় ?"[১৫৩] নজরুল 'মুখবন্ধ' প্রবন্ধের মাধ্যমে মূলত দেশের সরকারকে ন্যায়-শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য আহ্বান করেন। জনগণের চাওয়া-পাওয়াকে গুরুত্ব দিতে বলেন। নতুবা

---

[১৫১] গোলাম মুরশিদ, বিদ্রোহী রণক্লান্ত, পৃ. ১৭৮।

[১৫২] "মুখবন্ধ," 'যুগবাণী,' নর ১ম, পৃ. ৩৯৯।

[১৫৩] "মুখবন্ধ," 'যুগবাণী,' নর ১ম, পৃ. ৩৯৯।

গণজাগরণের হুমকি দেন। ন্যায় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার এই আকাঙ্খার মধ্যেই রয়েছে নজরুলের নৈতিক চিন্তার প্রকাশ। নজরুলের এই চিন্তার সাথে প্লেটোর কল্যাণ রাষ্ট্রের সাথে তুলনা করা যায়।

শুধু ভারতবর্ষে নয় সভ্যতার আদিপর্ব থেকেই প্রতিটি সমাজে সমাজ ও রাষ্ট্রসচেতন ব্যক্তিবর্গ শাসক ও শাসিতের মধ্যে ন্যায্যতার সম্পর্ক স্থাপনের প্রতি জোর দিয়ে আসছেন। প্রাচীন গ্রিসে শাসকদের দুর্নীতি ও ক্ষমতালিপ্সুতার বিরুদ্ধে সক্রেটিস প্রতিবাদ করেন। পরিণামে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। শিক্ষাগুরুর এই অস্বাভাবিক মৃত্যু শিষ্য প্লেটোর মনে চরম প্রতিক্রিয়া তৈরি করে। সক্রেটিসের মানবতাবাদী শিক্ষা প্রচার করার জন্য তাঁর সংলাপগুলোকে তিনি লিখিত রূপ দেন। পাশাপাশি একটি আদর্শ রাষ্ট্রের শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক কেমন হবে সে বিষয়ে সুস্পষ্ট মতামত ব্যক্ত করেন। প্লেটোর *রিপাবলিক* গ্রন্থে শাসকের বৈশিষ্ট্য বলতে গিয়ে তিনি বলেন 'শাসকদের দেশপ্রেমিক হতে হবে'[১৫৪]। রাষ্ট্রের শাসক বা রাজা হবেন সর্বোৎকৃষ্ট মানুষ। জীবনের দীর্ঘমেয়াদি শিক্ষা তাঁকে প্রজা-হিতৈষী, দেশপ্রেমিক, নীতিজ্ঞান-বোধ, শিক্ষানুরাগী, সত্যানুরাগী, নির্ভীক, পক্ষপাতহীন ও সুযোগ্য নাগরিক হিসেবে তৈরি করবে। যাকে এককথায় প্লেটো 'দার্শনিক রাজা' বলেছেন। নজরুল সরাসরি দার্শনিক রাজার কথা না বললেও শাসকের চরিত্র কেমন হবেন তা বলতে গিয়ে শাসকের নিরপেক্ষতা, দেশপ্রেম, নীতিজ্ঞান-বোধ, নির্ভিকতা, আত্ম-সম্মানবোধ, পরমতসহিষ্ণুতা প্রভৃতি গুণের কথা তিনি বলেছেন।

শাসকের বৈশিষ্ট্য কেমন হবে তার ইঙ্গিতে নজরুল ইসলামের নবি হযরত মুহাম্মদ (সা:) কে অনুসরণ করতে বলেন। রসুলকে উদ্দেশ্য করে নজরুলের 'বেহেশত' হতে পাঠাও পুনঃ সে সাম্যের বাণী' উক্তির মধ্যেই রয়েছে ইসলামের নবির সাম্যভিত্তিক শাসন ব্যবস্থার প্রতি নজরুলের আকাঙ্খার ইঙ্গিত। ইসলামের নবি যেভাবে মক্কা-মদীনায় শান্তি স্থাপন করেছেন, ক্ষমা, পরমতসহিষ্ণুতার দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন, অন্যের জান-মাল রক্ষা করেছেন, নিরাপত্তা দিয়েছেন অন্য শাসকদেরকেও নজরুল তা অনুসরণ করতে বলেন। ইসলামের নবি মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করে তার বাসিন্দাদের মধ্য সমতার ভিত্তিতে শাসনকার্য সম্পাদন করেছেন। তিনি কারো প্রতি পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণ করেছেন তার কোনো নজির ইতিহাসে নেই।

একজন শাসকের কি কি বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে তার সুস্পষ্ট বর্ণনা 'উমর ফারুক' কবিতায় নজরুল দিয়েছেন। শুধুমাত্র খলিফা উমর ফারুকের মহত্ব বর্ণনার জন্য 'উমর ফারুক' কবিতাটি রচনা করেছেন তা বলা যায় না, বরং নজরুল কবিতাটিতে খলিফা উমরের মাহাত্ম বর্ণনার পাশাপাশি শাসকদের করণীয় সম্পর্কেও বর্ণনা করেছেন। রাজার কর্তব্য হলো দল-মত-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের মৌলিক চাহিদাগুলোর সংস্থান করা এবং সকলের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। খলিফা উমর ছদ্দবেশে নাগরিকদের অবস্থা বোঝার জন্য রাত্রে বের হতেন। একজন ক্ষুধার্ত

[১৫৪] প্লেটো, *রিপাবলিক*, অনু. সরদার ফজলুল করিম, ৭ম সং (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০০), পৃ. ৩১৫।

মহিলার সন্তানের কান্না শুনে পীড়িত হয়ে নিজে কাঁধে করে খাবার পৌছালেন। রাষ্ট্রের একজন নাগরিকও অনাহারে রাত্রি যাপন করবে না এটি রাষ্ট্রপ্রধানকে নিশ্চিত করতে হবে। তাছাড়া ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাও রাষ্ট্রপ্রধানের অন্যতম একটি কর্তব্য। বিচারের ক্ষেত্রে আত্মীয়-অনাত্মীয় কোনো বিবেচ্য হবে না। খলিফা উমর যেমন নিজের সন্তানের বিচার করতে গিয়ে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন এবং নিজ হাতে কার্যকর করেছিলেন তেমনি সকল রাজাদের উচিত ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা। রাজার অন্যতম আর একটি কর্তব্য হলো দুষ্টের দমন এবং সৃষ্টের পালন। শাসনকার্য পরিচালনা করার সময় একদিকে তিনি যেমন হবেন কোমল প্রাণের অধিকারী আবার দুষ্টের দমনের ক্ষেত্রে হবেন ইস্পাতসম কঠিন।

রাষ্ট্রপ্রধানের অন্যতম একটি কর্তব্য হলো রাষ্ট্রের অপচয় রোধ করা। খলিফা ইচ্ছা করলে অসংখ্য দাসদাসী নিয়ে জেরুজালেমে গমন করতে পারতেন কিন্তু তিনি তা না করে মাত্র একজন ভৃত্য নিয়ে দুইটি শুকনো রুটি এক মশক পানি এবং দুই তিন মুঠো খেজুর নিয়ে রওয়ানা হয়েছিলেন। সাধারণ জীবন-যাপন করা, একটি মাত্র পোশাক হওয়ায় তা রোদে শুকাতে দিয়ে অপেক্ষা করা, খেজুর পাতা নির্মিত বাড়ীতে বসবাস করা ইত্যাদি ছিলো খলিফা উমরের স্বাভাবিক ঘটনা। নজরুল শাসকদের এখান থেকে শিক্ষা নিতে বলেন। মানুষের মনুষ্যত্ব ও মানবিকতা প্রতিষ্ঠাও শাসকদের অন্যতম একটি কর্তব্য। খলিফা ভৃত্যকে উঠের পিঠে উঠিয়ে যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন তা রাষ্ট্রপ্রধানদের থেকে শুরু করে সকল মানুষের জন্য অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত হতে পারে বলে নজরুল মনে করেন।

পরধর্মের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা শাসকদের আর একটি অন্যতম কর্তব্য ও ধর্মীয় নির্দেশ। খলিফাকে জেরুজালেমের গির্জায় নামাজ পড়তে বললে খলিফা তা করেন নি। যুক্তি দিয়ে তিনি বললেন, তিনি যদি গির্জায় নামাজ পড়েন তাহলে অন্ধ মুসলমানরা গির্জা-মন্দির দখল করে মসজিদ বানানোর একটি ইঙ্গিত মনে করতে পারে। এতে করে ধর্মীয় ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হতে পারে। শাসকদের উচিত নির্লোভ হওয়া। অন্যের সম্পদ পয়মাল করে তার উপর সম্পদের পাহাড় গড়া ধর্ম ও নৈতিকতা উভয়েরই পরিপন্থি। নজরুল বলেন-

> হজরত ওমর, হজরত আলি এঁরা অর্ধেক পৃথিবী শাসন করেছেন; কিন্তু নিজেরা কুঁড়ে-ঘরে থেকেছেন, ছেঁড়া কাপড় পরেছেন, সেলাই করে, কেতাব লিখে, সেই রোজগারে দিনপাত করেছেন। ক্ষিধেয় পেটে পাথর বেঁধে থেকেছেন; তবু রাজকোষের টাকায় বিলাসিতা করেননি। এমন ত্যাগীদের লোকে বিশ্বাস করবে না কেন ?[১৫৫]

শাসক হিসেবে হযরত উমরের যে চিত্র নজরুল অঙ্কন করেছেন তার সাথে প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্রের দার্শনিক রাজার গুণের সাদৃশ্য বিস্ময়করভাবে মিলে যায়। প্লেটোর মতে দার্শনিক রাজা অর্থ

[১৫৫] "অভিভাষণ," নর ৮ম, পৃ. ৩০।

শুধু ক্ষমতাপরায়ণ ভাববিলাসী শাসক নন, বরং তিনি কিতাবি মতবাদের সীমা অতিক্রম করে সত্যকে সত্য এবং মিথ্যাকে মিথা বলে মনে করবেন; সত্য প্রতিষ্ঠায় তিনি যেকোনো ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকবেন; দৈহিক ভোগবিলাসে থাকবে তার অনীহা; পরম আদর্শের সাথে বাস্তব জীবনের সমন্বয়সাধন করবেন; সকলের অধিকার নিশ্চিত করবেন। কিন্তু শাসক যদি প্রজ্ঞা ও সুবিচারের মনোবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত না হয়ে ক্ষমতার মোহে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, অর্থলিপ্সু হয়ে পড়ে তখন সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠে। মুসলিম দার্শনিক আল-ফারাবির রাষ্ট্রদর্শনে শাসকের যে চরিত্র অঙ্কিত হয়েছে তার সাথে প্লেটোর দার্শনিক রাজার মিল রয়েছে। তিনি মনে করেন ব্যাপক রাষ্ট্রীয় কল্যাণ এবং জনগণের শান্তি ও প্রগতির পথ সুগম করতে হলে রাষ্ট্রের শাসনভার অর্পন করতে হবে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ও নিষ্কলঙ্কচরিত্র দার্শনিকদের ওপর। কারণ ধর্মের মূলনীতি ও আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি আনুগত্যশীল দার্শনিক-শাসকের উপযুক্ত শাসনব্যবস্থাতেই সম্ভব রাষ্ট্রের যথার্থ কল্যাণ, জনগণের বৈষয়িক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অগ্রগতি।[১৫৬] নজরুল লক্ষ করেন কিছু শাসক বিধির বিধানকে পদদলিত করে অসাম্যের রাজত্ব কায়েমের মাধ্যমে গোটা পৃথিবীকে অস্থির করে রেখেছে। এরা মানুষ নামধারী লোভী ডাকাত। এরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রূপ ধারণ করে থাকে। কখনো রাজা, কখনো জমিদার, কখনো বা মহাজন সেজে এরা অন্যের অধিকার অন্যায়ভাবে লুণ্ঠন করছে।

> তোমারে ঠেলিয়া তোমার আসনে বসিয়াছে আজ লোভী,
> রসনা তাহার শ্যামল ধরায় করিছে সাহারা গোবী!
> মাটির ঢিবিতে দু'দিন বসিয়া
> রাজা সেজে করে পেষণ কষিয়া!
> সে পেষণে তারি আসন ধসিয়া রচিছে গোরস্থান!
> ভাই-এর মুখের গ্রাস কেড়ে খেয়ে বীরের আখ্যা পান!'[১৫৭]

'রাজা-প্রজা' কবিতাতে নজরুল শাসক ও শোসিত শ্রেণির মধ্যকার পার্থক্য তুলে ধরেছেন। যাদেরকে নিয়ে রাজ্য সেই নাগরিকদেরই কোনো অধিকার নেই, অথচ রাজা ভোগসাগরে নিমজ্জিত। নাগরিকের জন্য বিচারালয় থাকলেও স্বয়ং রাজার জন্য কোনো বিচারালয় নাই। নজরুল বলেন-

> যাদের লইয়া রাজ্য, রাজ্যে নাই তাহাদেরই দাবি,
> রাজা-দেবতার অনন্ত ভোগ, আমরা খেতেছি খাবি !
> এ নিয়ে নালিশ কার কাছে করি, জয় রাজাজি কি জয় !
> আমাদের হয় সুবিচার, নাই রাজারই বিচারালয় ![১৫৮]

---

[১৫৬] আমিনুল ইসলাম, *মুসলিম ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন*(ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৮), পৃ. ১৪৮।
[১৫৭] "ফরিয়াদ," 'সর্বহারা,' নর ২য়, পৃ. ১২৫।
[১৫৮] "রাজা-প্রজা," 'সাম্যবাদী,' নর ২য়, পৃ. ৯২।

নজরুল মনে করেন এমন এক সময় ছিলো যখন মানুষ তার ব্যক্তিত্ব নিয়ে সচেতন ছিলো না। ফলে তারা শাসকের তথা ব্যক্তিবিশেষের প্রভুত্ব মেনে চলত। তখন মানুষ রাজা, পুরাহিত, পাদ্রি, দলপতির নির্দেশ মেনে চলত বা চলতে বাধ্য হতো। কিন্তু সে যুগ পরিবর্তন হয়ে এখন পৃথিবীর সর্বত্রই গণশক্তিকে রাষ্ট্রের 'প্রাণ' হিসেবে মনে করা হয়। 'মানুষের জন্য রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের জন্য মানুষ নয়' এই ধারণা আজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শাসক ইচ্ছা করলেই কোনো কিছু করতে পারেন না। তাকে জনগণের নিকট জবাবদিহি করতে হয়, রাষ্ট্র পরিচালনায় তাদের পরামর্শ নিতে হয়। অর্থাৎ জনগণই এখন রাষ্ট্রের মালিক।[১৫৯]অবিচারের সংশোধন ও প্রতিরোধ এবং নাগরিকদের নিরাপত্তা বিধান সরকারের দায়িত্ব। নাগরিকদের প্রাণ ও সম্পত্তি অন্যের আক্রমন থেকে রক্ষা করতে পারে বলেই জনগণ সরকার ও রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে। কিন্তু রাষ্ট্র ও সরকার যদি জনগণের উপর স্বৈরাচারী আচরণ করে তখনই মানুষ স্বৈরাচারী সরকার উৎখাতের জন্য সংঘবদ্ধ বিদ্রোহ করার নৈতিক দায়িত্ব পায়। তাই নজরুল সাধারণ মানুষকে তুলনা করতেন সত্যসাধকদের সাথে; আর অত্যাচারীকে তুলনা করতেন নমরূদের বংশধরদের সাথে। সে যুগের নমরূদ, ফেরাউন, এজিদের ন্যায় এ যুগের নমরূদ, ফেরাউন ও এজিদের বংশধররা সত্যবাহীদের উপর নির্যাতন করছে। কিন্তু তাদের পরিণাম সেকালেও শুভ হয় নি একালেও শুভ হবে না। নজরুলের ভাষায়-

যখন জালিম ফেরাউন চাহে মুসা ও সত্যে মারিতে, ভাই
নীল দরিয়ার মোরা তরঙ্গ, বন্যা আনিয়া তারে ডুবাই;
আজো নমরুদ ইব্রাহিমেরে মারিতে চাহিছে সর্বদাই,
আনন্দ-দূত মোরা সে আগুনে ফোটাই পুষ্প-মঞ্জুরী ॥[১৬০]

প্রাচীন ভারতীয় চার্বাক দার্শনিক বৃহস্পতি মনে করতেন রাজাকে জনসমর্থিত হতে হবে।[১৬১] খ্রিস্টধর্ম মতে জনগণের আধ্যাত্মিক মঙ্গল প্রতিষ্ঠাই একজর শাসকের আদর্শ লক্ষ্য। কিন্তু কোনো শাসক যদি জনগণের অধিকার আদায় না করে, তাদের ন্যায্য অধিকার হরণ করে তাহলে জনগণ সে সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার অধিকার রাখে। নজরুলের বিদ্রোহ অন্যায়ের বিরুদ্ধে সে শাসক হোক, মোল্লা হোক, পুরোহিত হোক আর পাদ্রি হোক। নজরুল মনে করেন বিধির বিধান এই যে, পাপ করলে সে পাপের ফল ভোগ করতেই হবে। ফলে আজ রাজারা প্রজার ওপর যে নির্যাতন চালাচ্ছে তারও প্রতিফল তাকে ভোগ করতে হবে। একদিন প্রজাদেরই জয় হবে। তাই নজরুল একদিকে যেমন রাজাদেরকে প্রজাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সতর্ক করেন পাশাপাশি প্রজাদেরকে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের জন্য উদ্বুদ্ধ করেন।

কালের চরকা ঘোর,

[১৫৯] আবুল হুসেন, "আমাদের রাজনীতি", *শিখা সমগ্র (১৯২৭-১৯৩১)*, পৃ. ৫৯২-৩।
[১৬০] "তরুণের গান," 'সন্ধ্যা,' নর ৪র্থ, পৃ. ৬৫।
[১৬১] রমেন্দ্রনাথ ঘোষ, *ভারতীয় দর্শন*, ৫ম প্রকাশ (ঢাকা: নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ২০১৫), পৃ. ১৯।

দেড়শত কোটি মানুষের ঘাড়ে–চড়ে দেড়শত চোর।
এ আশা মোদের দুরাশাও নয়, সেদিন সুদূরও নয়–
সমবেত রাজ-কণ্ঠে যেদিন শুনিব প্রজার জয় ![১৬২]

ম্যাকিয়াভেলি (১৪৬৯-১৫২৭) মনে করেন যে দেশে দুর্নীতি ও দুষ্কর্ম ব্যাপক সে দেশকে সুষ্ঠভাবে পরিচালিত করতে হলে নিরঙ্কুশ স্বৈরতন্ত্র আবশ্যক। টিকে থাকতে শাসক শৃগালের মতো চতুর ও সিংহের মতো দুর্ধর্ষ হবে। প্রয়োজবোধে তাকে ধর্মবিশ্বাসের ভান করতে হবে, আবার নাস্তিকও সাজতে হবে। অবশ্য ম্যাকিয়াভেলির এই দর্শনের পেছনে তার সমকালীন ইতালির দুর্দশা ভূমিকা রেখেছিলো।[১৬৩] এক্ষেত্রে নজরুল ও ম্যাকিয়াভেলীর মতের মধ্যে অমিল লক্ষ করা যায়। কেননা নজরুল মনে করেন, শাসক যদি ন্যায়পরায়ন হয় তাহলে তার বিরুদ্ধে কেউ বিদ্রোহ করবে না, করলে বাধার সম্মুখিন হতে হবে। নজরুলের এই মতের সাথে হবসের মতের মিল রয়েছে। টমাস হবস (১৫৮৮-১৬৭৯) মনে করেন শাসককে সর্বতোভাবে মান্য করা নাগরিকদের কর্তব্য; কেননা শাসকের সার্বভৌম ক্ষমতার কল্যাণেই নাগরিকসাধারণ পারস্পরিক কলহবিবাদ ও যুদ্ধবিগ্রহ থেকে অব্যাহতি পেয়ে থাকে। সার্বভৌম শাসক যদি জনসাধারণের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ না করেন তাহলে জনগণের করার কিছু নাই। তবে এমন কিছু বিষয় আছে যা সার্বভৌম রাজা করতে পারেন না। যেমর নাগরিকের আত্মরক্ষার অধিকারকে অস্বীকার করতে পারেন না।[১৬৪] অবশ্য হবস রাজতন্ত্রের সমর্থক হলেও নজরুল গণতন্ত্রের সমর্থক ছিলেন।

উপসংহার

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সাহিত্যিক নজরুল একজন পুরোদস্তুর দার্শনিক। শিক্ষা, সাহিত্য, ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সামাজিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে নৈতিকতার আলোচনায় তিনি সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার মানুষের কর্তব্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। একটি রাষ্ট্রের শিক্ষাব্যবস্থা কেমন হবে, শিক্ষার্থীদের কোন্ ধরনের শিক্ষা দেওয়া হবে তার সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা তিনি দিয়েছেন তাঁর শিক্ষাভাবনায়। এক্ষেত্রে নজরুল শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা পাঠক্রম তৈরি করার ক্ষেত্রে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নৈতিকতা শিক্ষার উপর জোর দিতে বলেন। তাছাড়া সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে লেখক, কবি, সাহিত্যিকদের কোন্ ধরনের সাহিত্য রচনা করবেন, সাহিত্যের বিষয়বস্তু কী হবে প্রভৃতি বিষয় তিনি আলোচনা করেছেন। এদিক থেকে নজরুলের এই শিক্ষাভাবনা ও লেখকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কিত আলোচনাটি প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্রের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

---

[১৬২] "রাজা-প্রজা," 'সাম্যবাদী,' নর ২য়, পৃ. ৯৩।
[১৬৩] আমিনুল ইসলাম, আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শন, পৃ. ৩৫-৭।
[১৬৪] তদেব, পৃ. ৬৭।

সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক চিন্তায় নজরুলের মূল ভাবনা সাম্য। ধনী-গরিব, মালিক-শ্রমিক, নারী-পুরুষের সাম্য প্রভৃতি আলোচনায় নজরুল ভারতের আবহমান কালের অসাম্যের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেন। মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করতে সকল ধরনের অন্যায়, অবিচার, অত্যাচার, নিপীড়ন দূর করতে তিনি পরামর্শ দেন। রাজনৈতিক ভাবনায় রাষ্ট্র ও নাগরিকের সম্পর্ক, শাসক-শাসিতের সম্পর্ক এবং রাজনৈতিক দল ও ব্যক্তি মানুষের সম্পর্ক কেমন হবে তা নিয়েও ছিলো তাঁর সুস্পষ্ট দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি। এক্ষেত্রে নজরুলকে ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রা:) এর শাসন কাঠামোর প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করতে দেখা যায়। তাঁর মতে যেখানে শাসক হবেন প্রজা-হিতৈষী, উদার, সহিষ্ণু ও ন্যায়পরায়ণ। আর তাঁর মতে রাজনৈতিক দল ও ব্যক্তি মানুষের সকলের কর্তব্য হলো দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে সুদৃঢ় রাখা।

পঞ্চম অধ্যায়

আত্মার স্বরূপ প্রসঙ্গে কাজী নজরুল ইসলাম

ভূমিকা

ধর্ম ও নৈতিকতা যা ছাড়া অর্থহীন, সেই আত্মা, দর্শনের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। আত্মা সম্পর্কে আলোচনা মানব ইতিহাসের সূচনা থেকেই লক্ষ করা যায়। এমনকি বলা হয় যে আত্মার অমরতার ধারণা ঈশ্বরের বিশ্বাসের ধারণার চেয়েও প্রাচীন।[১] কারণ পৃথিবীতে এমন অনেক উপজাতি রয়েছে যাদের ঈশ্বর বিষয়ে কোনো ধারণা নেই, কিন্তু এমন কোনো উপজাতি নেই যেখানে পরলোক ও অমরত্বের ধারণা নেই। মানুষ যখন প্রথম মৃত্যুর অভিজ্ঞতা পায় তখনই তার মনে প্রশ্ন দেখা দেয় এর স্বরূপ নিয়ে। দেহাবসানের সাথে আত্মার অবস্থিতি কেমন হয় তা প্রত্যেক মানুষের চিন্তার অন্যতম একটি উপসর্গ হিসেবে দেখা দেয়। কেননা দেহের মৃত্যুর সাথে যদি আত্মার মৃত্যু ঘটে তাহলে এই পার্থিব ক্রিয়াকর্মের প্রতিফল মানুষ কিভাবে ভোগ করবে তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেয়। ধর্মের আবির্ভাব হলে ধর্মগ্রন্থে এই সকল বিষয়ে আলোকপাত করে। ধর্মের ব্যাখ্যায় অনেকে সন্তুষ্ট হলেও অনেকে এর সাথে ভিন্নমত পোষণ করেন। এর মধ্য দিয়েই আত্মার স্বরূপ বিষয়ক দার্শনিক আলোচনার শুরু হয়। আত্মার ধারণা সম্পর্কে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভাবধারায় দুটি বিপরীতধর্মী মতামত রয়েছে। সে সকল মনীষী ও চিন্তাবিদ আত্মার স্বরূপ নিয়ে আলোচনা করেছেন তাদের মধ্যে কাজী নজরুল ইসলামও রয়েছেন। তিনি মানবাত্মাকে দেখেছেন পরমাত্মার অংশ হিসেবে। তাঁর মতে দেহবিনাশের মাধ্যমে মানবাত্মা পরমাত্মার সাথে মিলিত হয়। এই আত্মা অক্ষয়, অব্যয় ও অবিনাশী।

ধর্ম ও দর্শনে আত্মার স্বরূপ ও প্রকৃতি

আত্মা বিষয়ক আলোচনা প্রথম লক্ষ করা যায় ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনে। *গীতার* শুরু হয়েছে আত্মাতত্ত্বের আলোচনার মধ্য দিয়ে। *গীতাতে* আত্মার অস্তিত্বে অবিশ্বাসীদের যুক্তিখণ্ডন করে পার্থিব দেহের নশ্বরতা আর আত্মার অবিনাশিতা বা অমরত্ব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।[২] এ মতে 'আত্মা' হলো চিৎকণা, যা মানুষ, পশু, উদ্ভিদ, জল, স্থল, অন্তরীক্ষ সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। হিন্দু ধর্মে আত্মা বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন শুধু *ঋগ্বেদে* আত্মা সাতটি স্বতন্ত্র অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সেখানে আত্মার সমার্থক শব্দ হিসেবে বায়ু, শ্বাস, স্বয়ং, দেহ, নিয়ন্তা, সত্তা প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়েছে।[৩] এ ধর্মে আত্মা নিত্য, মুক্ত ও বদ্ধ এই তিন শ্রেণিতে বিভক্ত। নিত্য আত্মা কোনো দিনই বন্দী হয় না; মুক্ত আত্মা এক সময় বন্দী হলেও বর্তমানে সে মুক্ত এবং বদ্ধ আত্মা হলো হিংসা-বিদ্বেষ, ভয়-ঘৃণা,

---

[১] আমিনুল ইসলাম, *জগৎ জীবন দর্শন*,১ম সং (ঢাকা: মওলা ব্রাদার্স, ২০১১) পৃ. ৩২৭-৮।

[২] এম. মতিউর রহমান, *ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃতি*(ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০১৬), পৃ. ১৬০।

[৩] H.G. Narahari, *Atman in Pre-upanisadic Literature* (Madras: Ganesh and Co. 1944), p. 43.

কামনা-বাসনা ও লোভ-লালসার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ফলে এ আত্মা জন্ম-মৃত্যুর অধীন।[৪]*ছান্দোগ্য উপনিষদে* অশরীরী দেহাতীত আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করে। সে আত্মার সুখ-দুঃখের বোধ নেই, শরীরেই দুঃখ, অশরীরীত্বেই শাশ্বত আনন্দ।[৫] বেদ, উপনিষদ, গীতা, ব্রহ্মসূত্র প্রভৃতি গ্রন্থের পাশাপাশি হিন্দু ষড়দর্শনেও আত্মার অস্তিত্বকে স্বীকার করেছে। এসব দর্শনে আত্মাকে 'ব্রহ্ম', 'জীব', 'পুরুষ', 'বুদ্ধি', 'প্রাণ' প্রভৃতি অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। আর সংস্কৃত অভিধান রচয়িতাগণ আত্মাকে এগারোটি স্বতন্ত্র অর্থে ব্যবহার করেছেন। বৈদিক সাহিত্যে আত্মার সমার্থক শব্দগুলোর মধ্যে *ঋগ্বেদে* ব্রহ্ম শব্দটি দুইশতবার ব্যবহৃত হয়েছে।[৬]

আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে ভারতীয় দর্শনকে *আত্মবাদী* এবং *অনাত্মবাদী* এই দুই শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা, এবং বেদান্ত দার্শনিকরা আত্মবাদী। অন্যদিকে চার্বাক, জৈন ও বৌদ্ধ দার্শনিকরা অনাত্মবাদী। আত্মবাদী দার্শনিকরা মনে করেন আত্মা দেহের অতীত, অজড় এবং অবিনশ্বর। আত্মা দেহকে আশ্রয় করে থাকলেও দেহের কাজ আত্মার নির্দেশ মতো কাজ করা। এ মতানুসারে আত্মা যেহেতু অবিনাশী, অমর, সেহেতু আত্মা কখনো মানুষের মনের চিন্তাধারা, সুখ-দুঃখের অনুভূতি, ইচ্ছা-দ্বেষ-সংঘাতের দ্বারা সংশ্লিষ্ট হতে পারে না। এ জন্য আমরণ ব্যক্তির মধ্যে 'আমি শিশু', 'আমি বালক', 'আমি যুবক', 'আমি তরুণ', 'আমি বৃদ্ধ' প্রভৃতি 'আমিত্ব বোধক' ক্রিয়া সর্বত্র বিদ্যমান থাকে। যোগ দর্শনে মনে করা হয় আত্মা নিত্য, অপরিনামী, নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় এবং স্বরূপত মুক্ত ও অসঙ্গত হলেও অবিদ্যার কারণে অনিত্যকে নিত্যজ্ঞান, অনাত্মাকে আত্মজ্ঞান, দুঃখজনক বস্তুকে সুখকর এবং অশুচিকে শুচিজ্ঞান করে থাকে।[৭] আর অনাত্মবাদী দার্শনিকরা আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না। তারা মনে করেন আত্মা জড়ের উপজাত হিসেবে অস্তিত্বশীল। জড়ের বিনাশের সাথে সাথে আত্মাও বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

কঠউপনিষদে আত্মাকে 'আমি'র সমার্থক মনে করা হয়। আর সে 'আমি' বা আত্মা দেহাতীত।[৮] আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনেও মন বা আত্মা কথাটি "আমি"-র প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। প্রাচীন পাশ্চাত্য দার্শনিক প্লেটোর মতে, মৃত্যু মানে মিশ্র পদার্থের অন্তর্গত উপকরণাদির বিচ্ছেদ। আত্মা অমিশ্র, সরল ও অবিচ্ছেদ্য হওয়ায় মৃত্যু আত্মাকে স্পর্শ করতে পারে না। সুতরাং

---

[৪] কে. এম. আব্দুল মতিন, "প্রসিদ্ধ ধর্মগ্রন্থসমূহে আখিরাত: একটি তাত্ত্বিক ও দার্শনিক পর্যালোচনা" (পিএইচডি অভিসন্দর্ভ,ইসলামিক স্টাডিস বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়), পৃ. ১৪২।

[৫] গোবিন্দ্রচন্দ্র দেব, *তত্ত্ববিদ্যা-সার*, ২য় মুদ্রণ(ঢাকা: অধুনা প্রকাশন, ২০০৮), পৃ. ১৬৫।

[৬] আজিজুন্নহার ইসলাম ও কাজী নূরুল ইসলাম, *তুলনামূলক ধর্ম নৈতিকতা ও মানবকল্যাণ*(ঢাকা: সংবেদ, ২০১৭। পৃ. ১৩০।

[৭] এম. মতিউর রহমান, *ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃতি*, পৃ. ১৬২।

[৮] গোবিন্দ্রচন্দ্র দেব, তত্ত্ববিদ্যা-সার, পৃ. ১৬০।

তার বিনাশ নাই।[৯] ইমানুয়েল কান্ট আত্মকে একটি অজড়ীয় আধ্যাত্মিক সত্তা হিসেবে দেখেছেন। পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মধ্যে ডেকার্ট, লুইস, সুইনবার্নে যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করেন আত্মা ও দেহ স্বতন্ত্র দুটি সত্তা। এভাবে তাঁরা দেহ-মন সম্পর্কিত *দ্বৈতবাদ*(dualism)প্রতিষ্ঠা করেন।[১০]

হিন্দু ধর্ম ও দর্শন এবং পাশ্চাত্য দর্শনের পাশাপাশি ইসলাম ধর্ম ও মুসলিম দার্শনিকদের চিন্তাতেও আত্মা বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। ভারতীয় দর্শনের 'আমি'রই আর এক নাম আত্মা, আরবিতে একেই বলে 'রূহ'।[১১] পবিত্র কোরআনে আত্মার সমার্থক শব্দ হিসেবে 'রুহ', 'নফস', 'কলব' প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।[১২] সূরা বনি ইসরাইলে আত্মাকে আল্লাহর আদেশ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে এও বলা হয়েছে যে, মানুষের পক্ষে এর স্বরূপ জানা সম্ভব নয়, কেননা মানুষের জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত।[১৩] কোরআনের অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ মানুষকে পচা কাদার শুকনো ঠনঠনে মাটি দিয়ে তৈরি করেন। এ অবস্থায় মানবদেহ ছিলো জড়ীয় সত্তা; যার কোনো চেতনা ছিলো না। অতঃপর আল্লাহ তার মধ্যে রূহ বা আত্মা প্রবেশ করিয়ে দেন।[১৪] ফলে সে মাটির দেহ আত্মাপ্রাপ্ত হয়ে চেতনসত্তায় রূপান্তরিত হয়। রূহ বা আত্মা যেহেতু আল্লাহর আদেশস্বরূপ সেহেতু বলা যায় আত্মা জড়ীয় স্বভাবের নয়, বরং আধ্যাত্মিক স্বভাবের। ইসলামে তিন ধরনের আত্মার কথা বলা হয়েছে: সেগুলো হলো নফস আল-আম্মারাহ, নফস আল-লাওয়ামাহ এবং নফস আল-মুতমাইন্নাহ। তন্মোধ্যে প্রথমটি অসৎ আত্মা নামে পরিচিত, দ্বিতীয়টি সদা পরিবর্তনশীল আত্মা; যা ভালো-মন্দ উভয় ধরনের কাজেই নিজেকে যুক্ত করে, এবং সর্বশেষটি পরিপূর্ণরূপে শুদ্ধ ও পরিতৃপ্ত আত্মা; যা সর্বদা নিজেকে মন্দ কাজ থেকে মুক্ত রাখে।[১৫]

মুসলিম দার্শনিক আল-কিন্দি আত্মাকে একটি আধ্যাত্মিক সত্তা হিসেবে দেখেছেন। তিনি মনে করেন আত্ম ও জড় স্বতন্ত্র দুটি সত্তা। মানবাত্মা একটি বিশুদ্ধ, অবিনাশী ও অশরীরী দ্রব্য। এর আদি নিবাস প্রত্যয় জগতে। মৃত্যুতে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আত্মা অনন্ত প্রত্যয়ের জগতে চলে যায়।[১৬] আত্মা দেহ থেকে বিযুক্ত হলে দেহে আর কিছু থাকে না। আত্মা ব্যতীত দেহ হয়ে যায় জড়। সুতরাং মৃতুদেহের কোনো মূল্য থাকে না। আত্মা দেহে যতোক্ষণ আছে ততোক্ষণ মানুষ তাকে দাম দেয়, শ্রদ্ধা করে। সুতরাং জড়ের কাজ হলো আত্মার নির্দেশ মান্য করা।

---

[৯] আমিনুল ইসলাম, *জগৎ জীবন দর্শন*, পৃ. ৩৩২।

[১০] Brian Davies, *An Introduction to the Philosophy of Religion* (Oxford:Oxford University Press,1993), p. 215.

[১১] গোবিন্দ্রচন্দ্র দেব, তত্ত্ববিদ্যা-সার, পৃ. ১৬০।

[12] Md. Akhtar Ali, "The Concept of the Soul in Judaism and Islam" *Philosophy and Progress*, Vols. XXXI-XXXII, Dev Center for Philosophical Studies, June-December 2012. p. 74.

[১৩] আল কোরআন, ১৭:৮৫।

[১৪] আল কোরআন, ১৫:২৯।

[15] Md. Akhtar Ali, "The Concept of the Soul in Judaism and Islam" , p. 75-6.

[১৬] আমিনুল ইসলাম, *মুসলিম ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন* (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৮৫), পৃ. ১২৬।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দর্শনে আত্মাকে 'আমি' এর সমার্থক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ যা আমি, তাই আত্মা। আবার অধিকাংশ ক্ষেত্রে আত্মা ও দেহকে স্বতন্ত্র দুটি সত্তা হিসেবে দেখানো হয়েছে। সেখানে দেহ জড় এবং আত্মা আধ্যাত্মিক সত্তা হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে।

আত্মার স্বরূপ প্রসঙ্গে নজরুল

নজরুল সাহিত্যে স্বতঃস্ফূর্ত ধর্মীয় প্রত্যয় ব্যবহার থেকে এটাই প্রতিয়মান হয় যে, ভারতের প্রচলিত ধর্মসমূহ সম্পর্কে নজরুলের অগাধ পাণ্ডিত্য ছিলো। ভারতীয় ধর্ম সম্পর্কে অধ্যয়ন করার সুবাদে ভারতীয় দার্শনিকদের মধ্যে শঙ্কর, রামানুজ; এবং উর্দু, ফারসি ও আরবি ভাষা জানার সুবাদে আল ফারাবি, ইবনে রুশদ, ইবনে সিনা, হাফিজ, ওমর খৈয়াম প্রভৃতি মুসলিম দার্শনিকদের দর্শন সম্পর্কে তিনি জ্ঞাত হন। তাছাড়া পাশ্চাত্য দার্শনিক প্লেটো, হেগেল, কার্ল মার্কস, রাসেল, বার্কলি প্রমুখ দার্শনিকের দর্শন সম্পর্কেও তিনি জ্ঞাত ছিলেন। তাঁর প্রমাণ পাওয়া যায় নজরুলের 'পরিকল্পিত পাঠ্যতালিকা'[১৭] থেকে। আত্মা সম্পর্কে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের দার্শনিকদের মত হলো আমার 'আমি'ই আমার আত্মা। অর্থাৎ আমি আর আত্মার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। শঙ্কর মনে করেন, 'আমি' বা আত্মার স্বরূপ নির্ণয়ই তত্ত্ব-জ্ঞান। তিনি আরো বলেন- আত্মার স্বরূপ নিয়ে দার্শনিকদের মধ্যে যতোই মতভেদ থাকুক না কেন, আত্মা বা 'আমি'র প্রতীতি কেউ অস্বীকার করতে পারেন না।

নজরুলের দর্শনের মূল কথাই হলো 'আমি'র আমিত্ব। নজরুল মনে করতেন আত্মা সকল প্রকার বন্ধনমুক্ত চিরস্বাধীন সত্তা; তার কোনো বিনাশ নাই, সে অক্ষয়, অব্যয়। আত্মার পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি বলেন- "আমি উত্থান, আমি পতন, আমি অচেতন-চিতে চেতন।" আবার তিনি বলেন- "আমি অজর, অমর, অক্ষয়, আমি অব্যয়!" তাঁর এই 'আমি' সকল বাঁধা বন্ধনমুক্ত চির স্বাধীন সত্তা। এই 'আমি' বিশ্বের সবকিছুর উর্ধ্বে। সবকিছু ছাপিয়ে উঠেছে এই 'আমি'। নজরুলের এই আমিত্বের প্রচার 'বিদ্রোহী', 'ধূমকেতু' কবিতাসহ অসংখ্য কবিতায় ফুটে উঠেছে। আত্মাকে এখানে নজরুল দুইভাগে ভাগ করেছেন। একটি হলো খণ্ড আত্মা বা একক আত্মা এবং অন্যটি হলো অখণ্ড আত্মা বা সামষ্টিক আত্মা। আত্মার স্বরূপ প্রসঙ্গে নজরুলের মত হলো ব্যক্তির স্বতন্ত্র যে সত্তা, সে সত্তার ক্ষমতাকে দুর্বল মনে হলেও অখণ্ড আত্মা চিরমুক্ত, অবিনাশী এবং অক্ষয়। ফলে এই অখণ্ড আমি'কে কোনো শক্তিই পরাজিত করতে পারে না। এখানে নজরুল আত্মাকে ব্যক্তি মানুষের সাথে তুলনা করেছেন। আত্মাই ব্যক্তি; আত্মা ছাড়া ব্যক্তির অস্তিত্ব কল্পনাতীত। তিনি মনে করেন এই আত্মা অসংখ্য; তবে আত্মা অসংখ্য হয়েও এক হয়ে যেতে পারে যদি তাদের উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন হয়। আত্মা চিরমুক্ত; তাকে বাহুবন্ধনে বাঁধার শক্তি কারো নেই। নজরুল বলেন-

[১৭] গোলাম মুরশিদ, *বিদ্রোহী রণক্লান্ত: নজরুল জীবনী* (ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন, ২০১৮), পৃ. ১২৮।

ঐ নির্যাতকের বন্দি-কারায়
সত্য কি কভু শক্তি হারায়
ক্ষীণ দুর্বল বলে খণ্ড 'আমি'র হয় যদি পরাজয়,
ওরে অখণ্ড আমি চির-মুক্ত সে, অবিনাশী অক্ষয় ![১৮]

নজরুল মনে করেন আত্মার ক্ষমতা অসীম। এজন্য ব্যক্তি যদি একবার তার আত্মাকে চিনতে পারে তার কোনো কিছু অসাধ্য থাকে না। কেননা আত্মাকে চেনা মানে হলো নিজেকে চেনা। নজরুল বলেন-"তুই আত্মাকে চিন, বল 'আমি আছি', 'সত্য আমার জয়!'[১৯]তিনি আরো বলেন- "আমার বিশ্বাস, যে নিজেকে চেনে, তার আর কাউকে চিনতে বাকি থাকে না।"[২০] সুতরাং যে নিজেকে চিনতে পারে সে তার পরম 'সুন্দর'কে চিনতে পারে। পরম সুন্দর দ্বারা নজরুল আল্লাহ্‌কে বুঝিয়েছেন। নজরুল আরো মনে করেন মানুষ নিজেকে বা নিজের আত্মাকে যখন সম্মান দিতে শিখবে সেদিনই কেবল অন্যরা তাকে সম্মান দিবে। নজরুল বলেন-

> আত্মাকে চিনলেই আত্মনির্ভরতা আসে। এই আত্মনির্ভরতা যেদিন সত্যি সত্যি আমাদের আসবে, সেই দিনই আমরা স্বাধীন হব, তার আগে কিছুতেই নয়। নিজে নিষ্ক্রিয় থেকে অন্য একজন মহাপুরুষকে প্রাণপণে ভক্তি করলেই যদি দেশ উদ্ধার হয়ে যেত, তা হলে এই তেত্রিশ কোটি দেবতার দেশ এতদিন পরাধীন থাকত না। আত্মকে চেনা নিজের সত্যকে নিজের ভগবান মনে করার দম্ভ—আর যাই হোক ভণ্ডামি নয়।[২১]

নজরুল পূর্ববর্তী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মধ্যেও এই চিন্তা লক্ষ করা যায়। লালন ফকির বলেছিলেন 'আপনারে চিনতে পারলে যাবে অচেনারে চেনা'। আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের জনক রেঁনে ডেকার্টও এই আত্মাকে চিনতে পেরেছিলেন। তাই তিনি বলতে পেরেছিলেন "আমি চিন্তা করি সুতরাং আমি অস্তিত্বশীল"। সুতরাং বলা যায়, আত্মার অস্তিত্বশীলতা অর্থ হলো মানুষের অস্তিত্বশীলতা। কেননা আত্মা যতোক্ষণ দেহকে আশ্রয় করে আছে ততোক্ষণ দেহ সচল; আত্মার অবসানেই দেহ নিশ্চল হয়ে পড়ে। আল্লামা ইকবাল মনে করতেন অহং বা আত্মসত্তাই ব্যক্তির গোটা সত্তার কেন্দ্রবিন্দুস্বরূপ। ব্যক্তিমানুষ ও সামাজিক মানুষের পুনর্জাগরণ ও যথার্থ বিকাশ কেবল অহং বা আত্মসত্তার বিকাশের মাধ্যমে সম্ভব।[২২] এই 'আপনাকে' চেনার প্রচেষ্টা নজরুলের মধ্যে দেখা যায়। আর তিনি সহসা নিজেকে চিনতে পেরেছিলেন বলেই তার সকল বাধন খুলে যায়। তিনি নিজেকে চিনতে পারায় বলতে পারেন "আমি যে ভগবানের প্রিয়, সত্যের হাতের বীণা; আমি যে কবি, আমার আত্মা যে সত্যদ্রষ্টা ঋষির আত্মা। আমি অজানা অসীম পূর্ণতা নিয়ে জন্মগ্রহণ

---

[১৮] কাজী নজরুল ইসলাম, "অভয়-মন্ত্র," 'বিষের বাঁশি,' অন্তর্গত *নজরুল-রচনাবলী*, জন্মশতবর্ষ সংস্করণ, ১ম খন্ড (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৬), পৃ. ১২০। অতঃপর খণ্ডসংখ্যাসহ নর লিখিত হবে।

[১৯] তদেব, পৃ. ১২১।

[২০] "আমার পথ," 'রুদ্র-মঙ্গল,' নর ২য়, পৃ. ৪২০।

[২১] তদেব, পৃ. ৪২১।

[২২] আমিনুল ইসলাম, *মুসলিম ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন*, পৃ. ৩২৪।

করেছি।"[২৩] তিনি বুঝতে পারেন স্বয়ং জগদীশ্বর তাঁর মধ্যে বিরাজমান। ফলে ঈশ্বরের শক্তিও তাঁর মধ্যে প্রবাহমান। আর এ জন্যই তিনি জগদ্বীশ্বরের সাথে নিজেকে বিলীন করে দিতে পারেন।

নজরুলের এই চিন্তা ধর্ম দ্বারাও সমর্থিত। ইসলাম ধর্মে মানুষকে অফুরন্ত শক্তি ও সম্ভাবনাময় আল্লাহর পার্থিব প্রতিনিধি হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।[২৪] কিন্তু মোহাচ্ছন্ন হয়ে মানুষ 'আমি ক্ষুদ্র', 'আমি দীন', 'আমি শক্তিহীন' বলে ভাবতে থাকে। কিন্তু পরক্ষণেই যখন সে তার পরমপ্রভুর সান্নিধ্য পায় তখন সে বুঝতে পারে সে আর দেহবিশিষ্ট ক্ষুদ্র জীব নয়। সে ঈশ্বরেরই স্বরূপ এবং তাঁরই অনুপ্রকাশ। ফলে তার সমস্ত দীনতা ঘুচে যায়।[২৫] এ জন্যই হয়তো নজরুল নিজের মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব করে বলে উঠেন-"আমি চিনেছি আমারে, আজিকে আমার খুলিয়া গিয়াছে সব বাঁধ!!" নজরুল মনে করেননিজেকে চিনতে পারলেই নিজের মধ্যকার অসীমতাকে চেনা যায়। ফলে জগতের সকল কিছু তার করতলে চলে আসে। তিনি বলেন- "জাগো অচেতন, জাগো! আত্মাকে চেনো! যে মিথ্যুক তোমার পথে এসে দাঁড়ায়, পিষে দিয়ে যাও তাকে, দেখবে তোমারই পতাকা-তলে বিশ্ব-শির লোটাচ্ছে। তোমারি আদর্শে জগৎ অধীনতার বাঁধন কেটে উদার আকাশতলে এক পঙ্‌ক্তিতে এসে দাঁড়িয়েছে।"[২৬] আত্মা তথা নিজেকে জানলে সবকিছুকে জানা যায় বলেই হয়তো সক্রেটিসের মূলমন্ত্র ছিলো 'নিজেকে জানো'।

'উন্নত মম শির' নজরুলের আত্মদর্শনের মূল বাণী। নিজ শির উঁচু করে দাঁড়ানো অর্থ পৃথিবীর সকল অন্যায়, অপশক্তির বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ ঘোষণা আমি তোমার অন্যায় আদেশ পালনে বাধ্য নই, আমি আমার আত্মার অপমান করব না, জান দিবো, তবু মান দিবো না। তাই অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে আত্মশক্তিতে বলিয়ান হওয়ার আহ্বান করে নজরুল বলেন- "এই কথা বলে বেরিয়ে এস–আমি আছি, আমাতে আমিত্ব আছে, আমি পশু নই, আমি মনুষ্য, আমি পুরুষসিংহ।"[২৭] তাই নজরুল গবেষক নজরুল ইসলাম দেখান যে, নজরুলের 'আমি' হচ্ছে হুইটম্যানের আমি; এই আমিতে একমাত্র নজরুলকে না বুঝে প্রত্যেক মানুষকে বুঝতে হবে। কারণ নজরুলের 'বিদ্রোহী' হলো ব্যক্তির উপনিষদ, আর ব্যক্তিত্ব হলো এই কবিতার বেদান্ত। বেদান্ত দর্শন অনুসারে নিত্যমুক্ত আসল 'আমি' বা সত্যিকার মনকে জানতে পারলে তবেই মুক্তি। তাই জগতের দার্শনিক চিন্তায় মনে করা হয় যে 'আত্ম-জ্ঞানে মুক্তি'। সমাজের যাবতীয় অন্যায়, শোষণ হতে মুক্তি পেতে হুসার্ল, জেমস এবং সার্ত্রের মতো নজরুলও মনে করেন মানুষের মধ্যে আত্মচেতনা, আত্মশক্তি আনয়নের

---

[২৩] "রাজবন্দীর জবানবন্দী," নর ১ম, পৃ. ৪৩৪।

[২৪] আল কোরআন, ২:৩০।

[২৫] আজিজুন্নহার ইসলাম ও কাজী নূরুল ইসলাম, তুলনামূলক ধর্ম নৈতিকতা ও মানবকল্যাণ, পৃ. ১৩১-২।

[২৬] "মোরা সবাই স্বাধীন মোরা সবাই রাজা," 'দুর্দিনের যাত্রী,' নর ২য়, পৃ. ৪০৭।

[২৭] "নিশান-বর্দার," 'প্রবন্ধ,' নর ৭ম, পৃ. ১৬।

চেষ্টা করতে হবে। একজন মানুষের পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিত্বের জন্য প্রথম প্রয়োজন আত্মচেতনা ও আত্মশক্তি।[২৮] নজরুল 'আত্মশক্তি' কবিতায় বলেন-

জানাও জানাও, ক্ষুদ্রেরও মাঝে রাজিছে রুদ্র তেজ রবির!
উদয়-তোড়ণে উড়ুক আত্ম-চেতন-কেতন 'আমি-আছি'র![২৯]

নজরুলের উপর্যুক্ত পংক্তির 'আত্ম-চেতন' ও 'আমি-আছি' ডেকার্টের "আমি সচেতন, সুতরাং আমি অস্তিত্বশীল" এর অনুরূপ অর্থ বহন করে। আত্ম-শক্তিতে অবিশ্বাসী মানুষকে নজরুল মহাপাপী বলে আখ্যায়িত করেন। কেননা আত্মজ্ঞান ও আত্মোপলব্ধি মানুষকে অন্যায় কাজ থেকে বিরত রেখে উন্নয়নের পথে, স্বাধীনতার পথে নিয়ে যায়। আত্মচেতনা প্রবল হলেই ব্যক্তির মধ্যে মনুষ্যত্বের স্বাধীন সত্তা জেগে উঠে এবং মনুষ্যত্বের সত্তা জাগলেই মানুষ অপরের আধিপত্য থেকে শৃঙ্খলমুক্ত হতে পারে। তখনই সে প্রকৃত স্বাধীনতার স্বাদ ভোগ করতে পারে।[৩০] তাই পুরুষ বলতে নজরুল 'আত্মশক্তি'কেই বুঝিয়েছেন।

আত্মার অমরতা

আস্তিক্যবাদী ধর্মে আত্মার অমরতায় বিশ্বাস ঈশ্বর বিশ্বাসের মতোই অপরিহার্য। কেননা আত্মা অমর না হলে ধর্মীয় ও নৈতিক জীবন অর্থহীন হয়ে পড়ে। তাই বিশ্বের প্রায় প্রতিটি ধর্ম আত্মার অমরতা ও পুনর্জন্ম বা পুনরুত্থানের কথা স্বীকার করেছে। ইসলাম ধর্ম মতে আল্লাহ নির্দিষ্ট একটি সময়ে আত্মাকে সৃষ্টি করেছেন। তবে আত্মা সৃষ্ট হলেও তা কখনোই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে না। এটি চিরস্থায়ী বা অমর। এ মতে দেহের মৃত্যুর ফলে আত্মা মৃত হয় না বরং এটি কেবল পার্থিব জীবন থেকে অপার্থিব জীবনে স্থানান্তরীত হয়। মৃত্যুর পর আত্মাকে তার কর্ম অনুযায়ী 'ইল্লিন' অথবা 'সিজ্জিন' নামক স্থানে রাখা হয়। অতঃপর শেষ বিচারের দিন তাদেরকে হয় জান্নাত, নয়তো জাহান্নামে প্রেরণ করা হয়।[৩১] পরকালে মানুষ যেনো জাহান্নামে না যায় তার জন্য তাদেরকে ইহলোকে সৎ কাজের প্রতি নির্দেশ দেওয়া হয় এবং বলা হয় সৎকর্মেই মুক্তি। সংকর্মের ফলেই আল্লাহর সাথে সান্নিধ্যের সুযোগ লাভ সম্ভব। আল্লাহর সাথে সান্নিধ্য লাভই মানুষের চরম লক্ষ্য হওয়া উচিত।

হিন্দু ধর্ম মতেও মানুষের চরম লক্ষ্য হচ্ছে মোক্ষলাভ করা। মোক্ষলাভ হচ্ছে জাগতিক দুঃখ-কষ্ট, আসক্তি, মোহ, লোভ ও পুনর্জন্ম থেকে মুক্তিলাভ করে ব্রহ্মের সাথে বিলীন হয়ে যাওয়া। এ

---

[২৮] নজরুল ইসলাম, "উইলিয়ম জেমস ও জাঁ পল সার্ত্রের মানবতাবাদের আলোকে কাজী নজরুল ইসলামের মানবতাবাদ"(পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, দর্শন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়), পৃ. ১৩৯।

[২৯]"আত্মশক্তি," 'বিষের বাঁশী,' নর ১ম, পৃ. ১২২।

[৩০] নজরুল ইসলাম, উইলিয়ম জেমস ও জাঁ পল সার্ত্রের মানবতাবাদের আলোকে কাজী নজরুল ইসলামের মানবতাবাদ, পৃ.১৮৩।

[31] Md. Akhtar Ali, "The Concept of the Soul in Judaism and Islam" , p. 77-8.

লক্ষ্যে উপনীত হতে হলে আত্মাকে অবশ্যই অমর হওয়া বাঞ্ছনীয়। উপনিষদ ও বেদ এ বলা হয়েছে পরমেশ্বর যেমন শাশ্বত, জীবাত্মাও তেমন শাশ্বত। কারো অস্তিত্ব বিনাশশীল নয়। দেহ যখন আত্মার বসবাসের অযোগ্য হয়ে যায় তখন আত্মা অন্য দেহে প্রবেশ করে।[৩২] *গীতায়* বলা হয়েছে "আত্মা কখনো জন্মে না বা মরে না। জাত বস্তুর ন্যায় আত্মা জন্মে অস্তিত্বলাভ করে না। অর্থাৎ আত্মা স্বরূপে নিত্য ও বর্তমান। আত্মা জন্মরহিত, শাশ্বত এবং পুরোনো। শরীরের বিনাশ ঘটলেও আত্মার বিনাশ নেই।"[৩৩] *গীতার* অন্যত্র উল্লেখ রয়েছে অর্জুন যখন কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে প্রাণভয়ে যুদ্ধত্যাগের সংকল্প করছিলেন তখন শ্রীকৃষ্ণ তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে আত্মা দেহাতীত, অজর, অমর।[৩৪] আত্মার অবিনাশিতা সম্পর্কিত হিন্দু ধর্মের মতের প্রতিফলন রয়েছে নজরুলের সাহিত্যে। তিনি বলেন- 'আত্মা অবিনশ্বর আত্মাকে কেউ হত্যা করতে পারে না।'[৩৫] মৃত্যুতে শুধুমাত্র আত্মার স্থানান্তর ঘটে। মানুষ বেঁচে থাকে তাঁর কর্মের মধ্যে। দেহ বিনাশের সাথে যে আত্মা বিনাশপ্রাপ্ত না হয়ে অমর থাকে তার উদাহরণ দিতে গিয়ে নজরুল বলেন-

দেহ শুধু তার গিয়াছে, যায়নি তার স্নেহ ভালোবাসা,
যখনি পড়িবে ভাষা তার, প্রাণে জাগিবে বিপুল আশা।"[৩৬]

আত্মার অমরতা ও অবিনশ্বরতার এই দিকটি যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করা সম্ভব নাকি ঈশ্বর বিশ্বাসের মতোই যুক্তিহীনভাবে বিশ্বাস করতে হবে, এমন প্রশ্নের সমাধান রয়েছে ব্রিটিশ দার্শনিক জন লকের দর্শনে। জন লক আত্মার অমরত্বের ব্যাপারে মনে করেন, আত্মার অমরতা বিষয়ে মানুষের অনুভূতিমূলক কিংবা প্রমাণমূলক জ্ঞান নাই, তবুও তা বিশ্বাসের উপর গ্রহণ করতে হবে। তাঁর মতে অভিন্নতা ও ব্যক্তিত্বের ধারণা থেকে অমরত্বের অনুমান করা যায় না। অমরত্ব মানুষকে দেওয়া ঈশ্বরের একটি উপহার স্বরূপ।[৩৭] রুশো মনে করেন চিন্তা ও কর্মের স্বাধীনতার কল্যাণেই মানুষ ইতরপ্রাণী থেকে স্বতন্ত্র। তা-ই মানুষকে আত্মার অমরত্ব সম্পর্কে সুনিশ্চিত প্রতীতি দিয়ে থাকে। এ পৃথিবীতে অসৎ লোকেরা প্রায়শই বিজয়ী ও সুখী এবং সৎ লোকেরা অনেক সময় নির্যাতিত ও অসুখী হয়ে থাকে। এ থেকে নিশ্চিত ধারণা করা যায় যে দেহবিনাশের পার আত্মা টিকে থাকবে। বন্ধু ভলতেয়ারকে লিখিত চিঠিতে কান্ট বলেন-

> এ জীবনে আমি এতো বেশি দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেছি যে, পরলোক প্রত্যাশা না করে পারি না। অধিবিদ্যার কোনো কূটযুক্তি অমরত্ব ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমার মনে এতটুকু সংশয় সৃষ্টি

---

[৩২] এম. মতিউর রহমান, *ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃতি*, পৃ. ১৭০-১

[৩৩] গীতাঃ ২:২০। দ্রষ্টব্যঃ আজিজুন্নহার ইসলাম ও কাজী নূরুল ইসলাম, তুলনামূলক ধর্ম নৈতিকতা ও মানবকল্যাণ, পৃ. ১৩৪।

[৩৪] গোবিন্দ্রচন্দ্র দেব, তত্ত্ববিদ্যা-সার, পৃ. ১৬৩-৪।

[৩৫] "পত্রাবলী," নর ৯ম, পৃ. ২৬৪।

[৩৬] "মৃত্যুহীন রবীন্দ্র," 'বিবিধ,' নর ১১তম, পৃ. ২৭১।

[৩৭] আমিনুল ইসলাম, *আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শন*,চতুর্থ সং (ঢাকাঃ মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৯), পৃ. ১৪১-২।

করতে পারবে না। এ আমি জানি, এ আমি বিশ্বাস করি, এ আমি প্রত্যাশা করি এবং জীবনের শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত আমি এ বিশ্বাসে অটল থাকব।[৩৮]

নজরুলও মনে করেন বিশ্বে কোনো কিছুই নশ্বর নয়; সবকিছু অবিনশ্বর। তা যে লোকেই হোক আর যে আকারেই হোক বিদ্যমান থাকে। সুতরাং সৃষ্টিকুলের সদস্য হিসেবে মানুষের আত্মার কোনো ক্ষয় নেই। বরং সে অমর, অক্ষয়। চট্টগ্রাম এডুকেশন সোসাইটির অনুষ্ঠানে মরহুম খানবাহাদুর আবদুল আজিজ সাহেবের কথা স্মরণ করতে গিয়ে তিনি বলেন-"আমি জানি, এ বিশ্বে কোনো কিছুই নশ্বর নয়, কোনো কিছুই হারায় না কোনোদিন। যে-রূপেই যে-লোকেই হোক তিনি আছেন এবং আমার এই ভাসিয়ে দেওয়া সালামি-ফুলও সেই না জানার অকূলে কূল পাবেই পাবে।"[৩৯] অন্যত্র ঈশ্বরের প্রতি তাঁর বাণী "তোমার মহাবিশ্বে কিছু হারায় না তো কভু"। নজরুল আরো বলেন-

ঝরে যে ফুল ধুলায়, জানি, হয় না তারা কভু হারা,
ঐ ঝরা ফুলে নেয় যে জনম তরুণ তরুর চারা।
তারা হয় না কভু হারা ॥
হারালে মোর (ও) প্রিয় যারা,
তোমার কাছে আছে তারা;
আমার কাছে নাই তাহারা,
হারায়নি কো তবু ॥[৪০]

গীতার এগারো থেকে ত্রিশ পর্যন্ত শ্লোকে আত্মীয় গুরুজনের নিধন আশংকায় মোহগ্রস্ত অর্জুনকে জীবাত্মার অমরতা ও অবিনাশিতার কথা বলা হয়েছে। অর্জুনকে উদ্দেশ্য করে শ্রীকৃষ্ণ বলেন- "যাদের জন্য শোক করার কোনো কারণ নেই, তুমি তাদের জন্য শোক করছো, অথচ কথাগুলো বলছো পণ্ডিতের ন্যায়। কিন্তু যারা প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানী তারা জীবিত বা প্রয়াত কারো জন্যই শোক করেন না।"[৪১] অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানীরা জানেন জড়দেহ আজ না হয় কাল তিরোহিত হবেই, কিন্তু আত্মা অবিনশ্বর; তার কোনো বিনাশ নাই। ভারতীয় *বৈশেষিক* দার্শনিকরাও এ প্রসঙ্গে মনে করেন আত্মা নিত্য, এর কোনো বিনাশ নাই। জীবের যখন দেহাবসান ঘটে আত্মা তখন অন্যদেহ ধারণ করে।[৪২]*বৈশেষিক* দার্শনিকদের ন্যায় *মীমাংসা*দার্শনিকদের চিন্তাতেও রয়েছে আত্মার অনিত্য ও অবিনাশীরূপের কথা। এ মতে দেহ, ইন্দ্রিয়, এবং বুদ্ধি বিনাশপ্রাপ্ত, কিন্তু আত্মা বিনাশরহিত। দেহাবসানের সাথে সাথে আত্মার বিনাশ না হওয়ায় স্বর্গপ্রাপ্তির আশায় মানুষ বৈদিক যাগযজ্ঞ পালন

[৩৮] উদ্ধৃতি: আমিনুল ইসলাম, *আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শন*, পৃ. ২১৬।
[৩৯] "মুসলিম সংস্কৃতির চর্চা," 'অভিভাষণ,' নর ৮ম, পৃ. ২০।
[৪০] "অগ্রন্থিত গান," নর ১০ম, পৃ. ৩৫৪।
[৪১] গীতা, ২:১১। দ্র. এম. মতিউর রহমান, ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃতি, পৃ. ১৭০।
[৪২] তদেব, ১৬৩-৪।

করে।[৪৩] আর আত্মার অমরত্বে বিশ্বাসী *জৈন* দার্শনিকরা মনে করেন আত্মা জন্ম ও মৃত্যুর উর্ধ্বে।[৪৪]*গীতা* ও ভারতীয় দার্শনিকদের মতের প্রতিফলন রয়েছে নজরুলের মধ্যে। তিনি বলেন-

> প্রাচ্যের ঋষিরা মৃত্যুকে কখনো জীবনের শেষ বলে মনে মানেননি, বড় করে দেখেননি। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আত্মীয়েরা পরমাত্মীয় হন, প্রিয়জন প্রিয়তর হন। জীবনে যে থাকে চোখের সামনে. মরণে সেই-ই পায় অন্তরের অন্নরতম লোকে অক্ষয় আসন, মৃত্যু জীবনের পরম পরিণতির একটা ধাপ মাত্র। মৃত্যুর সিঁড়ি বেয়ে আমরা অগ্রসর হই অমৃতলোকের পানে, ভগবানের সান্নিধ্যে। তবু মৃতজনের জন্য আমরা কাঁদি আমাদের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ বলে।[৪৫]

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক অর্জুনকে নির্দেশিত উপদেশের হুবহু মত রয়েছে নজরুলের দর্শনে। নজরুলের মতে, মৃত্যু মানুষের অনিবার্য পরিণতি হলেও তাকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। কেননা মৃত্যু আত্মা স্থানান্তরের একটি মাধ্যম মাত্র। মৃত্যু একটি পর্যায় থেকে অন্য একটি পর্যায়ে নিয়ে যায়; নশ্বর থেকে অবিনশ্বরের দিকে নিয়ে যায়। মৃত্যু মৃতের বর্তমান আত্মীয়-স্বজনদের থেকে কেড়ে নিয়ে পূর্ববর্তী আত্মীয়দের কাছে নিয়ে যায়। ইহলোক থেকে পরলোকে স্থানান্তর করে। তিনি মনে করেন যদি মানুষ জানতে পারতো যে মৃত্যুর পর মৃতের আত্মা তার পূর্ববর্তীতের সাথে সাক্ষাৎ করে তাহলে তার জন্য তারা দুঃখ করতো না বরং আনন্দ করতো। যেহেতু আত্মা অমর ও অবিনাশী সেহেতু তা যে লোকেই হোক অবস্থান করে। নজরুল মনে করেন মুত্যুর মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকে পাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়।

মৃত্যুর যিনি মৃত্যু, আমি শরণ নিয়াছি তাঁর।
নাই নাই মোর চিত্তে, ওরে মৃত্যুর ভয় আর ॥
..   ..   ..
মৃত্যুরে আজ মনে হয় যেন ঘুমাই মায়ের কোলে,
হাসিয়া জাগিব পুনরায় নব জীবনে, প্রভাত হলে।
মৃত্যুর ভয় গিয়াছে যখন
মৃত্যু অমনি মরেছে তখন
আজ   মৃত্যু আসিলে ধরিও জড়ায়ে, করি গলার হার ॥[৪৬]

নজরুলের মত হলো মানুষের আত্মা অমর, তাকে কখনো হত্যা করা যায় না। ভারতীয় দর্শনের বাইরে আত্মার অমরত্ব বিষয়ক নজরুলের এই চিন্তার প্রথম ইঙ্গিত লক্ষ করা যায় প্রাচীন পাশ্চাত্য দার্শনিক সত্রেটিসের চিন্তায়। প্লেটো তাঁর *Phaedo* গ্রন্থে আত্মার অমরতার স্বপক্ষে অবস্থান করতে প্রথমেই যে প্রশ্ন করেন সেটি হলো 'মানুষের মৃত্যুতে কি তার আত্মা অস্তিত্বশীল থাকে?' মৃত্যু পূর্বমুহূর্তের সক্রেটিসের "তোমরা দুঃখ করো না। মনে রেখো মৃত্যু কেবল আমার

---

[৪৩] তদেব।
[৪৪] তদেব, পৃ. ১৬০-১।
[৪৫] "পত্রাবলী," নর ৯ম, পৃ. ২৫৬।
[৪৬] "অগ্রন্থিত গান," নর ১০ম, পৃ. ৩৬১।

দেহটাকেই বিনাশ করবে, আত্মাকে নয়" উক্তির মধ্যেই রয়েছে আত্মার অমরতার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। পবিত্র আল কোরআনেও বলা হয়েছে- "যারা আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয় তোমরা তাদেরকে মৃত বলো না, তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা তা বুঝতে পারো না।"[৪৭] গীতাতেও বলা হয়েছে জরা, পীড়া বা অন্য কোনো কারণে দেহ ক্ষতবিক্ষত হয়ে অকেজো হয়ে গেলে আত্মার পক্ষে তখন সেই দেহে থাকা সম্ভব হয় না। একারণেই আত্মা দেহ ত্যাগ করে অন্য দেহে প্রবেশ করে। আত্মজ্ঞান লাভে ব্যর্থ মানুষই কেবল এই অবস্থাকে মৃত্যু বলে মনে করে।[৪৮] মৃত্যুকে জীবনের শেষ পর্যায় ধরেই ব্রিটিশরা মনে করেছিলো ভারতীয়দের মধ্যে যারাই বিরোধিতা করবে তাদেরকে অবদমন বা হত্যা করলে বিদ্রোহ দমন করা সম্ভব হবে। কিন্তু নজরুলের মতে জীবিত মানুষের চেয়ে মৃত মানুষ অধিক শক্তিশালী হতে পারে। নজরুল মনে করেন মানুষ মৃত্যুবরণ করলে তাঁর রূহ বা আত্মা উপরে অবস্থান করেন। মানুষ মরে গেলেও তার আত্মা অমর ও সচেতন থাকে। ফলে তার জন্য যদি কেউ প্রার্থনা করে তাহলে সে তা শুনতে পায়। নজরুল বলেন-"জমিরউদ্দীন যে দান বাংলায় রেখে গিয়েছেন, তার দাম বাংলার অনেকেই জানে না। আজ আমরা যে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা দেখাচ্ছি, এতে তাঁর রূহ উপর থেকে তৃপ্তি লাভ করছে।"[৪৯] প্রখ্যাত মুসলিম দার্শনিক গাযালিও মনে করেন মানুষ বাস্তবতার উভয় জগতেই বাস করে; সে ইহজগতের পাশাপাশি আত্মার জগতেও বাস করে, কারণ স্রষ্টা ঐশী রূপ মানুষের মাঝে প্রোথিত করে দিয়েছেন।[৫০]

নজরুলের পুরো সাহিত্য জুড়েই আছে সত্য সংগ্রাম, স্রষ্টার সন্তুষ্টি এবং পরকালে মুক্তি। তিনি হামদ ও নাতের মাধ্যমে বারবার পরকালে নবীর শাফায়াত, আল্লাহর দর্শন, পরকালে মুক্তি, আল্লাহর ক্ষমা প্রভৃতির জন্য খোদার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এমনকি মরণের পর মুয়াজ্জিনের আজান, মুসল্লিদের কোরআন তেলোয়াত প্রভৃতি শোনার মনোবাসনা থেকে "মসজিদেরই পাশে আমার কবর দিও ভাই" গানটি লিখেন। তিনি বিশ্বাস করতেন দেহের বিনাশ হলেও আত্মার কোনো বিনাশ নেই; আত্মা অমর।

মানবাত্মা, পরমাত্মার অংশ কি না ?

হিন্দু ধর্মে আত্মা অমর, অজড়, অবিনাশী হওয়ায় আত্মাকে যেমন কোনো আগ্নেয়াস্ত্র ধ্বংস করতে পারে না, তেমনি আত্মাকে পরমাত্মা থেকেও বিচ্ছিন্ন করতে পারে না। এ ধর্মে আরো মনে করা হয় জীবাত্মা পরমাত্মার অবিচ্ছেদ্য অংশ।[৫১]জীবাত্মা বলতে ব্যক্তি-আত্মাকে এবং পরমাত্মা বলতে

[৪৭] আল কোরআন, ২:১৫৪।

[৪৮]এম. মতিউর রহমান, ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃতি, পৃ. ১৭২।

[৪৯] "অভিভাষণ," নর ৮ম, পৃ. ৩২।

[৫০] ক্যারেন আর্মস্ট্রং, *স্রষ্টার ইতিবৃত্তঃ ইহুদি, ক্রিশ্চান ও ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের স্রষ্টা সন্ধানের ৪,০০০ বছরের ইতিহাস*, অনু. শওকত হোসেন (ঢাকা: রোদেলা প্রকাশনী, সন অজ্ঞাত), পৃ. ২৫২।

[৫১] এম. মতিউর রহমান, ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃতি, পৃ. ১৭৩।

ঈশ্বরকে বোঝায়। জীবাত্মা ও পরমাত্মা এমনভাবে একত্রযুক্ত যে কেউ কাউকে ছাড়া থাকতে পারে না। উভয় উভয়ের সখা; যারা এক দেহবৃক্ষকে আলিঙ্গন করে আছে। কিন্তু যখন ব্যক্তি নিজেকে ঈশ্বর থেকে আলাদা ভেবে 'আমি কর্তা' ভাব শুরু করে তখনই সে পরমপ্রভুর সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হয়।[৫২] *ছান্দোগ্য উপনিষদে* মানুষের আত্মাকে পরমাত্মার অংশবিশেষ এবং পরমাত্মার মতোই অক্ষয় ও অবিনশ্বর হিসেবে দেখানো হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে-"ওটি বাস্তবসত্তা। ওটি আত্মা। এবং সেটিই তুমি।"[৫৩] *মুণ্ডক্য উপনিষদে* জীবাত্মাকে পরমাত্মার সাথে এক করে দেখানো হয়েছে।[৫৪] মানবাত্মা পরমাত্মার সান্নিধ্যে থাকে। মানবাত্মা জাগতিক কর্মে লিপ্ত হলেও পরমাত্মা কর্মে লিপ্ত হয় না; অবলোকন করে মাত্র। জীবাত্মা শরীরের সাথে সম্পৃক্ত থাকলেও এটি শরীর ইন্দ্রীয় ও মন থেকে পৃথক। *মহাভারতে* আত্মাকে পরমাত্মার অংশ বা প্রকাশ হিসেবে দেখানো হয়েছে। পরমাত্মা আদিহীন, মধ্যহীন, অন্তহীন। তিনি অজ, নিত্য, তাবৎ দুঃখের অতীত। তিনি পরম ব্রহ্ম এবং পরম আশ্রয়। এই পরমাত্মাকে লাভ করার মাধ্যমেই জীবাত্মা যাবতীয় শোক-দুঃখ-ব্যাধি এবং মৃত্যুর করালগ্রাস থেকে মুক্ত হয়ে মোক্ষলাভের অধিকারী হয়। পরমাত্মাই জীবাত্মারূপে প্রতিটি জীবে অবস্থান করে।[৫৫] এ জন্যই হয়তো বলা হয় 'মানবাত্মা বিশ্বাত্মারই তপ্তশ্বাসবিশেষ'[৫৬]।

হিন্দু ধর্ম ও দর্শনে জীবাত্মাকে পরমাত্মার অংশ মনে করলেও ইসলাম ধর্ম আত্মাকে আল্লাহর একটি সৃষ্টি ভিন্ন আলাদা কোনো স্বতন্ত্রতা স্বীকার করে না। পবিত্র কোরআনে কোনো কিছুকেই আল্লাহর সমকক্ষ হিসেবে স্বীকার করা হয়নি। সেখানে বলা হয়েছে তাঁকে (আল্লাহ) কেউ জন্ম দেয়নি এবং তিনিও কাউকে জন্ম দেন নি।[৫৭] এই বিশ্বের সবকিছুই তাঁর সৃষ্টি। সুতরাং ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী জীবাত্মাকে স্রষ্টার অংশ হিসেবে ভাবার কোনো সুযোগ নেই।

হিন্দু ধর্ম ও ভারতীয় দর্শনে মানবাত্মাকে যে পরমাত্মার অংশ হিসেবে বলা হয়েছে তা নজরুলের সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে। কাজী নজরুল ইসলাম মানবাত্মাকে মহা-আত্মার তথা পরমাত্মার অংশ বলে মনে করেন। তিনি মনে করেন পরমাত্মা প্রতিটি মানুষের মধ্যে বিরাজ করেন বিধায় সকল মানুষ সমান। এখানে আশরাফ-আতরাফ, উঁচু-নিচু বলে কোনো ভেদ নাই। সবার আত্মাই ভাস্বর। ফলে মানুষ হয়ে মানুষকে ঘৃণা করার অধিকার নাই। আর মানবের অপমান মানেই হলো সে মহা-আত্মা তথা ঈশ্বরের অপমান। "উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন" প্রবন্ধে নজরুল সমাজে বিদ্যমান তথাকথিত ছোটলোক ও ভদ্র সম্প্রদায়ের কল্পিত পার্থক্যের অবসান ঘটানোর কথা বলেন।

---

[৫২] আজিজুন্নহার ইসলাম ও কাজী নূরুল ইসলাম, তুলনামূলক ধর্ম নৈতিকতা ও মানবকল্যাণ,পৃ. ১৩১।

[৫৩] ছান্দোগ্য উপনিষদ, ১:৪।

[৫৪] গোবিন্দ্রচন্দ্র দেব, তত্ত্ববিদ্যা-সার, পৃ. ১৬৫।

[৫৫] এম. মতিউর রহমান, ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃতি, পৃ. ১৬৮-৯।

[৫৬] আমিনুল ইসলাম, *পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস: থেলিস থেকে হিউম* (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৯), পৃ. ১৮১।

[৫৭] আল কোরআন, ১১২:৩-৪।

তিনি বলেন- "ইহাদিগকে উপেক্ষা করিবার, মানুষকে মানুষ হইয়া ঘৃণা করিবার, তোমার কি অধিকার আছে? ইহা তো আত্মার ধর্ম নয়। তাহার আত্মা তোমার আত্মার মতোই ভাস্বর, আর একই মহা-আত্মার অংশ। ...এই আত্মার অপমানে যে সেই অনাদি অনন্ত মহা-আত্মারই অপমান করা হয়।"[৫৮]

নজরুল মনে করেন জীবাত্মা পরমাত্মার অংশ হওয়ায় পরমাত্মার কাজও জীবাত্মার উপর বর্তায়। ঈশ্বর জগতে অশুভ শক্তিকে দমন করে শুভকে প্রতিষ্ঠিত করেন। মানুষকেও তিনি সে দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন। সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করা মানুষের অন্যতম একটি দায়িত্ব। নজরুল মনে করেন তিনি সেই কাজই আজীবন করে চলছেন। তিনি নিজেকে মনে করতেন সকল প্রকার অপশক্তিকে দমন করে, সকল অন্যায় অসাম্য দূর করে সাম্য ও শান্তিপূর্ণ ভারত বিনির্মাণের জন্য স্বয়ং ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত।[৫৯]তাই তাঁর এক হাতে রয়েছে বাঁকা বাঁশের বাঁশরি আর অন্য হাতে রয়েছে রণ-তুর্য। তিনি শান্তির বাঁশি বাজান কিন্তু যে অশান্তি বাঁধায় তাকে দমন করার জন্য তিনি তলোয়ার ব্যবহার করেন। উদ্দেশ্য সৃষ্টের পালন আর দুষ্টের দমন । স্বয়ং ঈশ্বরের কাজও তাই।

মুসলিম সুফি দর্শনে জীবাত্মাকে পরমাত্মার অংশ ভাবার প্রবণতা রয়েছে। যেমন মনসুর হল্লাজ হঠাৎ নিজেকে চিনতে পেরে বলেছিলেন 'আনাল হক' বা আমিই সত্য। অর্থাৎ আমার আর আমার প্রভুর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। নজরুলের রক্তে সুফিবাদী প্রভাব থাকায় তিনিও মনসুর হল্লাজের মতো নিজেকে কল্পনা করতে পারেন। আধ্যাত্মিকতার চরম পর্যায়ে তিনি বিশ্বাস করেন যে ঈশ্বর জগতের সর্বত্র বিরাজমান। সুতরাং তাঁর মধ্যেও বিরাজমান। যার প্রমাণ পাওয়া যায় নজরুলের গানের বই 'জুলফিকার' এ। সেখানে নজরুল এ প্রসঙ্গটি আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন-

তুই খোদকে যদি চিনতে পারিস
চিনবি খোদাকে।[৬০]

নজরুল মনে করেন ঈশ্বর 'পরম নিত্য'। কিন্তু পরম নিত্য হলেও অনিত্য রূপ ধারণ করে ভাঙা-গড়ার খেলায় মত্ত আছেন। মানুষও তাঁর সাথে এই খেলার অংশীদার। নজরুল ঈশ্বরের সাথে খেলা ও হাসি-কান্নার মাঝে নিজেকে 'পরম তুমি'র সাথে 'পরম আমি'র একাত্ব করে ফেলেন, আবার কোনো সময় তিনি তাঁকে প্রভু মেনে তাঁর পেছনে ছুটেন।

আমরা সকলে খেলি তারই সাথে, তারই সাথে হাসি কাঁদি
তারই ইঙ্গিতে 'পরম-আমি'রে শত বন্ধনে বাঁধি।

---

[৫৮] "উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন," 'যুগবাণী,' নর ১ম, পৃ. ৩৯৬।
[৫৯] "রাজবন্দীর জবানবন্দী," নর ১ম, পৃ. ৪৩১-৪।
[৬০] "জুলফিকার," নর ৪র্থ, পৃ. ৩০০।

মোরে 'আমি' ভেবে তারে স্বামী বলি দিবাযামী নামি উঠি,
কভু দেখি–আমি তুমি যে অভেদ, কভু প্রভু বলে ছুটি।[৬১]

কঠউপনিষদে বলা হয়েছে। "পরমাত্মা সকল বস্তুতে প্রচ্ছন্নভাবে রয়েছেন। তিনি সকলের অগোচরে আছেন। যাঁরা সূক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্ন, তাঁরাই কেবল তীক্ষ্ণ একাগ্র বুদ্ধির সাহায্যে পরমাত্মাকে উপলব্ধি করেন।"[৬২] 'আত্মাতে পরমাত্মার উপলব্ধি' উপনিষদের মূলতত্ত্ব বা সূত্র। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন ক্ষুদ্রাত্মা তার অন্তরতম চেতনায় মিলিত হয় বিশ্বমানব ও পরমাত্মার সাথে।[৬৩] তিনি মনে করতেন পরমাত্মার সাথে মানবাত্মা মিলতে চায়; মিলনেই তার আনন্দ। মানুষ যেনো পরমাত্মার খেলার পুতুল। তিনি যেভাবে চালান মানবাত্মা সেভাবে চলে।[৬৪] বিশ্বাত্মার সাথে মিলনই মানবাত্মার মূল লক্ষ্য। এ প্রসঙ্গে ইবনে সিনা পাখির রূপকের মাধ্যমে দেখিয়েছেন, মানবাত্মা খাঁচায় বন্দী এক অসুখী আত্মা। দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে বিশ্বাত্মার সাথে মিলনই তার মুখ্য উদ্দেশ্য।[৬৫] দার্শনিক আল কিন্দির মতে মানবাত্মা বিশ্বাত্মা থেকে সৃষ্ট। আর আত্মার বা রুহের নির্দেশ মেনে চলাই দেহের একমাত্র দায়িত্ব। আর আল্লামা ইকবাল মনে করেন আল্লাহ পরম ও পরিপূর্ণ অহংস্বরূপ। একমাত্র আল্লাহই পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্রের অধিকারী। এই ব্যক্তিত্ব অর্জনই সব সসীম অহমের লক্ষ্য।[৬৬] 'ঈশ্বর' ও 'মানুষ' কবিতায় নজরুল মানবাত্মা যে পরমাত্মার মধ্যে অবস্থান করে তা দেখিয়েছেন। আর 'সত্য-মন্ত্র' কবিতায় মানবের প্রাণ-বেদিতে তথা আত্মায় ঈশ্বরের অবস্থান বলে মনে করেন। তিনি বলেন-

বিশ্ব-পিতার সিংহ-আসন
প্রাণ-বেদীতেই অধিষ্ঠান,
আত্মার আসন তাই তো প্রাণ।[৬৭]

ঈশ্বরের পরিচয় দিতে গিয়ে অনেকেই ঈশ্বরকে দেখেছেন পরমাত্মা হিসেবে। তবে নজরুল মনে করেন ঈশ্বর তার কাছে পরমাত্মার চেয়েও আপনতর তথা পরমাত্মীয়। তাঁকে যে ভয় করে তার কাছে তিনি রুদ্র; আর যে তাঁকে ভালবাসে তার নিকট তিনি প্রেমময় ও মধুর লীলা-কিশোর। নজরুল বলেন-

---

[৬১] "অভেদম্," 'নতুন চাঁদ,'নর ৬ষ্ঠ, পৃ. ১৯।

[৬২] কঠ উপরিষদ: ১।৩।১২।

[৬৩] মোঃ মোজাহার আলী, "বাংলাদেশ দর্শনে ধর্ম, নৈতিকতা ও মানবতাবাদ: একটি দার্শনিক বিশ্লেষণ" (এমফিল থিসিস, দর্শন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়), পৃ. ১০০।

[৬৪] মোঃ আনিসুজ্জামান, "রবীন্দ্রনাথের সর্বেশ্বরবাদ", *দর্শন ও প্রগতি*, বর্ষ-৩৩, ১ম ও ২য় সংখ্যা ২০১৬,পৃ. ৭৩।

[৬৫] আমিনুল ইসলাম, *মুসলিম ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন*, পৃ. ১৫৯-৬০।

[৬৬] তদেব, পৃ. ৩২২।

[৬৭] "সত্য-মন্ত্র," 'বিষের বাঁশী,' নর ১ম, পৃ. ১৩৮।

পরমাত্মা নহ তুমি, তুমি পরমাত্মীয় মোর।
হে বিপুল বিরাট, মোর কাছে তুমি প্রিয়তম চিত-চোর ৷৷[৬৮]

জীবাত্মা, পরমাত্মার অংশ কি না এ প্রশ্নে নজরুলের অবস্থান হিন্দু ধর্মের অনুরূপ বলে মনে হতে পারে। তবে তাঁর জীবন ও দর্শনের পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে এ সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, তাঁর ভাবনায় হিন্দু ধর্ম প্রভাব ফেললেও শেষ আশ্রয় তিনি ইসলামেই নিয়েছেন। জীবাত্মার সাথে পরমাত্মার সম্পর্ক বিষয়ক আলোচনায় তাঁর মধ্যে সুফিবাদী দর্শনের প্রভাব লক্ষ করা যায়। নজরুল জীবনের প্রারম্ভিক সময়ে সুফিবাদী পরিবেশে বড় হওয়ার ফলে তাঁর মধ্যে সুফিবাদী দর্শনের প্রভাব পড়েছিলো। পরবর্তীতে ফারসি ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়নের ফলে সুফিবাদী চিন্তাধারা তাঁর মধ্যে আরো দৃঢ়ভাবে প্রভাব বিস্তার করে। সুফিবাদী দর্শনে স্রষ্টার সাথে বিলীন (বাকা) তথা একাকার হওয়ার কথা বলে। নজরুলও আবেগের আতিশয্যে স্রষ্টাকে আত্মার আত্মীয় হিসেবে মনে করেছেন, এবং সেই চিন্তা থেকেই তিনি জীবাত্মাকে পরমাত্মার অংশ হিসেবে মনে করেছেন। সুতরাং বলা যায়, সত্তাগত দিক থেকে নয় বরং সুফিবাদী প্রেমের দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি জীবাত্মাকে পরমাত্মার অংশ হিসেবে মনে করেছেন।

মৃত্যু পরবর্তী জীবন প্রসঙ্গে নজরুল

মানব ইতিহাসে আত্মার পুনর্জন্মের ধারণা অতি প্রাচীন। এমনকি বলা হয় যে মানুষের নির্দিষ্ট ধর্মমতের উদ্ভবের পূর্বে পুনর্জন্মের ধারণার উদ্ভব ঘটেছে। মৃত্যুর পর বিভিন্ন জাতি-উপজাতি তাদের নিজস্ব রীতি অনুযায়ী মৃতদেহকে সৎকার করতো এমনকি মৃতদেহে পুনরায় আত্মার প্রবেশ করতে পারে এই ধারণা থেকে মৃতের জন্য খাদ্য ও বাহন রেখে আসার রীতিও প্রচলিত ছিলো। এই ধারা সভ্যতার এই লগ্নে এসেও বিদ্যমান রয়েছে। যেমন সেন্ট্রাল অস্ট্রেলিয়ার নাঞ্জি উপজাতি আজো কোনো ধর্মমত গড়ে তুলতে পারেনি। ঈশ্বরের ধারণাও তাদের মধ্যে নেই কিন্তু তারা এক ধরনের পুনর্জন্মে বিশ্বাস করে।[৬৯]

তাই মৃত্যু পরবর্তী জীবন কেমন হবে এ নিয়ে দর্শনের ইতিহাসে প্রধানত দুই ধরনের মতামত লক্ষ করা যায়। যার একদল মনে করেন, আত্মা দেহ থেকে সম্পর্ণরূপে আলাদা সত্তা। মৃত্যুর পর দেহের আলাদা কোনো মূল্য থাকে না। আত্মা *দেহাতীত সত্তা* হিসেবে বিদ্যমান থাকে। আর এর বড় সমর্থক হলেন প্লেটো। তিনি তাঁর *Phaedo* গ্রন্থে দেখান যে সক্রেটিসকে হেমলক বিষ প্রয়োগে হত্যার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে মৃত্যুর পর তাঁর দেহকে কোন্ প্রক্রিয়ায় সমাহিত করা হবে। এতে সক্রেটিস পূর্বোক্ত মত দেন। কিন্তু অন্য দলটি মনে করেন যে মৃত্যুর

---

[৬৮] "অগ্রন্থিত গান,"নর ১০ম, পৃ. ৩৬০।
[৬৯] আমিনুল ইসলাম, *জগৎ জীবন দর্শন*, পৃ. ৩২৭-৮।

ফলে দেহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হলেও পরবর্তীতে মানুষ পুনরুত্থানের মাধ্যমে পূর্বদেহের ন্যায়ই *দেহাকারে* বেঁচে থাকে।[৭০]

হিন্দু ধর্মের মূল লক্ষ্য হলো মোক্ষলাভ। যে পর্যন্ত জীব মৃত্যুচক্র থেকে মুক্তি পেয়ে ব্রহ্মলাভের উপযুক্ত না হয় সে পর্যন্ত তাকে পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করতে হয়।[৭১] হিন্দু ধর্মের মোক্ষলাভের মূলে আছে একটি দার্শনিক মত জন্মান্তরবাদ ও কর্মবাদ। আত্মার অবিনাশিতা ও পুনর্জন্ম হিন্দু ধর্মের দুটি প্রধান মৌলিক তত্ত্ব। গীতায় বলা হয়েছে, যে জন্মে তার মরণ নিশ্চিত।[৭২] কর্মবাদ অনুসারে যেমন কর্ম তেমন ফল। এই জীবনের কৃতকর্মের ফল ভোগ করা সম্ভব না হলে স্থুল দেহ বিনাশের পর সূক্ষ্ম দেহ অভুক্তকর্ম বহন করে এবং কর্মফল ভোগ উপযোগী নতুনদেহ গ্রহণ করে। পুনর্জন্ম অর্থ হলো জীবের মৃত্যুর পর আত্মার পুনরায় অন্য সদ্যজাত দেহ পরিগ্রহণ।[৭৩] পুনর্জন্মের কর্মফল ভোগের জন্য জীবের জন্ম। গীতায় বলা হয়েছে-"হে কৌন্তেয়, ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সমস্ত লোক থেকেই মানুষ ফিরে পুনঃজন্ম গ্রহণ করে। কিন্তু আমাকে পেলে আর পুনঃজন্ম হয় না।"[৭৪] সুতরাং বলা যায় হিন্দুধর্ম অনুসারে আত্মার জন্মও নেই, মৃত্যুও নেই। আত্মা শাশ্বত, এর পরিবর্তন নেই। জাত বস্তুর ন্যায় আত্মা জন্মগ্রহণ করে অস্তিত্ব লাভ করে না। ইহা স্বরূপে নিত্য বিদ্যমান। শরীরের বিনাশ হলেও আত্মার বিনাশ নাই।

সেমেটিক ধর্মসমূহে বিশেষত ইসলাম ধর্মের সকল ক্রিয়াকর্মই পরিচালিত হয় পরকালীন জীবনকে কেন্দ্র করে। পরকালীন জীবনে মুক্তিলাভ তথা পরম প্রভুর সান্নিধ্য পাওয়াই মুসলমানদের চরম লক্ষ্য। এ জন্য স্রষ্টা মানুষের ইচ্ছাশক্তির স্বাধীনতা দিয়েছেন।[৭৫] মানুষের এই ইচ্ছাশক্তি দিয়ে ভালো-মন্দ দুই ধরনের কাজই করতে পারে। মৃত্যুর পর পরকালে হাশরের দিন তথা বিচার দিবসে সকলকে তাদের কর্ম অনুযায়ী কর্মফল প্রদান করা হবে। যারা প্রভুর নির্দেশিত ভালো কাজ করবে তারা মুক্তি পেয়ে জান্নাতে পরম প্রভুর সান্নিধ্য লাভ করবে। আর যারা ভুল পথে চলেছে তারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

মৃত্যু পরবর্তী এই জীবন নিয়ে নাস্তিকদের মধ্যে রয়েছে সন্দেহ। তারা আধিবিদ্যক বিষয়কে যুক্তি দ্বারা প্রমাণযোগ্য নয় বলে এর অস্তিত্বকে স্বীকার করেন না। ইমানুয়েল কান্ট যুক্তির আলোকে ঈশ্বর ও অমরত্ব প্রমাণ করতে না পেরে অবশেষে ব্যবহারিক বুদ্ধি ও নীতিবোধের মাধ্যমে বুঝতে পারেন যে যেহেতু ইহলোকে মানুষের কর্মফল যথার্থভাবে দেওয়া সম্ভব হয় না, সুতরাং পরলোক

---

[70] Brian Davies, An Introduction to the Philosophy of Religion, p. 212-214.

[71] Chad Meister, *Introducing Philosophy of Relegion*(London: Routledge, 2009), p. 25.

[৭২] স্বামী অভেনানন্দ, *পুনর্জন্মবাদ* (কলকাতা: শ্রীরাম কৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, ১৯৫৬), পৃ. ৩১।

[৭৩] Keith E. Yandell. *Philosophy of Religion: acontemporary introduction* (London: Routledge, 1999). 123.

[৭৪] গীতা, ৮:১৬।

[75] Md. Akhtar Ali, "The Concept of the Soul in Judaism and Islam" , p. 79.

হবে।[৭৬] নজরুলও বিজ্ঞানের যুক্তির দিকে যেতে চান না। কূটতর্কের পরিবর্তে কান্টের ন্যায় পরলোকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেন। নজরুলের একটি উক্তির মধ্যে রয়েছে তার প্রমাণ। ১৯২৮ সালে মোতাহার হোসেন চৌধুরীকে লেখা পত্রে নজরুল বলেন- 'তুমি হয়তো পরজন্ম মানো না, তুমি সত্যান্বেষী গণিতজ্ঞ। কিন্তু আমি মানি–আমি কবি।"[৭৭]

নজরুলের সারাটা জীবন দুঃখ-কষ্টের মধ্যে কেটেছে। দারিদ্র, বৈবাহিক জীবনের অশান্তি, মনের মানুষ কর্তৃক অবহেলা, সন্তানের মৃত্যু, স্ত্রীর অসুস্থতার পাশাপাশি নিজের অসুস্থতা, হিন্দু-মুসলিম ধর্মান্ধ কর্তৃক সমালোচনা প্রভৃতি নজরুলের জীবনকে দুঃসহ করে ফেলে। তিনি শান্তি খুঁজেছেন, কিন্তু কোথাও শান্তি পাননি। ইহলোকের এই দুঃসহ জীবন যেন পরকালেও না থাকে তার জন্য খোদার কাছে তিনি প্রার্থনা করেন। তিনি খোদার নিকট সুখের মিলন ও আলিঙ্গন চান।

সারাজীবন কাটলো আমার বিরহে, বঁধু,
পিপাসিত কণ্ঠে এসে দিও মিলন-মধু।
তুমি যেথায় থাকো প্রিয়, সেথায় যেন যাই (খোদা),
সখা বলে ডেকো আমায়, দীদার যেন পাই (খোদা);
সারা জনম দুঃখ পেলাম, (যেন) এবার সুখে মাতি ॥[৭৮]

"পরজনমে দেখা হবে প্রিয়/ ভুলিও মোরে ভুলিও", "রোজ হাশরে আল্লাহ্ আমায় করো না বিচার।/বিচার চাহি না, তোমার দয়া চাহে এ গুনাহগার", "আখেরে পার হবি যদি পুল-সেরাতের পোল" প্রভৃতি গানের মধ্যে ইসলাম ধর্মীয় পরজনমের বা পুনরুত্থান দিবসের প্রতি আস্থার দিকটি রয়েছে। অন্যদিকে "হাঁ, যদি পারো আশীর্বাদ করো, যেন এবার জন্ম নিলে তুমি যাকে ভালবাসো, সে-ই হয়ে জন্মগ্রহণ করি!'[৭৯], "সে মরণ-বরণ করে তার কালো রূপস্রষ্টার কাছে চলে গেল ! এবার বুঝি সে অনন্ত রূপের ডালি নিয়ে আর এক পথে আমার অপেক্ষায় বসে থাকবে![৮০] প্রভৃতি উক্তির মধ্যে হিন্দু ধর্মীয় পুনর্জন্মের প্রতি বিশ্বাসের ইঙ্গিত রয়েছে। ফলে বলা যায় নজরুল হিন্দু-মুসলিম উভয়ই ধর্মীয় সংস্কৃতির ধারক বাহক হওয়ায় তাঁর মধ্যে পুনর্জন্ম ও পুনরুত্থানের যৌথ চিন্তাই প্রভাব বিস্তার করেছিলো। পুনর্জন্ম ও পুনরুত্থানের সূক্ষ্ম পার্থক্যকে হয়তো তিনি আলাদা করে দেখেননি। মৃত্যু পরবর্তী জীবনের মুক্তি বা মোক্ষলাভকে তিনি বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। পুনরুত্থান বা পুনর্জন্ম তাঁর মুখ্য ব্যাপার ছিলো না। স্রষ্টার সান্নিধ্যই তিনি কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করতেন।

[৭৬] আমিনুল ইসলাম, *জগৎ জীবন দর্শন*, পৃ. ৩৩৩।
[৭৭] "পত্রাবলী," নর ৯ম, পৃ. ২২৩।
[৭৮] "অগ্রন্থিত গান," নর ১১তম, পৃ. ৬।
[৭৯] "রাজবন্দীর চিঠি," 'ব্যথার দান,' নর ১ম, পৃ. ২৬০।
[৮০] "বাদল বরিষণে," 'ব্যথার দান,' নর ১ম, পৃ. ২২২।

উপসংহার

কাজী নজরুল ইসলাম প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিকদের আত্মা সম্পর্কিত চিন্তার এক আশ্চর্যজনক প্রতিফলন ঘটিয়েছেন তাঁর সাহিত্যে। প্রাচীন ভারতীয় আস্তিক সম্প্রদায়ের দার্শনিক চিন্তা, মুসলিম দার্শনিকদের চিন্তা, এবং পাশ্চাত্য আস্তিক্যবাদী সক্রেটিস থেকে শুরু করে এ যুগের কান্ট, রুশো প্রমুখ দার্শনিকদের চিন্তার প্রতিফলন তাঁর সাহিত্যে ফুটে উঠেছে। আর এটা সম্ভব হয়েছে কারণ, তিনি তাঁর মধ্যকার অসিমতাকে আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন। তিনি নিজের আত্মাকে চিনতে পেরেছিলেন। আর একবার যদি মানুষ তার মধ্যকার অসীমতাকে আবিষ্কার করতে পারে তাহলে সে সকল অসাধ্যকে সাধন করতে সক্ষম হয়।

আত্মার স্বরূপ আলোচনায় নজরুলের চিন্তার মধ্যে জড়বাদী দার্শনিকদের মতবাদের বিরোধিতা লক্ষণীয়। জড়বাদী দার্শনিকরা আত্মাকে জড়ের উপজাত হিসেবে মনে করেন। তারা দেখান যে আত্মা জড়ধর্মী হওয়ায় দেহের মৃত্যুর সাথে সাথে আত্মারও মৃত্যু ঘটে। ফলে পরকালীন জীবন বলতে কিছু নেই। জড়বাদী দার্শনিকদের এই সকল মতের প্রত্যুত্তরে ভাববাদী দার্শনিকগণ দেহ নিরপেক্ষ আত্মার স্বাধীন অস্তিত্ব স্বীকার করেন। ভাববাদী দার্শনিকের মতো নজরুলও মনে করেন, আত্মা অক্ষয়, অমর, অব্যয়, অজড় ও অবিনাশী। দেহ বিনাশের সাথে আত্মার বিনাশ হয় না, বরং মৃত্যুর পর মানবাত্মা তার জগতে পরমাত্মার সাথে মিলিত হয়। মোক্ষলাভই আত্মার একমাত্র লক্ষ্য।

ষষ্ঠ অধ্যায়

উপসংহার

বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে ভারতবর্ষ ছিলো হিন্দু-মুসলমান দ্বন্দ্বের এক কুরুক্ষেত্র। ধর্ম সম্প্রদায়গুলোর মধ্যকার অন্তর্দ্বন্দ্ব, কুসংস্কার, নৈতিক অবক্ষয় এবং পরাধীনতা তাদেরকে কুরে কুরে খাচ্ছিলো। এইরূপ বহুবিধ কারণে ক্লান্ত সাধারণ মানুষ কোনো আশার আলো দেখছিলো না। এমতাবস্থায় কাজী নজরুল ইসলাম ১৯২২ সালে সকল অন্যায়, অসাম্য ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে 'বিদ্রোহী'র বাণী নিয়ে বাংলা সাহিত্যে আগমন করেন। মানুষকে দেখান বীরত্বের ও মুক্তির পথ ।

নজরুল ধর্মকে মানব আচরণ নিয়ন্ত্রণের একটি মাধ্যম হিসেবে দেখেন। তিনি মনে করেন প্রতিটি ধর্মই মানুষকে সহনশীলতা, উদারতা, সহিষ্ণুতা, সততা, সত্যবাদিতা, অসাম্প্রদায়িকতা, ভেদহীনতা, আত্মার পরিশুদ্ধতা প্রভৃতির শিক্ষা দেয়। প্রতিটি ধর্মই অপরকে অন্যায়ভাবে আঘাত করতে, মানুষের অবমাননা করতে নিষেধ করে; জাতি-ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণি-পেশা নির্বিশেষে সকলের অধিকারের প্রতি যত্নশীল হতে বলে। তাই নজরুল তৎকালীন জাতিসমূহের মধ্যকার ভেদজ্ঞান দূর করে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন প্রতিষ্ঠিত করতে এবং হিন্দু-মুসলমানের মধ্যকার মানসিক দুরত্ব কমাতে মনোযোগ দেন। আর এ জন্য তিনি তাঁর সাহিত্যে হিন্দু-মুসলিম উভয়ের ধর্মীয় প্রত্যয় ব্যবহারের পাশাপাশি মুসলমানদের আল্লাহ ও হিন্দুদের হরিকে পাশাপাশি বসান। উভয়কে তিনি একই সত্তা হিসেবে দেখান। কিন্তু নজরুলের এই ভ্রাতৃত্বের আহ্বানে বাধ সাধে অল্পশিক্ষিত মোল্লা ও পুরোহিতরা। তারা নজরুলকে কাফের ও যবন উপাধি দিয়ে সমালোচনা করতে থাকে। কিন্তু নজরুল সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে বরং ধর্মানুসারীদের ধর্মাচারের নামে স্বার্থপূজার ও ধর্মাভিনয়ের সমালোচনা করেন।

নজরুল বেদনার সাথে লক্ষ করেন ধর্মানুসারীদের বৃহৎ একটা অংশ স্রষ্টাকে অন্তরে ধারণ না করে কেবল স্বার্থপূজা করে। তিনি দেখান একদিকে হিন্দুরা যেমন লক্ষ্মীর হাতে লক্ষ্মীভাণ্ড থাকায় লক্ষ্মীপূজা করে, অন্যদিকে তেমনি মুসলমানেরা অন্তরের পশুকে কোরবানি না দিয়ে সাতজনে একটি পশু কোরবানি করে মুক্তি পেতে চায়। অথচ তারা বুঝতে চায় না যে, অন্তরের পরিশুদ্ধতা না এনে শুধু মসজিদ-মন্দিরে বসে প্রার্থনার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই। নজরুলের বিবেচনায় অন্তরের পরিশুদ্ধতা না থাকায় মুসলমানদের মোহর্‌রমের হায় হোসেন! আর হিন্দুদের দেয়ালি উৎসব হাস্যকর আনুষ্ঠানিকতায় বন্দী। কেননা সত্যিকার অর্থে রক্ত দেওয়ার জন্য আহ্বান করা হলে তারা সবাই সটকে পড়ে।

তাই নজরুল ধর্মান্ধদেরকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিধি-নিষেধের পরিবর্তে ধর্মের প্রকৃত বিধান অনুসরণ করার জন্য আহ্বান করেন এবং ধর্মে ধর্মে ভেদ, ছুঁৎমার্গ, আশরাফ-আতরাফ ভেদ প্রভৃতিকে সমাজ থেকে দূর করতে পরামর্শ দেন। মুখস্ত মন্ত্ররোলে যে স্রষ্টাকে পাওয়া যায় না তা

তিনি দেখিয়ে দেন। কিন্তু ধর্মান্ধরা নজরুলের এই দর্শনকে ভুল বুঝে তারা তাঁকে ধর্মবিরোধী হিসেবে আখ্যা দেয়। প্রকৃতপক্ষে ধর্মের বিরোধিতা নয় বরং ধর্মকে কুসংস্কার ও ধর্মব্যবসায়ীদের হাত থেকে রক্ষা করাই ছিলো নজরুলের মূল উদ্দেশ্য। ধর্মের বিলুপ্তি নয় বরং ধর্মের প্রতিষ্ঠাই ছিলো তাঁর মনোবাসনা।

ধর্মের আলোচনায় নজরুলের ঈশ্বরবন্দনা উল্লেখযোগ্য। ঈশ্বরের অস্তিত্বকে তিনি স্বীকার করেছেন চারপাশের অপরূপতা দেখে। এই সুন্দর পৃথিবীর অন্তরালে যে সুন্দর স্রষ্টার মহাপরিকল্পনা রয়েছে এবং এ বিশ্ব যে একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য পূরণের দিকে অগ্রসর হচ্ছে তা তিনি বুঝতে পারেন। এক্ষেত্রে নজরুলের যুক্তির মধ্যে সেন্ট আনসেলম, রেঁনে ডেকার্ট, লাইবনিজ, পেলি, টোডাল্ট প্রমূখ দার্শনিকদের যুক্তির প্রত্যক্ষ প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। নজরুল দেখান যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রকৃতির মধ্যে প্রকাশমান হলেও অন্ধ মানুষ সেই স্রষ্টাকেই অস্বীকার করে বসে, তাঁর সাথে শরিকত্ব আনে, ক্ষুদ্র মানুষ হয়ে পরমপ্রভুকে যুক্তি দিয়ে তাঁর অনস্তিত্ব প্রমাণ করতে চায়। নজরুল নিরীশ্বরবাদী, বহু-ঈশ্বরবাদী ও দ্বি-ঈশ্বরবাদীদের বিপরীতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও একত্বাদকে যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করতে সচেষ্ট হন। তিনি দেখান যে, ধর্মসমূহে ঈশ্বরের গুণাবলীর মধ্যে কোনো ভিন্নতা নেই, তাকে যে নামেই ডাকা হোক না কেনো তিনি সাড়া দেন। নজরুলের মতে, ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, পরম করুণাময় ও মঙ্গলময় সত্তা এবং তিনি জগতের অতিবর্তী হয়েও অন্তর্বতী।

নজরুল নৈতিক সমাজ গঠনকে ধর্মের আদেশ হিসেবে দেখেছেন। কেননা তিনি বিশ্বাস করতেন যে, মানুষকে যদি নৈতিক মানুষে রূপান্তরিত করা যায়, তাহলে সমাজ থেকে সকল ধরনের অপরাধমূলক কাজ দূর হবে, ভ্রাতৃত্বপূর্ণ ও বন্ধুত্বপূর্ণ নৈতিক সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে। আর এ জন্য তিনি সকল কিছুকে ধর্মীয় নৈতিকতার আলোকে মূল্যায়ন করেছেন। তিনি সাহিত্যের প্রতিটি ছত্রে ব্যবহার করেছেন ধর্মীয় নৈতিকতার নীতিসমূহ। রাষ্ট্রের শিক্ষাব্যবস্থা থেকে শুরু করে কবি সাহিত্যিকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য, নারী-পুরুষের ও ধনী-গরিবের সাম্য প্রতিষ্ঠা এবং রাজনৈতিক নৈতিকতার আলোচনাতেও নজরুল ধর্মীয় নৈতিক বিধান প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে তিনি লিঙ্গভেদ না করে সকলের জন্য নৈতিক শিক্ষাকে আবশ্যকীয় করার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি শিক্ষার্থীদেরকে দেশপ্রেম, স্বকীয়তাবোধ, স্বজাতিবোধ এবং আত্মশক্তিতে বলিয়ান করার জন্য উপযোগী শিক্ষাপ্রণালী প্রণয়ন করতে বলেন। এ ক্ষেত্রে নজরুল কবি সাহিত্যিকদেরকে জাতি-ধর্ম-বর্ণভেদের ঊর্ধ্বে উঠে জনসাহিত্য ও বিশ্বসাহিত্য রচনা করতে বলেন। দেশপ্রেম ও মানবপ্রেমকে তিনি সাহিত্য রচনার লক্ষ্য হিসেবে নিতে বলেন।

সাম্যবাদের ক্ষেত্রে নজরুল মার্কসবাদী সাম্যের চেয়ে ধর্মীয় সাম্যের মধ্যে মানবের মুক্তি দেখেছেন এবং তার আলোকেই তিনি তাঁর সাম্য ভাবনাকে প্রকাশ করেছেন। ইসলাম ধর্মের বিধানের মধ্যেই সাম্যের প্রকৃত বীজ নিহিত রয়েছে বলে তিনি মনে করেন। এজন্য নারী-পুরুষের সাম্য প্রতিষ্ঠায় বারবার তিনি নারীশিক্ষার ব্যাপারে ধর্মীয় বিধানের উল্লেখ করেছেন। ধনী-গরিবের

সাম্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেও তিনি ইসলামের নবী হযরত মোহাম্মদ (সা:) ও খলিফা উমর (রা:) এর ন্যায়পরতার দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেন। আর রাজনৈতিক ভাবনাতে নজরুল নাগরিক ও রাষ্ট, শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক এবং রাজনৈতিক দল ও ব্যক্তি মানুষের সম্পর্ককে ন্যায়পরতার আলোকে মূল্যায়ন করেন। স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অক্ষুন্ন রেখে সকলের মধ্যে ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করার জন্য সকলের স্বীয় দায়িত্ব ও কর্তব্যকে যথাযথভাবে পালন করার জন্য তিনি পরামর্শ দেন।

ধর্ম ও নৈতিক জীবন অর্থহীন হয়ে পড়ে যদি আত্মা নশ্বর হয়। এজন্য নজরুল আত্মাকে দেখেছেন অক্ষয়, অব্যয়, অমর, অজড় ও অবিনাশীরূপে। তিনি মানবাত্মাকে পরমস্রষ্টার অংশ হিসেবে দেখেছেন। ফলে আত্মা দেহকে আশ্রয় করে থাকলেও তার আসল আবাস পরমাত্মা। তাঁর মতে একবার আত্মাকে তথা 'আমি'কে চিনতে পারলে মানুষের সকল বাধন খুলে যায়। নজরুল তাঁর নিজের অসিমত্বকে আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছিলেন; 'বিদ্রোহী' কবিতা যার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ইসলাম ধর্মের পাশাপাশি ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কে অবহিত থাকার ফলে তাঁর দর্শনে আত্মার পুনরুত্থানের পাশাপাশি পুনর্জন্মের বিশ্বাসের উপস্থিতি রয়েছে।

ভ্রাতৃত্বপূর্ণ ও নৈতিক বিশ্বগঠনের জন্য তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের উপর বর্তমানে যে গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে; নজরুলের মধ্যে সে সময়ে তা বর্তমান ছিলো। নজরুল পূর্ববর্তী ধর্মসংস্কারক ও ধর্মতত্ত্ববিদদের মধ্যে ইমাম আল-গাজালি, শাহ্ ওয়ালীউল্লাহসহ সুফি দার্শনিকবৃন্দ; শ্রীচৈতন্যদেব, রাজা রামমোহন রায় এবং স্বামী বিবেকানন্দের দর্শন ছাড়াও বাংলার সমন্বয়ধর্মী বাউলদর্শন প্রভৃতির সারকথা অধ্যয়ন করেছিলেন। ফলে তাঁর ধর্মীয় ও নৈতিক চিন্তার সাথে উপর্যুক্ত ধর্মসংস্কারক ও দার্শনিকবৃন্দের চিন্তা ও মতবাদের সাদৃশ্য রয়েছে।

সর্বোপরি বলা যায় যে, নজরুলের সময়ে যা ছিলো প্রাসঙ্গিক বর্তমান বাংলাদেশে এটি আরো বেশি প্রাসঙ্গিক হিসেবে দেখা দিয়েছে। সমাজের সর্বত্র সর্বগ্রাসী দুর্নীতি, হত্যা, ধর্ষণ, মানুষের অধিকার হরণ, ধর্মের নামে বোমাবাজি, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি বিরূপ মনোভাব প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপ, শান্তিকামী মানুষকে শঙ্কিত করছে। সমাজ থেকে এই সকল ব্যাধি দূর করার জন্য বহুমুখী পদক্ষেপ নেওয়া হলেও তা দিনকে দিন অপ্রতিরুদ্ধভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এমতাবস্থায় কেবল উদার ও সমন্বয়ধর্মী ধর্মীয় ও নৈতিক বিধান পালনেই মুক্তি সম্ভব। নজরুলের স্বপ্নও ছিলো তা-ই।

সম্ভাব্য গবেষণা ক্ষেত্র

অত্র গবেষণায় ধর্ম ও নৈতিকতা সম্পর্কে নজরুলের দৃষ্টিভঙ্গি মূল্যায়ন করা হয়েছে। এই গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করতে গিয়ে গবেষকের মনে হয়েছে যে,

১. নৈতিকতাকে কেন্দ্র করে পেশাগত নৈতিকতা, ব্যবসায় নৈতিকতা, রাজনৈতিক নৈতিকতা প্রভৃতি আলাদা আলাদা শিরোনামে গবেষণা করার সুযোগ রয়েছে।

২. সামাজিক বিষয়গুলোকে কেন্দ্র করে "নজরুলের সমাজভাবনা ও বর্তমানে বাংলাদেশে এর বাস্তবতা" শিরোনামে গবেষণা হতে পারে।

৩. দেশপ্রেমকে কেন্দ্র করে "নজরুলের দেশপ্রেম ও আমাদের দায়" শিরোনামে গবেষণা হতে পারে।

৪. "নারীমুক্তি আন্দোলনে নজরুলের অবদান" শিরোনামে আলাদা গবেষণা করার সুযোগ রয়েছে।

৫. নজরুলের শিক্ষাভাবনা নিয়ে গবেষণা করা যেতে পারে।

৬. "ধর্মসংস্কার আন্দোলন ও নজরুল" শিরোনামে গবেষণা করা যেতে পারে।

৭. "সংস্কার আন্দোলন ও নজরুলের সংস্কারভাবনা" শিরোনামে গবেষণা হতে পারে।

৮. "নজরুল সাহিত্যে প্রতিফলিত ধর্মীয় নৈতিকতার স্বরূপ" শিরোনামে গবেষণা করা যেতে পারে।

৯. "নজরুলের সাম্যবাদী চিন্তাধারা ও বর্তমান বাস্তবতা" শিরোনামে গবেষণা হতে পারে।

এছাড়াও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে নজরুলকে নতুনভাবে মূল্যায়ন করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।

গ্রন্থপঞ্জি

প্রাথমিক উপকরণ

ইসলাম, কাজী নজরুল। *নজরুল-রচনাবলী*। রফিকুল ইসলাম (সম্পাদিত), জন্মশতবর্ষ সংস্করণ, ১ম খন্ড। ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৬।

————। *নজরুল-রচনাবলী*। রফিকুল ইসলাম (সম্পাদিত), জন্মশতবর্ষ সংস্করণ, ২য়-৬ষ্ঠ খন্ড। ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৭।

————। *নজরুল-রচনাবলী*। রফিকুল ইসলাম (সম্পাদিত), জন্মশতবর্ষ সংস্করণ, ৭ম-৮ম খন্ড। ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৮।

————। *নজরুল-রচনাবলী*। রফিকুল ইসলাম (সম্পাদিত), জন্মশতবর্ষ সংস্করণ, ৯ম খন্ড। ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৯।

————। *নজরুল-রচনাবলী*। রফিকুল ইসলাম (সম্পাদিত), জন্মশতবর্ষ সংস্করণ, ১০ম-১১তম খন্ড। ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০১০।

সহায়ক উপকরণ

আতাউর রহমান। *নজরুল কাব্য-সমীক্ষা*। ৩য় সং। ঢাকা: মুক্তধারা, ১৯৭৪।

আবদুল বারী, মুহাম্মদ। *নীতিবিদ্যা*। ঢাকা: হাসান বুক হাউস, ২০০১।

আমিন, সোনিয়া নিশাত। *বাঙালি মুসলিম নারীর আধুনিকায়ন: ১৮৭৬-১৯৩৯*। অনু.পাপড়ীন নাহার। ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০২।

আমিনুল ইসলাম । *আধুনিক পাশ্চার্ত দর্শন*, চতুর্থ সং। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৯।

————। *জগৎ জীবন দর্শন*। ১ম সং। ঢাকা: মওলা ব্রাদার্স, ২০১১।

————। *পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস: থেলিস থেকে হিউম*। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৯।

————। *বাঙালির দর্শন: প্রাচীনকাল থেকে সমকাল*। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৪।

————। *মুসলিম ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন*। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৮

————।*সমকালীন পাশ্চাত্য দর্শন*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮৯।

আর্মস্ট্রং, ক্যারেন। *স্রষ্টার ইতিবৃত্তঃ ইহুদি, ক্রিশ্চান ও ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের স্রষ্টা সন্ধানের ৪,০০০ বছরের ইতিহাস*। অনু. শওকত হোসেন। ঢাকা: রোদেলা প্রকাশনী, সন অজ্ঞাত।

আলম, রেজিনা আকতার। *নজরুলের মানবতাবাদী দর্শন*। ঢাকা: মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, ২০১৩।

আলী, মোবাশ্বের। *নজরুল : সমাজ পরিবেশ ও কাল*। ঢাকা : নজরুল ইন্সটিটিউট, ১৯৯২।

আলী, সৈয়দ আমীর। *দ্য স্পিরিট অব্ ইসলাম*। অনু.রশীদুল আলম। কলকাতা: মল্লিক ব্রাদার্স, ১৯৮৭।

আহ্‌মদ, মুজাফ্‌ফর। *কাজী নজরুল ইসলাম: স্মৃতিকথা*। কলকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, ১৯৯৫।

আহমদ, শাহাবুদ্দীন। *নজরুল সাহিত্য বিচার*। ঢাকা: মুক্তধারা, ১৯৭৬।

আহমেদ, ইমাম। *মরমী দর্শন এবং পুরুষোত্তম নজরুল*। ঢাকা: সদর প্রকাশনী, ২০১৬।

আহ্‌ছানউল্লা, খানবাহাদুর। *বিভিন্ন ধর্মের উপদেশাবলী*। ঢাকা: ঢাকা আহ্‌ছানিয়া মিশন, ১৯৬৪।

ইব্রাহিম, নীলিমা। *বাঙালি মানস ও বাংলা সাহিত্য*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৬৬।

ইসলাম, আজিজুন্নাহার ও নূরুল ইসলাম, কাজী । *তুলনামূলক ধর্ম নৈতিকতা ও মানবকল্যাণ*। ঢাকা: সংবেদ, ২০১৭।

ইসলাম, মুস্তফা নূরউল। সম্পা.,*শিখা সমগ্র (১৯২৭-১৯৩১)*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০৩।

————। *সমকালে নজরুল ইসলাম*। সম্পাদিত। ঢাকা : বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ১৯৮৩।

ইসলাম, মোঃ সাইফুল। নজরুলের নাটক: বিষয় ও আঙ্গিক। ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০৮।

এডোয়ার্ডস, ডি মায়াল। *ধর্ম-দর্শন*। অনু. সুশীল কুমার চক্রবর্তী। কলকাতা: নবপত্র প্রকাশন, ১৯৫২।

ওদুদ, কাজী আবদুল। *নজরুল-প্রতিভা*। ঢাকা: ওরিয়েন্ট পাবলিশার্স, ১৯৪৯।

করিম, আবদুল। *বাংলার ইতিহাস: মুসলিম বিজয় থেকে সিপাহী বপ্লব পর্যন্ত [১২০০-১৮৫৭]*। ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০১২।

কাইউম, মোহাম্মদ আবদুল। *নানা প্রসঙ্গে নজরুল*। ২য় সং। ঢাকা: নজরুল ইন্সটিটিউট, ২০১৪।

কাজী, মোঃ ওমর। *নজরুল ও হুইটম্যান*। সম্পা.ইসরাইল খান। ঢাকা: কাশবন প্রকাশন, ২০০৮।

কামরুল আহসান। *নজরুল কাব্যে সাময়িকতা*। ঢাকা: নজরুল ইন্সটিটিউট, ২০০১।

কালিম, মুসা। *মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক*। কলকাতা: মল্লিক ব্রাদার্স, ১৯৮৮।

খান, আজহারউদ্দীন। *বাংলা সাহিত্যে নজরুল*। তৃতীয় সং। কলকাতা: ডি এম লাইব্রেরি, ১৯৫৮।

খানম, রাশিদা আখতার। *পরিবেশ নীতিবিদ্যা*। ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৯।

গুপ্ত, সুরজিত দাস। *ভারতবর্ষ ও ইসলাম*। কলকাতা: শঙ্কর প্রকাশন, ১৯৭৬।

গুপ্ত, সুশীলকুমার। *নজরুল - চরিতমানস*। ৩য় সং। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৭।

ঘোষ, বিশ্বজিৎ। *নজরুল মানস ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৩।

ঘোষ, রমেন্দ্রনাথ। *ভারতীয় দর্শন*। ঢাকা: নিউ এজ পাবলিকেসন্স, ২০১৫।

ঘোষ, রমেন্দ্রনাথ। *রমেন্দ্রনাথ ঘোষ দার্শনিক প্রবন্ধাবলি*। সম্পা. হাসান আজিজুল হক ও মহেন্দ্র নাথ অধিকারী। ঢাকা: ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ২০১৪।

হক, হাসান আজিজুল ও অধিকারী, মহেন্দ্র নাথ (সম্পা.)। *রমেন্দ্রনাথ ঘোষ দার্শনিক প্রবন্ধাবলি*। ঢাকা: ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ২০১৪।

চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র। *বঙ্কিম রচনাবলী*। ২য় খণ্ড। কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ১৯৬৯।

চাকমা, নীরুকুমার। *বুদ্ধ: ধর্ম ও দর্শন*। ঢাকা: অবসর, ২০০৭।

চাকলাদার, শফি। *জীবন সায়াহ্নে নজরুলকে যেমন দেখেছি*। ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামী ফাউন্ডেশন, ১৯৮৮।

চৌধুরী, কবির। *আমার নজরুল*। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০১০।

চৌধুরী, তিতাস। *এবং নিষিদ্ধ নজরুল*। ঢাকা: ভিনাস প্রকাশন, ১৯৯০।

চৌধুরী, সিরাজুল ইসলাম। *বাঙালীর জাতীয়তাবাদ*। ৪র্থ সং। ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০১৫।

————। *নির্বাচিত সাহিত্য সমালোচনা*। ঢাকা: মৌলি প্রকাশনী, ২০০২।

জেমী, পারভীন আক্তার। *নজরুল সাহিত্যে বিপ্লবী চেতনা*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১০।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *শিক্ষা*। দ্বিতীয় সং। ঢাকা: বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ২০১৬।

দত্ত, রমেশচন্দ্র। *বাংলার কৃষক*। অনু. কাজী ফারহানা আক্তার লিসা ও সাদাত উল্লাহ খান। ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০৮।

দে, বিশ্বনাথ (সম্পা.)। *নজরুল স্মৃতি*। শতবর্ষ সং। কলকাতা: সাহিত্যম, ১৯৯৮।

দেব, গোবিন্দচন্দ্র। *তত্ত্ববিদ্যা-সার*। ২য় মুদ্রণ। ঢাকা: অধুনা প্রকাশন, ২০০৮।

নাসিরউদ্দীন, মোহাম্মদ। *সওগাত-যুগে নজরুল ইসলাম*। ঢাকা: নজরুল ইন্সটিটিউট, ১৯৮৮।

প্লেটো। *রিপাবলিক*, অনু.সরদার ফজলুল করিম। ৭ম সং। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০০।

ফজল, আবুল। *আইন-ই-আকবরী ও আকবরের জীবনী*। অনু. পাঁচকরি বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতা: বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, ১৯৮৭।

————। *সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধাবলী*। ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ১৯৮০।

বসু, পূরবী। *প্রাচ্যে পুরাতন নারী*। ঢাকা:অবসর, ২০১৩।

বানু, সৈয়দ মোতাহেরা। *নজরুলের শিশু সাহিত্য*। ঢাকা: নজরুল ইন্সটিটিউট, ২০০০।

বারী, মুহাম্মদ আব্দুল। *দর্শনের কথা*। ঢাকা: হাসান বুক হাউস,১৯৯৮

ভুঁইয়া, আনোয়ারুল্লাহ। *শিক্ষাদর্শন: তত্ত্ব ও ইতিহাস*। ঢাকা: অন্বেষা প্রকাশন, ২০১০।

ভৌমিক, শান্তিরঞ্জন। *নজরুলের উপন্যাস*। ঢাকা: নজরুল ইন্সটিটিউট, ১৯৯২।

মঈনুদ্দীন, খান মুহাম্মদ। *যুগস্রষ্টা নজরুল*। ৩য় সং। ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৮।

মজুমদার, রমেশচন্দ্র। *বাংলাদেশের ইতিহাস: আধুনিক যুগ*। কলকাতা:   ১৯৯৬।

————। *বাংলাদেশের ইতিহাস: মধ্যযুগ*। কলকাতা: জেনারেল প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রা: লি:, ১৯৮১।

মতিউর রহমান, এম. । *ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃতি* । ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০১৬ ।

মাবুদ, হায়াৎ ও দত্ত, জ্যোতিপ্রকাশ (সম্পা.) ।*তোমার সাম্রাজ্যে, যুবরাজ* । ঢাকা: নজরুল ইন্সটিটিউট, ১৯৯৯ ।

মাতুব্বর, আরজ আলী। *আরজ আলী মাতুব্বর রচনাসমগ্র*। ১ম খণ্ড। ঢাকা: পাঠক সমাবেশ, ২০১২ ।

মামুদ, হায়াৎ । *নজরুল ইসলাম: কিশোর জীবনী* । ঢাকা: প্রতীক প্রকাশনী সংস্থা, ১৯৯৫ ।

মার্কস, কার্ল ও এঞ্জেলস, ফ্রেডরিখ। *নির্বাচিত রচনাবলী।* ১ম খণ্ড। মস্কো: প্রগতি প্রকাশন, ১৯৭৯ ।

মাহমুদ, অনীক। *চিরায়ত বাংলা: ভাষা সংস্কৃতি রাজনীতি সাহিত্য*। ঢাকা: আফসার ব্রাদার্স, ২০০০ ।

মুরশিদ, গোলাম । *নারীপ্রগতির একশো বছর: রাসসুন্দরী থেকে রোকেয়া* । ঢাকা: অবসর, ২০১৩ ।

———————— । *নারী ধর্ম ইত্যাদি* । ঢাকা: অন্যপ্রকাশ, ২০০৭ ।

———————— । *বিদ্রোহী রণক্লান্ত: নজরুল-জীবনী* । ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন, ২০১৮ ।

রফিকুল ইসলাম । *কাজী নজরুল ইসলাম : জীবন ও সৃষ্টি* । কলকাতা : কেপি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, ১৯৯৭ ।

রেজা, সৌভিক । *ত্রিশোত্তর বাংলা কবিতায় অধ্যাত্মচেতনা* । ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০৭ ।

রেবেল, আগস্ট । *নারী অতীত-বর্তমান ভবিষ্যতে* । অনু. কনক মুখোপাধ্যায়, ১ম সং। কলকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৩ ।

শরীফ, আহমদ। *আহমদ শরীফ রচনাবলী* ১ম খণ্ড, সম্পা. আহমদ কবীর। ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২০১০ ।

———————— । *একালে নজরুল* । ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, ২০১৫ ।

———————— । *বাঙলার মনীষা* । ঢাকা: অনন্যা, ২০০৫ ।

শহীদুল্লাহ্, মোহাম্মদ। *শহীদুল্লাহ্-রচনাবলী*, সম্পা. আনিসুজ্জামান। ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৪ ।

সরকার, শিপ্রা । *রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শনে উননয়ন-ভাবনা* । ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৮ ।

সিদ্দিকা, মোবার্‌রা । *আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মহিলাদের অবদান: হানা ক্যাথরিন ম্যালেন্স থেকে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন* । ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০৭ ।

সিংহ, শান্তিপদ । *নজরুল কথা* । দ্বিতীয় সং । কলকাতা: নবজাতক, ১৯৯৮ ।

সেনগুপ্ত, অচিন্ত্যকুমার । *জৈষ্ঠের ঝড়* । কলকাতা: আনন্দধারা, ১৯৬৯ ।

সৈয়দ, আব্দুল মান্নান । *নজরুল ইসলামঃ কালোজ কালোত্তর* । ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮৭ ।

হক, আনোয়ারুল । *নজরুল ও তাঁর বৈরীপক্ষ* । ঢাকা: নজরুল ইন্সটিটিউট, ২০০০ ।

হাই, মোহাম্মদ আবদুল (সম্পা.)। বাঙালির ধর্মচিন্তা। ঢাকা: সূচীপত্র, ২০১৪।

হাফিজ, হাসান (সম্পা.)। *বহুমাত্রিক নজরুল*। ঢাকা: অনিন্দ্য প্রকাশ, ২০১৫।

হামিদ, এম. আবদুল। *দার্শনিক প্রবন্ধ সংকলন*। ঢাকা: অনন্যা, ২০১১।

হামিদ, মোঃ আবদুল। *দার্শনিক প্রবন্ধাবলি: তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০৩।

হায়দার, সূফী জুলফিকার। *নজরুল জীবনের শেষ অধ্যায়*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৬৫।

হোসেন, মোহাম্মদ আখতার। *নজরুল ইসলামের সাহিত্যে ধর্মীয় দর্শন ও রাজনৈতিক ভাবনা*। ঢাকা: সমাচার,২০১৩

Aurobindo, Sri. *The Foundations of Indian Culture*, 4th ed.. Pondicherry: Sri Aurobindo Ashram Trust, 1998.

Bertocci, Peter Anthony. *Introduction to the Philosophy Of Religion.* Englewood Cliffs, N. J.:Prentice-Hall, Inc.,1951.

Chatterjee, Pritibhushan. *Studies in Comparative Religion.*Calcutta: Das Gupta and co., 1971.

Datta, D.M. *The Philosophy of Mahatma Gandhi*. Calcutta: Calcutta University Press, 1968.

Davies, Brian. *An Introduction to the Philosophy of Religion.*Oxford:Oxford University Press,1993.

Hick, John H. *Philosophy of Religion*. New Jersey: Englewood Cliffis, 1980.

Hick, John H. *Evil and the God of Love*. London: Palgrane Macmillan, 2010.

Hume, David. *Dialogue Concerning Natural Religion.*Indianapolis, IN: Hackett, 1988.

James, William. *Pragmatism: A New Name for some old Wage of Thinking.* New York: Longman's Green & Co., 1959.

Kazi, Kalyani. *Nazrul: The Poet Remembered*. New Delhi: Wisdom Tree, 2009.

Kung, Hans *Christianity and the Wold Religions*, Trans. Peter Heinegg. London: Collins Publishers, 1986.

M.A. Macauliffe, *The Sikh Religion*, Vol. I (Oxford: Clarendon Press, 1909), 330.

Mawson, T. J.. Belief in God: *An introduction to the Philosophy of Relegion*. New York: Oxford University Press, 2004.

Meister. Chad. *Introducing Philosophy of Relegion*. London: Routledge, 2009.

Mitchell, Basil. ed.. *The Philosophy of Religion*. London. Oxford University Press, 1971.

Mitra, Priti Kumar.*Dessent of Nazrul Islam*. New Delhi: Oxford University Press, 2007.

Narahari, H.G..*Atman in Pre-upanisadic Literature.*Madras: Ganesh and Co. 1944.

Patrik, G.T.W..*Introduction to Philosophy*.New York: 1935.

Peterson,Michael L. and VanArragon, Raymond J. ed..*Contemporary Debates in Philosophy of Religion*. Oxford: Blackwell Publishing Ltd, 2004.

Plantinga, Alvin. *God, Freedom, and Evil*. Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company, 1977.

Reitan, Eric. *Is God Delusion: A Reply to Religion's Cultured Despisers.*West Susex: Wiley-Black well, 2009.

Russell, Bertrand. *An Outline of Philosophy.*London: George and Allen and Unwin Ltd, 1961.

Schweiker, William. ed.. *Religious Ethics*. USA: Blackwell Publishing ltd, 2005.

Sharma, R.N. *Introduction to Ethics*. Delhi: Surject Publications, 1993.

Sinha, Jadunath. *A Manual of Ethics*, Revised ed.. Calcutta: New Central Book Agency,1984.

Swinburne, Richard. *The Existence of God,* 2nd ed.. Oxford: Oxford University Press, 2004.

Yandell, Keith E..*Philosophy of Religion: a Contemporary introduction.* London: Routledge, 1999.

জার্নাল

অন্বেষণ। ৩য় খণ্ড, হেমন্ত সংখ্যা ৮ পর্ব। দর্শন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৭।

দর্শন ও প্রগতি। বর্ষ-৩৩, ১ম ও ২য় সংখ্যা। গোবিন্দ দেব দর্শন গবেষণা কেন্দ্রঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৬।

নজরুল ইন্সটিটিউট পত্রিকা। ২৬তম সংখ্যা হতে ৩৪ তম সংখ্যা। ঢাকা: নজরুল ইন্সটিটিউট।

বাঙলা সাহিত্যিকি। ৫ম সংখ্যা। বাংলা বিভাগ: রাজশাহী কলেজ, ২০১৮।

পি.এইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ

ইসলাম, নজরুল। "উইলিয়ম জেমস ও জাঁ পল সার্ত্রের মানবতাবাদের আলোকে কাজী নজরুল ইসলামের মানবতাবাদ", পিএইচডি অভিসন্দর্ভ। দর্শন বিভাগ: রাবি, ১৯৯৯।

আলম, রোজিনা আখতার। "নজরুলের মানবতাবাদী দর্শন", পিএইচডি অভিসন্দর্ভ। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়,২০০১।

সন্ধ্যা মল্লিক, "পরমসত্তা সম্পর্কে শঙ্কর ও ব্রাডলির দর্শনের তুলনামূলক বিশ্লেষণ", পি-এইচ.ডি অভিসন্দর্ভ (দর্শন বিভাগ, রাজশাজী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৭।

হক, মোঃ সাইদুল "নজরুল সাহিত্যে পুরান প্রসঙ্গ", পিএইচডি অভিসন্দর্ভ। বাংলা বিভাগ: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৪।

হারুন-উর রশিদ, মোঃ। "নজরুল সাহিত্যে ধর্ম", পিএইচডি অভিসন্দর্ভ। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৮।

আলী, মোঃ আককাছ । "ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ: একটি ঐতিহাসিক ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ"। পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, আরবি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১২।

এম.ফিল. অভিসন্দর্ভ

আলী, মোঃ মোজাহার। "বাংলাদেশ দর্শনে ধর্ম, নৈতিকতা ও মানবতাবাদ: একটি দার্শনিক বিশ্লেষণ", এমফিল থিসিস। দর্শন বিভাগ: রাবি, ২০১১ ।

খাতুন, মোসাঃ হাফসা। "ইসলামে নারীর মর্যাদা", এমফিল থিসিস। ইসলামিক স্টাডিস বিভাগ: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৬।

খানম, মোঃ মাসুমা। "নজরুল সাহিত্যে নারী: প্রাসঙ্গিক বিশ্লেষণ", এমফিল থিসিস। বাংলা বিভাগ: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৫।

শেখ, মোঃ আলেক উদ্দিন। "নারীর ক্ষমতায়ন, অংশগ্রহণ ও নেতৃত্বঃ প্রেক্ষাপট বাংলাদেশে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার ব্যবস্থা", এমফিল থিসিস। রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ: রাবি, ২০০৩।